স্বাভাবিক যোগ

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস প্রণীত

কলিকাতা,
২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৩২১ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

মহাকাশে অহমস্মি।
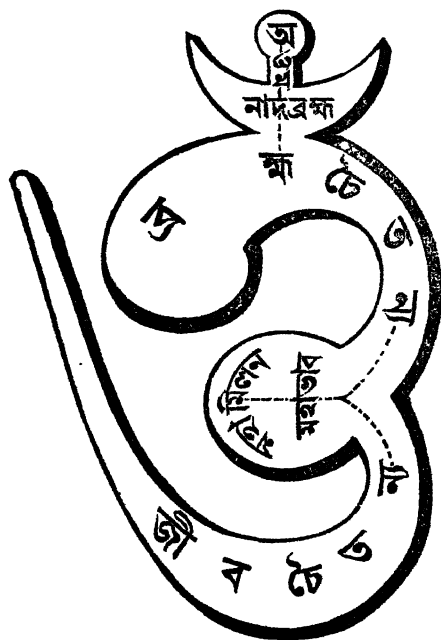
জীবে-ব্রহ্মে মহামিলন।

ভূমিকা।

ক্লীবের পুত্র-মুখ-দর্শনের অভিলাষ, দরিদ্রের স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিবার আকিঞ্চন, মূর্খের দর্শন শাস্ত্র আলোচনার উল্লাস যেমন অসম্ভব, আমিও স্বাভাবিক যোগ-মহচ্চিন্তার অনিবার্য্য তরঙ্গাঘাতে তেমনই বাসনা করিয়াছি। ইহাও কি কখনও সম্ভব হয় যে, ধর্ম্মবল, জ্ঞানবল, সাধন-বল-বর্জ্জিত এহেন অভাজন ব্যক্তি সাধ্যাতীত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে? তবে বিশ্বভাবন বিধাতার বিধাতৃশক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়। অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, যিনি জননীর কঠোর জঠর-গৃহে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই এই রুচি-শক্তির অব্যাহত গতি প্রবল রাখিয়া আশা পূর্ণ করিবেন।

আমি শৈশবে পিতৃহীন। অসহায় দরিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, আমার এমন কোন সংস্থান ছিল না যে, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে একটু দাঁড়াইতে পারি। প্রৌঢ়-কালেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিভাগ নিবন্ধন শিক্ষাসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়নের কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং গুরু মহাশয়ের পাঠ-শালায় "গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, গঙ্গার বন্দনা" পর্য্যন্ত আমার সাহিত্য-সম্বল। সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলাম, প্রাচ্য প্রতীচ্য, উভয় শিক্ষার সজ্ঘর্ষণে জ্ঞানের উন্নতি-কল্পে কি করিলাম—বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল! মস্তিষ্কের স্নায়ু সকল দুর্ব্বল, শরীরে জরা-জড়িত, শোক দুঃখ রোগ-যন্ত্রণায় সর্ব্বদা আক্রান্ত। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন কয়েকটী কথা মনে পড়িল।

জগতে উন্নতি অবনতি অনন্তকালই আছে। দিবা, রাত্র, দুঃখ, সুখ, স্বাস্থ্য জরা চক্রবৎ ঘূরিতেছে। অন্ধকার-আলো ইহাও চিরকাল রহিয়াছে। পঙ্ক ভেদ করিয়াই পঙ্কজের উৎপত্তি হয়। মাতৃগর্ভস্থিত শিশুটী ভূমিষ্ট হইবামাত্র ওঁ মা শব্দে কাঁদিয়া উঠে—কাহার শক্তিতে? উহাই যে চিৎশক্তি বা স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ! হৃদয় মধ্যে এইরূপ নানা কথার আন্দোলন হইতে লাগিল এবং শুভাশুভ চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে ঐ সময় আমাকে এমন একটী বিকৃত চিন্তা আসিয়া উন্মত্ত করিল যে, আমি যে দিকেই দেখি, সেই দিকই যেন শ্মশান! আমাকে আমার বলে, এমন ব্যক্তি কেহ নাই। হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত! সেই তিমির-তরঙ্গ মধ্যে আশ্রয়-শূন্যতা কি ভয়ঙ্কর!

বহুচিন্তার পর শেষ বুঝিলাম, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই। এই শুভ চিন্তার সহিত বিকৃত চিন্তা ভীষণ সংগ্রামে পরাস্ত হইলে, সহসা আশার আশ্বাস পাইলাম। আর বাহ্য শিক্ষার প্রতি যত্ন ও ততটা আকাঙ্ক্ষা রহিল না। বস্তুতঃ লোকচক্ষুর অতীত পূর্ণ চৈতন্যময়ের অনন্ত সত্তায় ডুবিতে পারিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যতই ভগবানে নির্ভর স্থায়ী হইবে, মলিন হৃদয়ও ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইয়া ততই আলোকিত হইতে থাকিবে। এবং অন্তরাকাশ-পটে জ্বলন্ত অক্ষরে নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ পাঠ করিতে শক্তি জন্মিবে, কিন্তু হায়! কখনও নির্ভরে ব্যাকুলতা প্রবল হয়, কখনও চলিয়া যায়। ভাবিতে লাগিলাম,—কিছুকাল পর, নির্ম্মলা চিন্তার আনুগত্যে মন পিঞ্জরমুক্ত পাখীর ন্যায় অনন্ত আকাশে ছুটিল। প্রীতি সম্ভাষণে বলিল, স্বাভাবিক জ্ঞান বড় মিষ্ট, মধুর হইতেও মধুর। তাই স্বাভাবিক যোগ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। আমি বলিতে পারি না যে, শাস্ত্র-শিক্ষা-বিহীন এহেন সামান্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলে প্রীতি পাইবেন। তবে উদার গুণের বশবর্ত্তী হইয়া অবকাশ মত যদি আদ্যোপান্ত একবার দেখেন, তাহা হইলে বড় কৃতার্থ বোধ করিব।

পোঃ ধুলিয়ান।
কাঞ্চনতলা।
(মুর্শিদাবাদ)

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

সূচী পত্র।

শুদ্ধি-পত্র ।

বিশেষ যত্ন স্বীকার করিয়াও এই পুস্তকখানিকে ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যে সকল ভ্রম পড়িবা মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইতে না পারে, তৎসমুদয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২	সাপটে	সাপকাটে
ঐ	ঐ	করা তাজ্জব	বরা তাজ্জব
৮	৯	উপযুক্ত	উপর্য্যুক্ত
১৮	৩০	ভত্তি	ভিত্তি
৪৫	৮	এক এক	একা এক
৪৯	১৯	প্রলোভন	প্রলোভনে
ঐ	২৬	পার্থের	পার্থিব
৫১	১২	আয়োজন	আয়োজনে
৫৫	৪	শুষ্ক পাত্রেও	শুষ্ক পত্রেও
ঐ	২২	মাংস তর্কাদি	মাংস তকাদি
৬৪	১৫	গতি ভঙ্গনানয়	গতিভঙ্গ না হয়
ঐ	২২	অতার	অভাব
৭২	২৮	ইহ	ইহা
৭৬	১৭	পাইয়া	পাইল
৭৮	৩	মলিন	মলিন মুখ
ঐ	৪	আমার	আবার
ঐ	১৫	নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা চলিয়া যায়	০

• ৫৩ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তিতে যতই প্রবলবেগে এই স্থানে এই কথাগুলি কম্পোজ করিতে ছুটিয়া গিয়াছে।

বহিয়া যায় ততই তাঁহারা সতর্কতার সহিত দীনতা ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার বলে—

৯৭	৬	আমার	আত্মার
ঐ	১৪	মন্ত্র	যন্ত্র
ঐ	৩০	উপযুক্ত	উপর্য্যুক্ত

১০০	৭	আমির	অমির
ঐ	১১	পত্র	০
ঐ	১৬	সকলেই	সকলেরই
১০৭	২০	বিচার-বিভ্রাট	বিচার-বিভ্রাটে
১০৮	২৪	বিষয় ব্যাপার	বিস্ময়জনক ব্যাপার
১১৩	১৫	মাত্র	মগ্ন
১১৮	১৪	ব্রহ্মকলা	ব্রহ্মকল্প
১১৯	৩	কল্প	কম্পন
১২০	৪	চিত্ত	চিন্তা
১২৮	১৩	এক এক	এক এবা
১৩২	২৭	জালের	জীলের
১৩৫	৫	বঞ্চিত	রঞ্জিত

১২৮ পৃষ্ঠায় ১৯ পংক্তিতে দেহাধারে এই স্থানে একটী ষ্টার চিহ্ন দিতে ভুল হইয়াছে।

স্বাভাবিক যোগ।

প্রথম উল্লাস।

প্রাণী ও প্রাণ।

স্বাভাবিক জ্ঞান আপনা হইতেই পরিস্ফুরণ হয়। মাতৃ-গর্ভ হইতে শিশু ভূমিষ্ট হইলে, তৎপলক্ষণেই স্বভাবতঃ মাতার স্তন্য-দুগ্ধ টানিয়া লয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে চলিতে শিখে, কার শিক্ষা বলে? ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান প্রভাবে। প্রাণী মাত্রেরই প্রাণাধারে একই অনাবৃত প্রজ্ঞা বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারই সাধন-সংসাধনে স্বাভাবিক যোগ বিকাশ পায়। এই নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল যোগ, পূর্ণ চিৎশক্তি হইতে প্রকাশ পাইয়া সরল যোগের বিশুদ্ধ পন্থা প্রদর্শন করে। ইহার আশ্রয়েই ভারতে রাজযোগের তত্ত্বসমূহ যোগিগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সময়-বিবর্ত্তনে মানবের রুচিভেদে জগত্তত্ত্বের পরিবেষ্টনেও স্বাভাবিক যোগের ব্যত্যয় হয় নাই। বস্তুতঃই একটুক বুঝিতে হইলে সকল প্রকার যোগের অঙ্গ-প্রবিষ্ট শোণিত-প্রবাহ-রূপে ঐ স্বাভাবিক যোগ-তত্ত্বই সময়োচিত স্তিমিতগতি হইয়াও বল প্রদান করিতেছে। রাজযোগপ্রক্রিয়া সাধন-সম্পৃক্ত হইলেও অতি আদরের বস্তু। প্রাচ্যকালের যোগিগণ এই রাজযোগের অনুসরণে কত যে জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলেও প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। দুঃখের কথা এই যে, তদনুরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম ও জগৎ উভয়ই অভিনব স্তরে পর্য্যবসিত; সুতরাং যুগ অথবা কাল-প্রভাবে প্রাচ্য স্তরটী উপশমিত হওয়াতে উপর্য্যুক্ত মহাযোগের ধারণা-কল্পে বিঘ্ন সংঘটিত হইতেছে। বলিতে কি, প্রতীচ্য স্তরে অবস্থিতি করিয়া মানবের পরমায়ু-

সংখ্যা ও সাত্ত্বিক বুদ্ধি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে এবং ঐশ্বর্য্য-স্পৃহা বলবতী সত্ত্বে হৃদয়ের ধর্ম্মস্তরও যুগপৎ বিলুপ্ত প্রায় দেখা যাইতেছে। ফলতঃ এখনও সেই যোগ-স্পৃহা ভারতবাসীর হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কিন্তু কালের নিষ্পেষণে ও প্রতীচ্য ভাবের সংঘর্ষণে যোগ সাধন ত দূরের কথা—ধর্ম্ম চিন্তাটিও যেন আকাশ গর্ভে বিলুপ্ত! আমরা কি বলিতে পারি না যে, সেই প্রাচ্য যোগিগণের পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্যকে প্রাণে ধারণা করিব এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশুদ্ধ তত্ত্বাতীত চিন্তায় একটু সময় দিতে সক্ষম হইব?—কখনই নহে। পাশ্চাত্য নৈতিক শক্তির প্রখর উত্তেজনায় ভারত-বক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সন্তপ্ত—এত-ন্নিবন্ধন প্রাচ্য কালের ধর্ম্মস্তরও বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। হায়! যে ভারতের ঋষিপুঙ্গবগণ একমাত্র যোগ বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং মনোবিজ্ঞান বলে দূর দুরান্তরে নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে অবস্থিতি করিয়াও পরস্পর চক্ষুর উন্মেষিত কাল মধ্যে সাধন সম্বন্ধ গ্রহণ করিতেন ও দিতেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরগণ কি ভয়ানক দুরবস্থায় অবস্থিত! তবে কি আমরা নিরাশার ক্রোড়েই সুখে নিদ্রা যাইব? না, এ কি কখন সম্ভব? ঐ যে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়-আকাশে আশার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ—স্বাভাবিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই ত আমরা নিরাশার অতল-তলে প্রবেশ করিতেছি।

স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাচ্যেও ছিল, প্রতীচ্যেও আছে এবং অনন্ত কাল থাকিবে। ইহার স্ফূরণ সকল প্রকার প্রাণীর অন্তর ভেদ করিয়া রহিয়াছে। প্রাণীজগতে আমরা যত প্রকার প্রাণী দেখিতেছি, বস্তুতঃ একই জ্ঞান-তরঙ্গের দ্বারা প্রত্যেক শরীর-যন্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। গূঢ় চিন্তা-প্রদেশে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, যেমন বিবিধ বর্ণের কাচফলকে এক সূর্য্যকে নানা বর্ণে দৃষ্ট হয়, তেমনই, ঐ জ্ঞান-প্রবাহ পশুপক্ষ্যাদি ও মানবগণের শরীর বিশেষে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহাকে জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলে। এই জন্য সিদ্ধযোগীরা প্রাণীমাত্রকেই হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে গ্রহণ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন। জ্ঞান-প্রবাহ দেহরূপ আধার বিশেষে স্বতন্ত্র পরিলক্ষিত হইলেও ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রসূত শক্তিকে অবলম্বন করতঃ প্রাণীসকল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্ব-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মানবের জ্ঞান কোন কোন অংশে উন্নত, পশুপক্ষ্যাদির জ্ঞানও কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। স্থপতিগণ জ্ঞান প্রভাবে নেত্র-মুগ্ধ রমণীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে, আবার ঐ বাবুই পক্ষীটী কেমন সুন্দর কুলায় প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিয়া থাকে।

এখানে স্বাভাবিক জ্ঞান উভয়েরই তুল্য। আরও দেখুন, হস্তীটী প্রকাণ্ড বৃক্ষটাকে সমূলে উৎপাটিত করিল, ঐ পতঙ্গটী হেলিয়া দুলিয়া আনন্দে আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। এরূপ স্থলে একটু ভাবিয়া দেখিলে জানা যায়—হস্তীটী উড়িতে পারে না, ফড়িংটী বৃহৎ বৃক্ষটী ভাঙ্গিতে সক্ষম নহে। তবেই বুঝুন, পতঙ্গ মাতঙ্গে শক্তির তুল্য তরঙ্গ। সুতরাং জ্ঞানশক্তি, নীতি ও কার্য্যপ্রণালী দেহোপযুক্ত অব্যর্থ ভাবে চলিতেছে। কেহ কাহারও প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব অভিমানের দাবী করিতে পারে না।

একই চিত্তের পূর্ণ সত্তা হইতে বিশ্ব-বিধানের বিচিত্র চিত্র, ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপযোগী কার্য্য-ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এমন কি, একটী সরীসৃপ পর্য্যন্ত অনাদি মহাশক্তির ব্যবধানে থাকে না। কোটী কোটী জগৎ সেই অনাদি অনন্ত-শক্তিতে বিজড়িত। এই নিরপেক্ষ উদার জ্ঞান অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইলে, অভেদ তত্ত্বের মাহাত্ম্য স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম হইয়া পড়ে।

নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, সচেতন জন্তু মাত্রই প্রাণী সংজ্ঞায় এক শক্তিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যভাব দেখিয়া এটী ভাল, এটী মন্দ, ইহা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আমরা ঘন কুজ্ঝটিকার ভিতরে ডুবিয়া যাই, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না। ভাবিয়া দেখি না যে, জাগতিক জন্তু-বৈচিত্র্য-ভাবের কারণ কি? বুঝিতে হইবে যে, একই জ্ঞান-প্রবাহ-প্রভাবে ঐ ভীষণ মূর্ত্তি ব্যাঘ্রটী কৃষকটীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপাত করিল। বিস্তৃত ফণাবিশিষ্ট সর্পটী ঐ কনক-কান্তি যুবককে হঠাৎ দংশন করিয়া গেল। আবার ভয়ঙ্কর ভূকম্পনে সহস্র সহস্র নর-নারী এক সঙ্গে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। কিন্তু ধীর এবং স্থির ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ঈদৃশ বিনাশ বিপর্য্যয় ভাবেও কেহ কাহারও শত্রু নহে, সকলেই একসূত্রে নিবদ্ধ। একই মহাশক্তির অব্যর্থ ঘটনার মূলে দেহ-লীলার অবসান হইয়া থাকে। অথচ আমরা দেখিলাম, ঐ শ্বাপদ, সর্প, ও ভূকম্পনাদি কি ভয়ঙ্কর শত্রু। বাস্তবিক উহারা শত্রু নহে, বন্ধু। দেহ পাতের ব্যবস্থাও বিশ্ব-বৈচিত্র্যের অঙ্গীভূত। অনন্ত কাল একই নিয়মের অধীনে চলিতেছে। প্রাণিগণের শরীর পাত হইলেও প্রাণ * বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় না।

শরীরের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও প্রাণ খণ্ড নহে। উহা মহাপ্রাণের প্রবাহ মাত্র। আমরা জড়-বিজ্ঞানের প্ররোচনে বিমুগ্ধ হইয়া মহা বিজ্ঞান-শক্তির বিকাশ,—

---

* ইহা হৃদয়স্থিত বায়ু নহে—চিচ্ছক্তি জড়িত অনন্ত নিরাকার জীব।

প্রাণকে সকল প্রকার দেহ-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করি, কিন্তু উহা স্থূলের ভুল-তরঙ্গ। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি প্রাণ অখণ্ড স্বরূপ হইল, তবে শ্বাপদ-সর্পাদির হিংসাভাব, মনুষ্যের সাধু ভাব দেখা যায় কেন? উত্তরে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, একই মৃত্তিকার রসে ইক্ষুতে মিষ্ট ও নিম্বফলে তিক্ত অনুভব হয়। ইহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইলে, প্রমাণিত হইবে যে, ঐ ইক্ষু এবং নিম্ব বৃক্ষের পরমাণুর অবস্থা-ভেদে রসের ভিন্নতা জন্মিয়া থাকে, তদনুরূপই দৈহিক ভাবের ভিতরেও চিৎতরঙ্গ। আমরা জন্তু সকলের আভ্যন্তরিক প্রাণের গতিকে খণ্ডে বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছি বটে; কিন্তু একই প্রাণ-প্রবাহ পশুতে মানবে তুল্য প্রবাহিত হইতেছে। জগচ্চিত্রে ইহাও দেখা যায় যে, মনুষ্যও কুপ্রবৃত্তির শাসনে পড়িয়া পশু-চরিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কতই না ঘৃণিত কার্য্য করিতেছে। কোন দেশ-ভ্রমণকারী পথিকের নিকট ইহাও শুনিয়াছি, বানরেও সাধুভাবের আশ্রয়ে বনফল দ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়া থাকে। ইহাতে কি আমরা বুঝিব না যে, "সমপ্রাণতাই" স্বাভাবিক যোগের সরল পথ। কিন্তু ভারতে বিবিধ প্রকারের বিঘ্ন বিড়ম্বনাজনিত কারণে যখন পরস্পর মিলন অসম্ভব, তখন একপ্রাণতার অমৃত আস্বাদনের আশা কি সুদূরপরাহত নহে? সুতরাং ধর্ম্ম, সত্য ও নৈতিক-বল ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ঈদৃশ শোচনীয় সময়ে সমপ্রাণতার ঐক্যবন্ধন নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, স্থূল জগতের অতীত এমন একটা স্থান আছে যে, সেই স্থান হইতে একটী অনুপমেয় জ্যোতিঃ-প্রবাহ (প্রাণ) অর্থাৎ জৈবিক তরঙ্গ—প্রাণী-সমূহের অন্তর্ভেদ করিয়া অনন্তকাল ছুটিতেছে। বস্তুতঃ ঐ জৈবিক ভাবের অখণ্ড-প্রবাহের মূলকেন্দ্র অসীম শক্তি মঙ্গলময় পূর্ণ চৈতন্য 'আত্মা'— দেশকালের অতীত, অনাদি, নিত্য। তিনি প্রকৃতির আধারে অস্পর্শ শক্তি-প্রভাবে বিশ্ব-লীলার কারণীভূত হইয়া আছেন। স্থূলের আবরণে অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও প্রত্যক্ষ। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, মানুষ প্রাণশক্তিকে ভেদ-সঙ্কুল বিবিধরূপে বুঝিয়া থাকে। অথচ একপ্রাণতাই যে সেই অসীম শক্তি-মণ্ডলে গমনের একমাত্র সহায়, তাহা উপেক্ষা দ্বারা প্রভেদ চিন্তা-প্রসূত অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তন্নিমিত্ত স্বাভাবিক সাধন-চিন্তা পরিস্ফুট হয় না।

আহা! এমন যে আত্মার অখণ্ড কিরণ-তরঙ্গ প্রাণ, আমরা তাহারই একত্ব সাধন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকি। সেই অমৃত-প্রবাহ স্বরূপ প্রাণের সাধন—অভেদ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত সম্ভবে না। ঐ অপ্রভেদ ভক্তিই প্রত্যেক

প্রাণীর শরীরস্থিত প্রাণকে সমভাবে এক করিয়া দেয়। অভেদ ভক্তির কার্য্যই এই যে,সে ঐ বৃক্ষটীর মূলেও নত এবং কালকূট-দষ্ট ভীষণ মূর্ত্তি ভুজঙ্গের নিকটেও তুল্য ভাবে অবনত—মানবের ত কোন কথাই নাই। তবেই দেখা যাইতেছে, অভেদ ভক্তির সাহায্যে সাধনে সক্ষম হইলে "সমপ্রাণতা" আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাণীতে একই প্রাণের প্রকাশ প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাই প্রক্রিয়া-বিহীন প্রকৃত "প্রাণায়াম।" যোগিগণ এই সাম্যতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা শরীরের প্রভেদ সত্ত্বেও প্রাণ-তত্ত্বের ভেদভাব মনে করেন না। নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণকে লইয়া যেন একটী পরিবার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রেমে পরমানন্দে যোগ সাধন করেন। হায়! বস্তুতঃই আমরা ভ্রান্তির ছায়ায় পশু পক্ষীদিগকে নীচ বলিয়া মনে করি। উহাদের সুখের বাস-গৃহ অরণ্য, তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া লৌহ-পিঞ্জরে কতই যে কঠোর যন্ত্রণা দেই, উহা বদ্ধ ভাবে থাকিলেই জানা যায়। কিন্তু উহাদের স্বাধীন ইচ্ছাটুকু যে একবারে ঘুচাইয়া দিয়া ঘোরতর নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি, তাহা বুঝিতে সময় পাই না। আহা! সম্মুখে উপর্য্যুক্ত যোগিদিগের সমপ্রাণতার বিশুদ্ধ আদর্শ রাখিয়া আমরা প্রাণ-যোগের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি না কেন? কেনই বা প্রাণী-নির্য্যাতনের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাই? একটু উদারতার সহিত ভাবিয়া দেখিলে ইহার মর্ম্মস্থিত তত্ত্ব অনায়াসে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। বিষয়বাসনাই ভেদ-বুদ্ধির পরিচায়ক, উহা দ্বারা প্রাণ-যোগের সম্পূর্ণ অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতই হউন, অট্টালিকাবাসী ধনীই হউন, আর জটাভস্ম-ভূষিত সন্ন্যাসীই হউন, সকলেই ঐ বাসনার বশে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখনই সম্মান-সুখাভিলাষী মোহ, বীর-দর্পে চাপিয়া ধরে, কিছুতেই তাহার হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় থাকে না। তাহার ভীষণ শাসনে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান-প্রত্যাশী হইয়া বিচারে সভাজয়ী হইতে উন্মত্ত—ধনী অন্তত একটী টাকাও কোষাগারে ফেলিবার জন্য ব্যস্ত—ঐ সন্ন্যাসীটী একছিলুম গাঁজার নিমিত্ত যোগ ভঙ্গ করিয়া পরাধীন। ইহাতে কেমন করিয়া বলিতে পারা যায় যে, বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণের একত্ব সাধনে আগ্রহ জন্মিবে?

আমরা স্থূল জগতের সূক্ষ্ম পরমাণুরও সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত! কিন্তু প্রাণ-তরঙ্গের ঐক্য বন্ধনে এতই উদাসীন যে, যদ্দ্বারা অনন্ত শক্তিময় আত্মার জ্যোতিঃ স্পর্শ করিবার পথ প্রসারিত হয়, সেই প্রভাবিকাশ ছটা, সকল প্রকার

শরীরাধারে দেখিয়াও বিস্মৃত থাকি, কি দুঃখের কথা! প্রাণি-জগতে প্রবেশ করিলে আমরা কি দেখিব না যে, কোটি কোটি জগচ্চক্রের মধ্য দিয়া এক প্রাণ সূত্র আত্মার অসীম সত্তার সহিত নিবদ্ধ রহিয়াছে। হায়! সেই প্রাণ-সূত্রকে স্থূলের বিবিধ আবরণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধরিয়া শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি। এই ভেদ বিপজ্জালে জড়িত হইলে যে ধর্ম্ম সাধন ও যোগ চিন্তা সকলই বৃথা হইয়া যায়, তাহা আমরা চক্ষুর নিমেষ কালের জন্যও স্মরণ করি না। বরং মোহতিমিরময় নরক-হ্রদের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিয়ত-কাল আশা তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া ঐশ্বর্য্য-লিপ্সার বল বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিতেছি না। কুচিন্তা-প্রসূত ভেদ-বুদ্ধি কেনই বা নিজের পরাক্রম প্রবল করিতে চেষ্টা করিবে না? সুতরাং প্রাণের "একত্ব' দর্শনের বিশুদ্ধ পন্থা বিস্মৃত হইয়া আসক্তির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছি। কেমন করিয়া বলিব যে স্বাভাবিক জ্ঞানবলে জগচ্চিত্রের মধ্যে প্রবেশ করতঃ নির্লিপ্ত ভাবে সমপ্রাণ প্রাণায়াম সাধনে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইব? বস্তুতঃই আমরা কিছুই করিনা, অথচ গৌণকাল-লব্ধ প্রক্রিয়া-সাধন-প্রয়াসী হইয়া পরিশেষে উভয়দিকেই বঞ্চিত হইতেছি এবং প্রাণশূন্য চিন্তার জটিল প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকি, তথাপি সহজ সাধনের ভিত্তি সমপ্রাণতার বিশুদ্ধ ভাবটীকে হৃদয়ে পোষণ করিবার ইচ্ছা করি না। এটী আলস্যের তাড়না বা বিষয়াসক্তির প্রলোভন ভিন্ন আর কি বুঝিব?

এখানে একপ্রাণতা সম্বন্ধে একটী কথা মনে পড়িল। আমার একজন বন্ধু একবার কুম্ভযোগে প্রয়াগ তীর্থ দর্শনে যান; গঙ্গা যমুনা ও অদৃশ্য পূত তরঙ্গিনী সরস্বতী, এই ত্রিবেণী তীর্থ ক্ষেত্রের নানা স্থানে সাধু দর্শন করিয়া বড় প্রীতি পাইয়াছিলেন। পরিশেষে আর একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একজন মহাতেজস্বী সন্ন্যাসী একখানি কম্বলাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার অনতিদূরে একটী কনেষ্টবল এক ব্যক্তিকে কোন অপরাধে বেত্রাঘাত করিতেছে। সেই তীব্র আঘাতে অপরাধীর ভ্রূক্ষেপ নাই; সে নীরব, কিন্তু সন্ন্যাসী ঐ প্রত্যেক বেত্রাঘাতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন শুনিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জুটিয়া গেল। বহু লোকের সমাগমেও সন্ন্যাসীর রোদন নিবৃত্ত হইল না। ঐ সময় এক জন পশ্চিম বিহারবাসী দর্শক ঐ তেজঃপুঞ্জ যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্ রোতে হ্যাঁয় কেঁউ।" সন্ন্যাসী নেত্র-নীরে আপ্লুত হইয়া অতি ক্ষীণ স্বরে

উত্তর দিলেন, "ঐ সিপাহী হাম্‌কো বহুত জোর্‌সে মারতা হ্যায়।" ইহা শুনিয়া অপর এক ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "সাপাটে উধকো মাধকো লাগে বিষ—করা তাজ্জব।" কিন্তু আমার বন্ধু বিস্মিত ও অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর তেজোময় সৌম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই তাঁহাকে দর্শন করেন, ততই মহদ্ভাবের বিকাশ দেখিতে পান। বন্ধুটী সেই তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর অসামান্য যোগ-জ্যোতিঃতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধরাবনত প্রণাম করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যোগিদিগের আপন পর ভেদভাব কিছু থাকে না। তাঁহারা স্বতন্ত্র: শরীরে অবস্থিতি সত্ত্বেও একপ্রাণ হইয়া যান। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যান্য দর্শকগণের সন্দেহ ভাব অনেকটা উপশমিত হইল। এই ঘটনার ভিতরে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, জান্তব জগতে সকলের প্রতি যোগিদিগেরও যতক্ষণ প্রাণে অভেদ ভালবাসা না জন্মে, ততক্ষণ তাঁহারাও যোগ রাজ্যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন না। কারণ সাম্য মিলনই উদারতার পরিচায়ক, উহা দ্বারাই সার্ব্বভৌমিক পবিত্র দৃষ্টি পরিস্ফুট হয়। এবং সারল্য মহদ্‌গুণের সহিত মধুর প্রেমের আনুগত্যে সাধনবিরোধী ইন্দ্রিয়াদি ও দুষ্প্রবৃত্তি সমূহ বশীভূত হইয়া শুভ পথ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃই অবিচ্ছিন্ন মধুর প্রেমের উত্তেজনায় সত্যোন্মুখিনী "রুচি"কে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়-পটে প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবিম্ব ভাব সকল চলিয়া যাইবে। ঐ রুচি-শক্তির নিগূঢ় ভাবের মিলনে সাধন-ব্যাহন্তা দুষ্প্রবৃত্তিগণ কুপথ-ভ্রমণ-প্রলোভনে বিরত হইবেই হইবে। তখনই শুভেন্দ্রিয় ও শুভ প্রবৃত্তিসমূহ প্রাণের বিমল্ তরঙ্গে নিমজ্জিত হইবে এবং জগতের সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া দিবেই দিবে। কিন্তু ইহাতে সফল-প্রযত্ন না হইলে, অল্প সময়েই মোহ প্রভঞ্জনের ভীষণ ঝটিকায় প্রাণ-সমুদ্রের সম তরঙ্গ অবস্থাটী প্রাণী সমূহের স্থূল ভাবে বীচিমালার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

এখন দেখা যাক, রুচি শক্তিকে কোন্ উপায়ে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায়। রুচির যখন শুভাশুভ উভয় ভাব মধ্যেই গমন-শক্তি আছে, তখন কুপথ-কলুষিত ভাবে সহজেইত রুচির রুচি প্রবল হইয়া থাকে; এমত স্থলে তাহার বিপথ-গতি নিরস্ত করিবার প্রকৃত মহৌষধি কি?—ইহার উত্তর এই যে, যদি একমাত্র সত্যে অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে রুচি-শক্তি কখনই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। নিশ্চয়ই অভেদ প্রাণ-যোগের মধুরভাবে আকৃষ্ট হইবে। পশু পক্ষী মানবে আত্মার অভেদ প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকিবে।

তখন ছাগ-মেষাদির বধ-জনিত অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এবং অনুতাপানলে হৃদয়কে কেনই বা দগ্ধ করিবে না? এই অনুতাপ-অগ্নির তীব্র দাহনে মানুষ যখন অধীর হইয়া পড়ে, সেই সময় হৃদয়ে ঐ সত্যানুরাগ উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইলে, তখন আপনা হইতেই রুচি, অভেদ ভালবাসার সহিত পরিচয় করিয়া দেয়। ঐ ভালবাসার সঙ্গে যতই প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইবে, ততই সাধন-স্পৃহা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কেননা, ভালবাসা রুচির প্রিয় সঙ্গিনী সখী—বস্তুতঃই উহাদের আবেগপূর্ণ আগ্রহের আতিশয্য বশতঃ সাধন-ব্যাহন্তা রিপুকুল ইস্নুরমূল-স্পর্শ সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া দূরে অবস্থিতি করে। তখন উপযুক্ত অনুতাপ-গ্রস্ত মানবের অবস্থা বদলাইয়া যায়। সকল প্রকার প্রাণীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আকুল হয়। পথিমধ্যে নিরাশ্রয় রোগ-পীড়িত ভাইটীর ক্ষত অঙ্গে ঔষধি লেপন এবং সেবা-শুশ্রূষাদি করিয়াও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। ইহার অন্তঃপ্রবেশিনী শক্তিরূপা ঐ হৃদয়ভেদী রুচি ও অভেদ ভালবাসা, ইহাদের বিশুদ্ধ আনুগত্যেই প্রত্যেক শরীরের পার্থক্য-জনিত প্রাণের যে "ভেদত্ব," তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। নীচ উচ্চ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাব আর থাকে না, সমপ্রাণতার স্নিগ্ধ শাসনে সম্মান অভিমানের উন্নত মস্তক অবনত হয়, এবং অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃপ্রেম জাগিয়া উঠে। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, "সত্যানুরাগই" যখন রুচি ও অভেদ ভালবাসার সঙ্গীভাবে মানব প্রকৃতির পবিত্র ভাবের কারণ হইল, তখন প্রকৃত সত্যে নির্ম্মলানুরাগ জন্মিবার উপায় কি?—কিরূপেই বা সেই অনুরাগ, সত্য বস্তুতে নির্ভর করিতে সক্ষম হয়? বস্তুতঃই প্রাণিজগতে প্রাণি-লীলার বিবিধ কার্য্যোপযোগী বৃত্তি-সমূহ ও শুভাশুভ উভয় দিকেই চলে। অনুরাগ ও আসক্তিতে আকৃষ্ট হইলে বিপদ সংঘটিত করে। অথচ ঐ অনুরাগই সত্য-নিষ্ঠ হইয়া উজ্জ্বল স্বভাব গ্রহণ করিতে পারে। একটী সহজ কথাতেই বুঝুন, একজন বিবিধ ক্রীড়াসক্ত সমবয়স্ক ব্যক্তির সহিত আপনি মিলিত হইয়াছেন, তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ঈদৃশাবস্থায় আপনার সাধ্বী স্ত্রী—পতিভক্তির মধুর আকর্ষণে সেই ভীষণ ব্যসন-কলুষিত অনুরাগটিকে বহুযত্নে পবিত্রতার উচ্চাসনে টানিয়া আনিলেন, সুতরাং দাম্পত্য ধর্ম্ম-শৃঙ্খলে অনুরাগ বদ্ধ হইয়া সত্যের জন্য উন্মত্ত হইল। এইরূপ সাধ্বী-রমণী এবং প্রিয়তম বন্ধু দ্বারাও অনুরাগকে সবশে আনিতে পারা যায়। যে কোন ভাবেই হউক, তাহাকে

সত্যে নিবদ্ধ রাখিলে, সে আর ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সত্যপ্রিয়তাই অনুরাগের একমাত্র সম্বল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, রসায়ন, যোগ, ধর্ম্ম, সেবা প্রভৃতি যে তত্ত্বেরই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, অনুরাগ ব্যতীত কোন তত্ত্বই সাধন করা যায় না। তবে এখানে বলিতে পারেন যে, জগতে মানবদিগের মধ্যেও দেখা যায়, কাহারও দ্বেষ, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতির কার্য্য অধিক, কাহারও বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি সাত্ত্বিকগুণ সকল প্রবল। ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বিজ্ঞানের একটু চিন্তা করা নিস্প্রয়োজন নহে। ভৌতিক তত্ত্বের পরমাণুর বিশ্লেষণ প্রযুক্ত স্থূল পদার্থও পিতামাতার শোণিত-শুক্র মধ্যে মিশিয়া থাকে। উপাদানের বিভাগ ব্যত্যয় জনিত দৈহিক-ভাব সমূহ বিকাশ পায়। ঐ উপাদান-ভেদে সৃষ্টির ভিন্নতা নিবন্ধন।।সদসদ্ বৃত্তি-সমূহ পরিস্ফুট হয়। এবং জনক-জননীর অবস্থা ও তাঁহাদের চিন্তা-শক্তির আকর্ষণে মনের গতির দ্বারা বিকার নির্ব্বিকার শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাব পুত্র-কন্যার প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতা-মাতার কোনরূপ উৎকট ব্যাধি থাকিলে সন্তান-সন্ততিতেও ঐ ব্যাধিটী সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু রোগের যেমন ঔষধ আছে, তেমনই কলুষিত বৃত্তি সকলও সাধুসঙ্গ, সদালাপ সচ্ছাস্ত্র দ্বারা শোধিত হয়। কারণ শরীর তত্ত্বের কোনরূপ অভাব হইলে, ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে, অথচ ঐ অভাবটী ঔষধে পূর্ণ করিলে, রোগী আরোগ্য লাভ করে। বৃত্তি সকলও শুভতত্ত্বের সংযোগে উজ্জ্বল স্বভাবে পরিণত হয়। অতঃপর সাধন ক্ষেত্রে অটল ও দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিলে অনুরাগও অনুগত থাকিবে। নিরাশার কোন কথা নাই।

যাহা হউক, সংক্ষেপে প্রাণের স্থিতি সম্বন্ধীয় একটু আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ আত্মার কিরণ স্বরূপ। আত্মারই প্রকার ভেদ শক্তি জগৎ সমূহে বিকাশ পাইয়া থাকে। জড় জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একই প্রাণ-প্রবাহ প্রাণিগণের অস্তিত্ব রূপে স্থিতি করিতেছে। জড় বিকাশেও ইহার স্থিতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে যে, জগতের কোনও একটী দৈহিক ভাবে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাদিতেও প্রাণের গতিপ্রবাহ চলিতেছে এবং অচেতন ধাতু প্রস্তর মধ্যেও ঐ অখণ্ড শক্তির স্থিতি বিলুপ্ত নহে, ইহাও জড় বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে সক্ষম। কিন্তু উদ্ভিজ্জে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রত্যক্ষ ও প্রস্তরাদি অচেতন বস্তু মধ্যে অস্পর্শ ভাবে চিৎ শক্তির কার্য্য চলিতেছে, ইহা স্বীকার করিলেও মানুষ ঐ সমূহ জড়ীয় তত্ত্বের বিকারে প্রাণকেও খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রাণ-যোগের

গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে বিঘ্নোৎপাদন করে। সূক্ষ্ম দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই মহাপ্রাণের অখণ্ড প্রবাহ অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া স্থিতি করিতেছে। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলই একই প্রাণের অখণ্ড শক্তিতে নিবদ্ধ আছে। এবং শূন্যভেদী আত্মার অসীম ইচ্ছাতেই গ্রহ উপগ্রহ সকল নিজ নিজ কক্ষ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছে। আবার অণুস্বরূপে প্রাণেই বিজড়িত থাকে, সমষ্টিতে স্ব স্ব আকৃতিতে বিকাশ পায়। কিছু ছিল না, এখন হইল, ইহা বিকার দর্শন ব্যতীত আর কিছু নহে। সকলই অনন্ত কালের বক্ষে রহিয়াছে। শূন্য বাদীরা যে আকাশকেই সৃষ্টির কারণরূপী বলিয়া মনে করেন, তাহা একটু চিন্তা করিবার বিষয়। কারণ, যখন আকাশকে তত্ত্বদর্শী মনীষীরা ভূত তত্ত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন উহা সৃষ্টি বিষয়ের কোনও বস্তু উৎপাদনের শক্তি ধারণ করিতে পারে না। অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, আকাশও বিশ্ব সমূহের অঙ্গ মিশ্রণের একটী আধার মাত্র। শূন্যাস্পর্শাতীত অখণ্ড আত্মাই একমাত্র কারণ স্বরূপ নিয়ন্তা। তবেই বলিতে পারা যায় যে, স্থূল জগতের পরমাণুর ভিতরে এবং সকল প্রকার দৈহিক কার্য্য শক্তিতে প্রাণের গতি অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহার অব্যর্থ ইচ্ছার কার্য্য সমূহ বন্ধ থাকে না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিশ্ব-মগ্ন প্রাণিগণের মধ্যে বিকার নির্ব্বিকার কার্য্য সকল প্রত্যক্ষ হয় কেন? বস্তুতঃই উহা দৈহিক তত্ত্বের বিশেষত্ব মাত্র। পার্থিব শরীর সম্বন্ধে চিন্তা করিলে জানা যায়, সকল প্রকার জন্তুতেই পরস্পর প্রকৃতি-সমুদ্ভূত পশু চরিত্র রহিয়াছে। মানবাদির উন্নত জ্ঞান প্রভাবে অবশ্য তাহার তিরোধান হয়, কিন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি ষড়্‌রিপু জ্ঞানে পরিচালিত, এজন্য তাহাদের পাশব প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত। তৎসত্ত্বেও প্রাণের গতি ও স্থিতি ভাবের বিভিন্নতা নাই। এমন কি, হৃদয়স্থিত স্থূল বায়ুরূপী প্রাণেরও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায় না। অথচ ঐ বায়ুরূপী প্রাণ-তত্ত্বও জন্তু সমূহের হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া, ফুসফুসাদি যন্ত্রের কার্য্যক্ষেত্রে স্থিতি সত্ত্বেও জড়। উহার পশ্চাতে চিন্ময় প্রাণের তরঙ্গ রহিয়াছে, সেই তরঙ্গ বলে দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ সকল বিষয় পরে বিবৃত হইবে। এক্ষণে প্রাণ-তত্ত্বের একত্বের সহজ উপায় কি, তাহারই একটু আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা স্থূল জ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ সূক্ষ্ম চিন্তা প্রদেশে উপস্থিত হইতে পারি না। এজন্য চিৎতত্ত্বের অনুসন্ধানে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেহের স্বাতন্ত্র্য ভাবজনিত প্রাণকে খণ্ড ভাবে বুঝিতেছি। ফলতঃ দিব্য চক্ষু উন্মেষিত হইলে স্পষ্টই

দেখা যায়, প্রাণ অখণ্ড চিন্ময় জৈবিক প্রবাহ, ইহার স্থিতিভাবের তারতম্য নাই। শরীরোপযোগী কার্য্য ভাবটাই আমরা দর্শন করিয়া থাকি। যোগীরা যোগ সাধনের প্রারম্ভেই প্রাণযোগের নিমিত্ত প্রথমতঃ অভেদ ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। সাধন সিদ্ধ হইলে প্রাণ যোগের স্বাভাবিক পথ খুলিয়া যায়। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, ঐ অভেদ ভক্তিই এক করিয়া দেয়। বাহ্য প্রক্রিয়ার বল আর গ্রহণ করিতে হয় না। বাস্তবিকই প্রাণ-যোগ স্থূল প্রাণায়ামের অতীত। প্রাণের "ভেদত্ব বিনাশ," উহাই প্রকৃত "প্রাণায়াম," ইহারই আশ্রয়ে মানুষ সাধনের পথে অগ্রসর হইয়া যোগাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পূত-প্রজ্ঞা বলে স্বাভাবিক যোগের সরল তত্ত্ব সমূহ হৃদয়-গ্রন্থে বুঝিতে পারে। নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র গঠন করিতে পারিলে তখনই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকার জন্মে। সকলের মধ্যে অভিন্ন প্রাণের যোগ—জ্যোতিশ্চক্ষুতে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়, এবং সরলতার অমিয় আকর্ষণে প্রীতির অব্যাহত গতি প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়, প্রাণীভেদ, ধর্ম্মভেদ, আসক্তি-জনিত রুচিভেদ—এই সকল ভীষণ বিঘ্ন দ্বারা সাধনের যে অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও জানিতে সক্ষম হয়। জগতে যত প্রকার ভেদ দেখা যায়, তাহার মধ্যে "প্রাণী ভেদ"ই, যোগের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, প্রাণ-তরঙ্গটী অবলম্বন না করিলে, আত্মার সহিত যোগ হওয়াও অসম্ভব। এখানে যুক্তি ও বিচার-জ্ঞান পরাস্ত—স্বাভাবিক জ্ঞানের সর্ব্ব প্রকার অধিকার আছে। এই জ্ঞানকেই অনাবৃত তত্ত্ব-জ্ঞান বলে। ইহারই সাহায্যে সরল যোগ-পথ লাভ হয় এবং উৎকট সাধনের নিমিত্ত সময় পাত করিতে হয় না। ইহাতেই হৃদয়-নিঃসৃত অভ্রান্ত তত্ত্ব সমূহ আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া নিরাশার ঘোর তিমিরে আশার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকাশ পায় এবং হৃদয় মধ্যে কি যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস মুহুর্মুহু উত্থিত হইতে থাকে, তাহার আবেগ ধারণা করা বড় সহজ নহে। ইহার মূল কারণই প্রাণের সর্ব্বগত একত্ব ভাব।

প্রাণ, বাহ্যেন্দ্রিয়াদিতে পরিচালিত নহে। আত্মার শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞান ভিন্ন এই গূঢ় তত্ত্বের সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইতে পারে না। শরীরস্থ ভৌতিক পদার্থ সমূহ ও স্নায়ু মণ্ডল প্রভৃতি ঐ প্রাণেরই প্রতিঘাতে সঞ্জীবিত ও পরিচালিত; কেননা প্রাণ যে আত্মার চিদাভাস। তাহারই সাধনাতে মনঃশক্তি ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়াদির বহির্মুখ গতির পথ রোধ হয়। তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ মনঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়াদি বল এখানে তুচ্ছ—কারণ অতীন্দ্রিয় পরম বস্তুর সাধনে

যখন উহারা দমিত বা পরাজিত হয়, তখন কঠোর প্রক্রিয়ার প্রতি স্পৃহা প্রদর্শন করা সময় পাত ব্যতীত সম্ভব নহে। শান্তির অমৃত ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে, প্রাণীতত্ত্বের ভিতরে প্রাণের মধুর প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া আত্মার চিৎ-প্রভার স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাধারে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই প্রাণই চিন্ময়-রাজ্যের অসীম জ্যোতিতে মিশিয়া যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আকুল করে এবং স্বাভাবিক যোগের সহজ ভাবে অন্তঃকরণ শান্তিরসে আপ্লুত হয়, আর বাহ্য-জগতের সঙ্কীর্ণতাদির প্রাদুর্ভাব প্রবল হইতে পারে না। বহিশ্চিন্তা সকল দূরীভূত হইয়া মনের একাগ্রতা, শুভবৃত্তি-সমূহের সদ্ব্যবহার, আসক্তিময় প্রকৃতির নির্ম্মল চরিত্র বিকাশ পায়। ক্রমে ক্রমে সাধনের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি পরিস্ফুট হইতে থাকে, যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে, সমস্তই যেন আপনার বলিয়া বোধ হয়। বলিতে কি, ঐ কতক্ষণ রুগ্ন-ভগ্ন-শরীর দরিদ্র ভাইটীর মুখ চুম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই দিক্‌ভেদী বিশুদ্ধ সময়ে হৃদাকাশ মহাকাশ এক হইয়া যায়। বস্তুতঃই তাহার অভ্যন্তরে অসীম মহা চৈতন্যের সত্ত্বা-সিন্ধুর অতল-তলে প্রবেশ করিবার শক্তি জন্মে ও ভূমানন্দ লাভ হয়। স্বভাবতঃই প্রাণী ও প্রাণের মহা মিলনে আত্মার অমিয়-প্রবাহ অন্তঃকরণের গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া শান্তির স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসে শীতল করে। স্বাভাবিক যোগনিষ্ঠ যোগীরা কৃচ্ছ্র সাধন শৃঙ্খলে আর বদ্ধ না থাকিয়া দেব প্রদত্ত সহজ সরল পন্থার অনুশীলনে ব্যগ্র হন। তাঁহারা কোন প্রকার বাহ্য প্রণালীর প্রতি নির্ভর করেন না। সেই অনাদি অনন্ত-প্রসারিত মহাজ্যোতির ভিতরে হৃদয়ের বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নিমিত্ত নিয়ত নিরত থাকেন। এবং প্রাণযোগের মধুর তরঙ্গে ডুবিয়া যান।

দ্বিতীয় উল্লাস

সাধন।

সকল প্রকার যোগ শাস্ত্র মধ্যে "রাজযোগ" অতি প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিরা যে এই যোগের অষ্টাঙ্গ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অতি গভীর ও প্রাণস্পর্শী উপদেশ। ঈদৃশ উচ্চযোগ-সাধন সম্বন্ধে কোন অভাব চিন্তার কারণ নাই। তবে একটী বলিবার কথা এই যে, কালের বিবর্ত্তনে প্রাচ্য-প্রথাগুলির অনুশীলন করা বড়ই সময় সাপেক্ষ। আমার মনে হয় প্রথমেই যখন আসন-সিদ্ধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতীচ্য স্তরের শরীর স্থায়িত্বে অসম্ভব, তখন ভৌতিক দেহের আভ্যন্তরীণ স্নায়ু ক্রিয়া ও প্রত্যেক যন্ত্রস্থিত কার্য্য সমূহ সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হওয়া অতীব কঠিন। বিশেষতঃ বায়ু-প্রবাহকে পূরক, স্তম্ভন, রেচক এই ত্রিবিধ প্রকরণে স্থূল প্রাণায়াম দ্বারা ষটচক্র ভেদ পূর্ব্বক মেরুদণ্ডে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রধান স্নায়ু মণ্ডল মস্তিষ্ক অর্থাৎ সহস্রায় ঐ বায়ু-প্রবাহকে স্থির রাখিতে পারিলে, অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হয়। কিন্তু ঐরূপ সাধন সর্ব্বজন সুলভ-পন্থা সম্বন্ধে যেন একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। মেরুদণ্ডটী অবাত কম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থির ভাবে রাখিলে, ঐ বায়ুর গতি শক্তি রোধ হইবে। এরূপ চিরসমাদৃত মহাসাধনে রসনা পরিচালন করিবার কোন সুযোগ না পাইলেও যদি কেহ বলেন, কোন উচ্চমনাঃ যোগীপুরুষের গ্রীবা ও কটিদেশ বক্রভাবাপন্ন হয়, তবে তাঁহার সম্বন্ধে বিধান কি?—ইহার উত্তরে কি বলিতে পারা যায় না যে, ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও অবিচ্ছিন্ন চিন্তা—এবং সাধন-দৃঢ়তার ঐক্য বন্ধন—ইহাইত মনের সহিত সম্বন্ধ? চিত্ত গাঢ় প্রেমে আকৃষ্ট হইলে, শরীর যন্ত্রটী বিঘ্নপ্রদ যে ভাব লইয়াই থাকনা কেন? সাধন-সুহৃৎ অনুরাগ আসিবেই আসিবে। বস্তুতঃ ঐ একাগ্রতাই দৈহিক উপদ্রব নিবারণের প্রধানতম সহায় হইবে। যাহা হউক, ভারতে রাজযোগ ও সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগশাস্ত্র আছে, তাহা সমস্ত মন্থন করিয়া একেশ্বরবাদী যোগিগণ স্বাভাবিক যোগেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও তাহার উজ্জ্বলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কেননা সকল প্রকার যোগশাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ স্বাভাবিক যোগ।

যোগাভ্যাসের যন্ত্রস্বরূপ শরীর। তাহার কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে, সাধনের বিঘ্ন সংঘটিত হয়, তজ্জন্য রাজযোগে সুস্থ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা উপায় নির্দ্ধারণ আছে। কিন্তু এটিও অতি সত্য যে, চিত্তকে অবিচ্ছিন্নকাল ভগবানের দিকে ফিরাইয়া রাখিলেই শরীর নির্ব্যাধিযুক্ত থাকে, এখানে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। কিন্তু স্থূল তত্ত্বের সাহায্য দ্বারা যে, শরীর পুষ্টির সম্যক বিধান বা প্রক্রিয়া জনিত স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন উপদেশ শুনা যায়, উহা বর্ত্তমানে অনেকে গৌণ-বিধি এবং কঠোর সাধন বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন। এই ঘোর প্রতীচ্য সময়ে একেত অনেকে যোগাভ্যাসের প্রতি আদবেই ইচ্ছা করেন না, যদিও বা কাহারও কাহারও একটু যোগ শিক্ষার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু ঐ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ীর সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বায়ু প্রবেশ প্রভৃতি ব্যাপার অতিশয় দুঃসাধ্য মনে করিয়া তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইতে আর বিলম্ব করেন না। এটি বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এখানে অবশ্যই বলিব যে, স্বাভাবিক যোগ বলে দেবকল্প ঋষিগণ মধ্যেও অনেকে বাহ্য ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনের অক্ষয় শক্তি লাভ করিয়াছেন।

যাহা হউক, যোগশাস্ত্র সমূহের উপদেশ যে, শরীর সুস্থ রাখিয়া যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে অনুকূল পথে উপস্থিত হওয়া যায়, এবং প্রক্রিয়ালব্ধ শরীরটীও অনায়াসে শতাধিক বৎসর যুবকের ন্যায় সংসারে অবস্থিত করে। কিন্তু এটিও ধ্রুবসত্য যে, দেহের বাহ্যান্তর উভয় প্রদেশের স্নায়ু ও শোণিত পেসি প্রভৃতি সমস্তই যখন সেই মহাশক্তিরই আশ্রয়ে আছে, তখন তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই ত স্বতঃই দৈহিক তত্ত্ব সমূহ পরিস্ফুট ও পরিচালিত হইতে পারে। এবং শরীরের কোনও স্থানের কণামাত্র বিকৃত বা অপূর্ণ থাকে না, নবযৌবনবৎ দেখা যায়। তবে কি বলিতে পারা যায় না যে, ক্রিয়াজনিত যোগ-সাধন অপেক্ষা উহা সরল সাধনের সহজ পন্থা অতি নিশ্চিত। আত্মার প্রত্যক্ষানুভূতি যতই প্রবল হইবে ততই মেদ-পুরীষাদি পূরিত শরীর-ভাবটী দেব-ভাবে পূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ শতাধিক বৎসর কেন, তাহারও অধিককাল স্থায়ী থাকিতে পারে। এবং সুস্থ স্বাস্থ্যে ও আত্মার স্বরূপ সত্তার সংস্পর্শে, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতাদি ইহারাও উজ্জ্বল প্রকৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক শরীর, মন, আসনকে এতই দৃঢ় করে যে, একটী পলকের জন্যও যোগীকে বিচলিত হইতে হয় না। এখানে একটু ভাবিয়া দেখুন; যাঁহার প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে হরিনাম বা যে কোন প্রীতিপূর্ণ নাম অবিশ্রান্ত চলিতেছে, নিমেষ কালের জন্যও অবকাশ নাই

তাঁহার আবার প্রাণায়াম দ্বারা, কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগে মনকে স্থির করার প্রয়োজন কি? যোগীর সময় কোথায় যে, ঐ সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন? তখন তাঁহাকে এমনই অকৃত্রিম ব্যাকুলতা আসিয়া আকুল করে যে, আপনা হইতে ঐ শ্বাস প্রশ্বাস স্তম্ভিত হইয়া যায়। স্বাভাবিক ঐশী শক্তিতেই যন্ত্র সমূহ ও স্নায়ু শোণিতাদির ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকিবে, এবং সাধনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

নিশ্চয়ই বলিব যে, অন্তরের সেই স্বাভাবিক স্থির বায়ু কর্ত্তৃক শরীরের স্বাস্থ্য-সুস্থতা সমভাবে থাকিবে ও আত্ম দৃষ্টির উজ্জ্বল পথ পরিষ্কার হইবে। সেই সময় অন্তরেন্দ্রিয় সমূহ ঐ জ্যোতি-যুক্ত দেব-প্রদত্ত পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। তখন আর বহিরেন্দ্রিয় কিম্বা স্থূল তত্ত্বের দ্বারা কোনরূপ সাহায্য লইতে হইবে না। হৃদয়ের গূঢ় প্রদেশে স্বাভাবিক প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, বিঘ্ন বিড়ম্বনাদি কিছু থাকিবে না। তবেই বুঝিতে হইবে যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত পার্থিব তত্ত্বের মিলন অতি অসম্ভব। আমরা যতই কেন ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াই না, পরিশেষে সেই মহাশক্তির আশ্রয় লইতেই হইবে। কিন্তু ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সাধন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, কোনরূপ পার্থিব সাহায্যও আবশ্যক। কেননা, প্রক্রিয়া বল গ্রহণ না করিলে, সাধনে সিদ্ধি লাভ করা বড় সহজ নহে! এ কথার প্রতিবাদের কোন কথা নাই, তবে সাধনের সরল পথ অন্বেষণ করাই উচিত। তজ্জন্য একটু চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন নহে। সাধনও দুইটী ভাবে বিভক্ত। একটী প্রক্রিয়ালব্ধ স্থূল ভাব জড়িত। অপরটী ঐশীভাবের সহিত নিবদ্ধ! কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনে সম্পূর্ণ ঝোঁক না দিয়া শেষোক্ত ঐশী ভাবে নির্ভর করিলে, সাধনে কোনই বিপদ সংঘটিত হয় না। বুঝিতে হইবে যে, একটী ভৌতিক তত্ত্ব বায়ু-প্রবাহ লইয়া যাহাই সাধন করা যায়, তাহা যে জড়ীয় ভাবের অঙ্গীভূত ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়া সমুদ্ভূত, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু উহার প্রয়োজন হইলেও গৌণ কালের প্রতীক্ষা সাপেক্ষ। মূল কথা এই যে, মন বা চিত্তের একাগ্রতাই বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মন ও চিত্ত ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক বলিবার কথা আছে। যাঁহারা যোগ-শাস্ত্র সকল দেখিয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। এ হেন সামান্য ব্যক্তির দ্বারা ইহার আলোচনা কি সম্ভবে? কিন্তু তত্ত্ব-চিন্তা অতি দুর্জ্ঞেয় সত্ত্বেও উদাসীন থাকা উচিত নহে। এখানে উহার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন হইলেও সংক্ষেপে

একটু বলিব। মনের ধাতুই (মন) এবং চিত্তের ধাতু (চিৎ) উভয়ই সম শক্তিতে আকৃষ্ট। কারণ, ঋষিরা মন ও চিত্তকে অন্তরেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, সুতরাং উহারা উভয়ই সমভাবাপন্ন। কিন্তু চিত্ত চিদ্ধাতু নিবন্ধন সম্বিত প্রভাযুক্ত—এই মাত্র বিশেষত্ব! ফলতঃ উহারা উভয়েই সময়ে সময়ে বিশ্ব-বিচিত্রতার ভিতরে বিকার গ্রস্ত হয়। উহাদের নামে এবং ধাতুগত জীবনে প্রভেদ থাকিলেও পরস্পর যেন মণিকাঞ্চনের ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সুখ, দুঃখ, শুভ, অশুভ, ভাল, মন্দ প্রভৃতি কার্য্য সমুদয় বহন করিয়া প্রাণিজগতের লীলা তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে ভাসিতেও কুণ্ঠিত নহে। এবং জাগতিক উত্তেজনায় নানা ভাবের ভিতরে বিচরণ করিয়া প্রাণি সমূহকে পরিচালিত করে। কখন চঞ্চলতার আঘাতে কুপ্রবৃত্তির বশীভূত! কখন বা শুভবৃত্তির সহবাসে ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে পরিণত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে সক্ষম না হয়, সে পর্য্যন্ত অস্থিরতার আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। এই কারণে যোগীরা প্রথমতঃ চিত্ত বা মনের সংযম ও আসন সুদৃঢ় জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান আসন দৃঢ় করিবার বিষয়। আমার মনে হয়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম, কম্বল, কুশাসন এ সকল না থাকিলেও চলিতে পারে। কেন না, বিশ্ব-ক্ষেত্রই একমাত্র বসিবার আসন রহিয়াছে। পর্ব্বত, মরু, শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ ও প্রাঙ্গনে, যে স্থানেই হউক না কেন, দৈহিক ব্যস্ততা আলস্য, জৃম্ভন, গাত্রসঞ্চালন প্ভৃতি উপদ্রব প্রবল থাকিলে, কোন স্থানেই কিছু হয় না। সহিষ্ণুতার সহিত বসিবার দৃঢ়তাই প্রকৃত আসন। যিনি যে ভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই সহজ। পূর্ব্বোক্ত আসন-বিঘ্ন প্রদাতা জৃম্ভনাদিকে স্ববশে আনিবার বিশিষ্ট উপায় অভ্যাস। কিন্তু অভ্যাসও দুইটী ভাবে আকৃষ্ট—একটী বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রত্যাশী। অপরটী ঈশ্বরে নির্ভর প্রত্যাশী। ফলতঃ এই উভয় ভাবেই অভ্যাসের ঘনত্ব স্থায়ী হইলে, আসনের বিঘ্নপ্রদ শত্রুগুলি দূরীভূত কেন হইবে না? যাহা হউক, উভয় ভাবের অভ্যাস-গতির সমশক্তি অবলম্বন সত্বেও বাহ্য সাহায্য জনিত অভ্যাসযোগ হইতে নির্ভর প্রত্যাশী অভ্যাসটী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কেননা পরিশেষে ঐ বাহ্য অভ্যাসের অভিলাষটী পরিত্যাগ করিয়া নির্ভর অভ্যাস-যোগের আশ্রয় লইতেই হইবে। ইহারই সাধন-সিদ্ধ হইলে, চিত্ত বা মনের বিক্ষিপ্ত ভাব আর থাকিতে পারে না। ঐ নির্ভর সাধনে চিত্ত নিরোধ, ইন্দ্রিয় দমন, দৃঢ় আসন সহজেই হইয়া যায়।

কোন প্রকার কঠোর নিয়মের সাহায্য লইতে হয় না। যদি কথা উঠে যে, বাহ্যক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত নির্ভর অভ্যাসটীরও জীবন্ত শক্তি সহসা আসিতে পারে না; ইহার উত্তরে স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, এখানে তৎসম্বন্ধে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি যে, ঐ পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাটী মৃত্তিকাদি লইয়া রন্ধন-শিক্ষা করিতেছে কিন্তু সে জানে ঐ সমস্ত রন্ধন দ্রব্য পরিত্যজ্য—কারণ উহা খাদ্য বস্তু নহে। তখন হইতেই যদি বালিকাটী প্রকৃত রন্ধন শিক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহার অমূল্য সময় নষ্ট হইত না; ঐ সময়টুকু মধ্যে আরও অধিক পাক-পারিপাট্য ও নানা উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইত। তাহাকে পূর্ব্বের বিপুল পরিশ্রমের ঐ কৃত্রিম দ্রব্যাদির খাদ্য সমূহ পরিত্যাগ করিতে হইত না। যদি কেহ বলেন, ঐ উভয় রন্ধন শিক্ষার মূল তত্ত্ব ত এক—তবে ঐরূপ রন্ধন শিক্ষায় দোষ কি? তা বটে, কিন্তু উহাতে একটু বিশেষত্ব আছে যে, প্রথম শিক্ষাটী অসত্যে জড়িত। দ্বিতীয়টী নিশ্চিত সত্য—আপনি ঐ অসত্য প্রণালীটী পরি-ত্যাগ করিয়া সত্য শিক্ষারই উপদেশ দিবেন। এমতস্থলে প্রথম হইতে নির্ভর অভ্যাস যোগের সাধন করাই তো সকলের কর্ত্তব্য।

এখন সাধনে বসিবার কথা। শরীর-বিজ্ঞানে বর্ণিত আছে, দেহের যাবতীয় কঙ্কাল বা অস্থি এক মেরুদণ্ডে গ্রথিত রহিয়াছে। শরীরের আভ্যন্তরীণ ফুস্‌ফুস্‌ প্লীহা, যকৃত এবং ত্বকাদির আবরণ প্রভৃতির মধ্যগত স্নায়ু সমস্তই ঐ মেরুদণ্ডের সহিত জড়িত। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী ত্রয়ের সূক্ষ্ম রন্ধ্রভেদী বায়ু প্রবাহ ক্রিয়া তাহাও তাহারি সাহায্য। অতঃপর উহাকে এমনই স্থির রাখিতে হইবে যে, ঠিক কলিকাতার মনুমেণ্টটী ঊর্দ্ধ ভেদ করিয়া যেন রহিয়াছে, একটু এদিক ওদিক হইবে না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গাধীনে একটু বলিতে হইল। কে বলিবে, প্রক্রিয়া যোগাভ্যাসটি কিছু নয়—তবে কথাটী এই যে, বায়ু প্রবাহি নাড়ী স্থিত স্নায়ু শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন গতি ঠিক সোজা ভাবেই যে চলে এমত নহে। বক্র মেরুদণ্ডেও সুষুম্না নাড়ীর সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। নদীর তরঙ্গ যেমন বিবিধ বক্র গতিতেও সাগরাভিমুখে চলিয়া যায়, তেমনই সাধন চিন্তাও স্থির ভাবে সরল বক্র উভয় প্রদেশ ভেদ করিয়া অচিন্ত্য অনাদি নিত্য নিরাময় স্থানে যাইতে পারে। মেরুদণ্ড বক্রই হউক, আর ঐ মনুমেণ্টের মতই থাকুক, মনের একাগ্রতার সাহায্য পাইলে কিছুতেই চিন্তা শক্তির গতি রোধ হইবে না। এস্থলে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, গ্রীবা, কটি, পৃষ্ঠদেশ বক্র থাকা সত্ত্বেও অভীষ্ট সাধনে হতাশ

হইতে হয় না। বরং সাধনচিন্তা ও অভ্যাসশক্তি বলবতী হইয়া বিদ্যুৎ গতির ন্যায় চলিতে থাকে, কোন রূপ বাধা পায় না। আপনি মনে করুন, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফের তার কতস্থলে কত বক্র ভাবে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতার তার-যন্ত্রে খবর দিলে কত অল্প সময়ে ইংলণ্ডে পঁহুছে! তবেই বুঝুন, তাড়িৎ শক্তি হইতে কি চিন্তা শক্তির গতি দুর্ব্বল? ইহা কেহই বলিতে পারেন না যে, মনঃশক্তির অগ্রে জড়ীয় শক্তি যাইতে পারে। মনের একাগ্রতাই প্রাণায়ামের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। বস্তুতঃ সাধন-চিন্তা ভগবদ্‌মুখিনী হইলে, তাহাকে শরীর স্থিত কোনও পদার্থ টানিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। ফুস্‌ফুস্ পেশী মণ্ডল স্থিত শক্তি, মেরুদণ্ডের বক্রভাব সত্বেও তাহার গতি রোধ হয় না। সেই চিন্তা-শক্তি বাহ্য প্রদেশের অতীত চিন্ময় রাজ্যে উপস্থিত হইলে, বাহেন্দ্রিয়াদি ও রিপুকুল সকলেই নিরস্ত হয়। এমত অবস্থায় মেদ-পূরীষময় স্থূল শরীরের বাহ্যক্রিয়াদি কেন পরাস্ত হইবে না? আবার দেখুন, শুভ মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবানুগ্রহে স্বর্গীয় উপাদানে যোগ শরীর গঠিত হইলে ঐ পার্থিব শরীরেই ফুটিয়া উঠে। সেই সিদ্ধ শরীর স্পর্শে ভৌতিক তত্ত্বময় দৈহিক ভাব ও সাধু ভাবে পরিণত হইয়া নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ভাব গ্রহণ করে। তখনই বিশুদ্ধ গতি-প্রবাহিনী-চিন্তা শক্তি অসীম চিৎতরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া যায়। এই সময় আসক্তি বিষয়-বাসনাকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে অবস্থিতি করিতে থাকে। এবং মোহময় তিমির রাশি ঐশী উজ্জ্বল মহজ্জ্যোতিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে সাধন চিন্তার উৎসাহ উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া শরীরস্থ সমস্ত ক্রিয়া-যন্ত্রে বহিতে আরম্ভ করে। নীরস তরু সমূহের মূল দেশে জল সেচন করিলে যেমন তাহাদের নব পল্লব-শোভা বিকাশ পায়,তেমনই নিরাশা-সন্তপ্ত শুভবৃত্তি সমূহ আশার আশ্বাসে সাধু সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া সাধনের সহায়তা করিতে যেন আর সময় পায় না। তখন চিন্তা-শক্তির স্পৃহাবল আরও প্রবল বেগে চলিতে থাকে। কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন মানে না, তাহাকে বিচার যুক্তির গণ্ডিতেও আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এইরূপ বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সাধনের অক্ষয় ভিত্তিরূপ বিশ্বাসকে দেখা যায়। চিত্তের চাঞ্চল্য বা কোনও সাধন-শত্রু বাধা দিতে সাহসী হয় না। যোগী নির্ব্বিঘ্নাসনে সাধন চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি"; বস্তুতঃ বিশ্বাস ধর্ম্ম সাধনের ভিত্তি। রুচিই হউক, আর বৈরাগ্যানুরাগই হউক, যদি বিশ্বাসবল না থাকে,

তবে যুগ যুগান্তর বসিয়া চিন্তা করিলেও কিছু হয় না। কারণ, যে দুর্লভ্য পরমানন্দময় বস্তু লাভ করিবার জন্য যোগী, ভক্ত, সাধক সর্ব্বদা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাহার প্রতি যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারা যায়, তবে যে সাধন-চিন্তার মহতোদ্দেশ্য সকলই একেবারে বৃথা হয়। এইরূপ অবস্থার সময়ে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, বিশ্বাসের বিশুদ্ধ বল ব্যতীত অভীষ্ট সিদ্ধির অন্যবিধ উপায় নাই। অভ্রান্ত সত্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাসকে এমনই ভাবে জড়িত রাখা চাই যে, তদ্দ্বারা সাধনের অনুকূল পথের মুখ আরও উন্মুক্ত হয় এবং শুভ ইচ্ছার সংস্রবে বিক্ষিপ্ত চিন্তার প্রখর গতি চলিয়া যায়। সততই মনে রাখিতে হইবে যে, সাধনে বিশ্বাস না জন্মিলে উহা "শিরঃ নাস্তি শিরঃ পীড়া" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বাস হৃদগত হইলেও ভাবিব না যে, আমি বিশ্বাসকে আপন আয়ত্বে আনিয়াছি। বিশ্বাস একদিকে বজ্রবৎ কঠিন, অন্য দিকে নবনীতময় কোমল। যখন বিচার জ্ঞানের তীব্র উত্তেজনায় উগ্রভাব অবলম্বন করে, তখন চার্ব্বাককেও পরাভব করিয়া দেয়—আত্মার অস্তিত্বও তাহার নিকট টেকেনা। আবার যদি স্বাভাবিক মুক্ত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে, ঐ মাছিটির ভিতরেও পরম চৈতন্যের স্ফুর্ত্তি বুঝাইয়া দিয়া অজস্র অশ্রু ধারায় বিহ্বল করে। এখন এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে কোনটী গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসকে বশে আনিবার জন্য সাধন করা উচিত? আমার মনে হয়, ঐ স্বাভাবিক মুক্ত জ্ঞানের উপদেশে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, অনন্ত চিৎতরঙ্গের ঘন উচ্ছ্বাস সর্ব্বাধারে প্রত্যক্ষ করাই ত বিশুদ্ধ বিশ্বাস।

সকল প্রাণীতে একাত্মময় দর্শন, উহাই সাধনের নির্ম্মল বিশ্বাস ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা। ঐ আকাঙ্ক্ষার বশে প্রকৃত সত্যের নিমিত্ত প্রাণে এমনই একটী উৎকণ্ঠা আসিয়া পড়ে যে, শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে, ও জাগ্রত বা নিদ্রিত কোন সময়েই স্থির থাকা যায় না। বুঝিতে পারা যায় না যে, কেন এত প্রবল উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়। কোন্ বস্তুর অভাবে ঐ রূপ ঘটিতেছে, তাহার নিশ্চয় হয় না। কেননা যে পর্য্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত "একাত্ম" সাম্যভাব না জন্মিবে এবং বিশ্বাসের সরল রেখা হৃদয়-দর্পণে দৃষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহার গূঢ় তত্ত্ব জানা যায় না। সুতরাং ঐ রূপ উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইবেইত। যেমন একটী মনোমুগ্ধ অতি সুন্দর বস্তু অন্ধকার গৃহে সজ্জিত রহিয়াছে, অথচ দীপালোকের অভাবে তাহার সেই অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয় না, তেমনই একমাত্র বিশ্বাসের অন্যথা-নিবন্ধন সকলই বৃথা হইয়া যায়। শাস্ত্রবিদ মনীষিগণ

বলিয়াছেন, সর্ব্ব প্রথমে বিশ্বাসের সাধন না হইলে, অভীপ্সিত তত্ত্ব বস্তুর আশা করাই ত অসম্ভব! বিশ্বাসবল ব্যতীত যে কোন শুভ তত্ত্বই হউক না কেন, কিছুতেই কিছু করিতে পারে না। শরীরের সকল প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান সত্ত্বেও যদি জীবনীশক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ শরীর পলক কালও সঞ্জীবিত থাকে না। বিশ্বাসের অভাবেও ঠিক তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এখন দেখা যাক্ বিশ্বাসের সাধন কি?—স্বাভাবিক মুক্তজ্ঞান হৃদয়-গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলে, ঐ মুক্ত জ্ঞানই বিশ্বাসকে বশে আনিয়া দেয়। রাত—চোরা গোরু যেরূপ একগাছি দড়ীতে একটী শক্ত খোঁটায় বদ্ধ হইয়া অভ্যাস দোষে ছুটিতে থাকিলেও সে সেই খানেই থাকে, বিশ্বাসও সেইরূপ মুক্তজ্ঞান রজ্জুতে ও সত্যকীলকে নিবদ্ধ নিবন্ধন আর অন্য দিকে যাইতে সুযোগ পায় না। কারণ বিশ্বাসের মলিন স্বভাব ক্রমশঃ উজ্জ্বল আশার সংস্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। তখন সাধনে কোনরূপ বিঘ্ন বিড়ম্বনা আসিতে পারে না। তবেই বুঝিব যে, স্বাভাবিক মুক্তজ্ঞানই বিশ্বাস সাধনের উপদেষ্টা। মানবের হৃদয়নিঃসৃত ঐ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সহিত তর্ক-যুক্তি বিচার জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা নির্ব্বিকার নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ও স্বপ্রকাশ, তন্নিমিত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান সংজ্ঞায় অভিহিত। উক্ত পূত প্রজ্ঞাই মানব চরিত্রকে শুদ্ধভাবে লইয়া সাধনের সহজ পথে উপস্থিত করে। ঐ মুক্তজ্ঞানের স্নিগ্ধ ছায়া স্পর্শ করিলেই আত্মার জ্বলন্ত শক্তির কার্য্য গুলি প্রাণপটে চিত্রিত হইয়া যায়, তখনই তাহা উজ্জ্বল চক্ষুতে দেখিতে পায়। বিশ্বাস ও পূর্ব্বকার বজ্রময় ভাব ভুলিয়া গিয়া নবনীত কোমল স্বভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নিয়ত কাল সাধনের বিমল তরঙ্গে নিমগ্ন থাকে এবং যোগীকেও একমাত্র অনন্ত প্রসার আত্মার স্নিগ্ধ শক্তির হিল্লোলে ভাসাইয়া অবিশ্রান্ত অমিয় আবর্ত্তে নিমজ্জিত করে। সেই সময় সাধন-সহায় শুভবৃত্তি প্রভৃতিও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সহগামী হইয়া যারপর নাই সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। যোগী, বিশ্বাস ও তত্ত্বাদি সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মনঃ শক্তিও তখন অহমিকামিত্বকে দমিত রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সকল প্রকার অশান্তির প্রলোভন সমূহ, সংযম মহৌষধির দ্বারা নিবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। শুদ্ধ চরিত্র, নির্ম্মল ভাবে সিদ্ধ বিশ্বাসকে ক্রোড়ে লইয়া সাধনাকাঙ্ক্ষীকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় নিঃসৃত মহাশ্রু বাহ্য চক্ষুর দ্বার দিয়াও অবিশ্রান্ত বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

অপিচ, অসীম ঐশী শক্তির বিষয় প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা করিলে, তাহার ভিতরে

ক্ষত যে গূঢ় তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, স্মরণ করিলেও শান্তি রসে হৃদয় পূর্ণ হয়। যে মনোবৃত্তি পূর্ব্বে নিবিড় অরণ্য-ধৃত পিঞ্জর-বদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় কতই ভ্রুকুটী-ভঙ্গী ও ভৈরব গর্জ্জনে ভীতি প্রদর্শন করিতেছিল, সেই মনই আবার শান্ত সমাহিত স্বর্গীয় ভাবে কেমন পবিত্র চরিত্রে পরিণত! ইহার পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান-পরিচালিত বিশুদ্ধ বিশ্বাস নহে কি? হায়! আমরা বিবিধ মতের পাণ্ডিত্যে আবদ্ধ বলিয়া মনোবৃত্তিকে স্বাভাবিক জ্ঞানের ছায়াও স্পর্শ করিতে দেই না এবং বিচার জ্ঞানের উত্তেজনায় বাহ্যাড়ম্বরে আজীবন বদ্ধ থাকিতেও কুণ্ঠিত হই না, সুতরাং মনের ঐ বাহ্যানুষ্ঠান স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠে, তজ্জন্য সংযম শক্তি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের বৃদ্ধকেও দেখা যায়, সেই বাহ্যাসক্তিতে নিবদ্ধ—উন্নত অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্ন বা চেষ্টা করেন না। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় অক্ষয় ধামে যে অব্যক্ত নিত্য সুখতৃপ্তির মধুরত্বের সার বস্তু "আত্মার" প্রত্যক্ষ—তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহ অনেকেরই দেখা যায় না। যাহা হউক, সত্যানুরোধে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহা বলিলাম, তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার্থী। বাস্তবিক বাহ্যভাবে আধ্যাত্মিক ভাব একত্র সামঞ্জস্য হয় না। কারণ কোটি কোটি জগৎ সমস্তই স্থূল ও পরিমিত; এই নিমিত্ত অধ্যাত্ম অনন্ত সত্তায় কি রূপে ঐক্য হইবে? বহিশ্চক্ষুতে যে বিশ্ব বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছু দৃষ্ট হয় না। জ্যোতি-শ্চক্ষু উন্মেষিত না হইলে, অধ্যাত্ম রাজ্যের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। এই কারণেই উপর্য্যুক্ত কথা গুলির অবতারণা হইল। এখন একটু সাধন-তত্ত্বের আলোচনা কর্ত্তব্য। সাধনের মূলভিত্তি বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই মনের চাঞ্চল্য আর থাকেনা, ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্ম রাজ্যের উচ্চ সোপানে উঠিতে শক্তি জন্মে; এবং মনের মলিন ভাব দূরীভূত হইয়া যায়। মন তখন অকৃত্রিম পবিত্র স্বভাবে এমনই বিহ্বল হয় যে, চক্ষের নিমেষন্তরালও "দর্শন বিচ্ছেদ"-যন্ত্রণা সহ্য হয় না। অল্প সময়েই সাধন-সিন্ধুর অতল তলে প্রবেশ করিয়া কত যে অমানুষী শক্তির ব্যাপার দেখা যায়, তাহাতেই ত যোগারূঢ় যোগী অবাঙ্-মুখও অনবরত অশ্রুধারায় ভাসিতে থাকেন। সাধন সিদ্ধার্থী যোগী, মনের প্রীতি আপ্যায়নে এতই মুগ্ধ হন যে, আর এদিক ওদিক হইবার সাধ্য থাকেনা, নিরবচ্ছিন্ন গভীর ধ্যানমগ্ন ও পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল! ঐ সময় সিদ্ধ বিশ্বাসের মধুর উল্লাস-উচ্ছ্বাসে যোগীর হৃদয় হইতে গূঢ় তত্ত্ব সকল আরও পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং সাধনের উৎসাহ-[illegible] [illegible] হয়। [illegible] বলিতে [illegible] যে,

বিশ্বাসই মনঃশক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সমূহকে শুদ্ধ পথে লইয়া যাইবার একমাত্র সহায়।

এখানে বিশ্বাস সম্বন্ধে আরও একটু বলা আবশ্যক হইতেছে। পৃথিবীতে ধর্ম্মমতের সীমা নাই। হিন্দুধর্ম্ম, য়ীহুদীধর্ম্ম, মহম্মদীধর্ম্ম, খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম, প্রভৃতি অনেক প্রকার ধর্ম্ম আছে। সকল ধর্ম্মের ভিতরেই অভ্রান্ত সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে সিদ্ধ। কিন্তু উহা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আতিশয্য বশতঃ রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, যীশু, মহম্মদ এই সকল মহা পুরুষদিগের নামে প্রচার হইয়া গিয়াছে—যথা বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক ধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল মহা পুরুষদিগেরও সেই চিন্ময় আত্মায় দর্শন লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সকল প্রকার যোগীর বিশ্বাস এক। অথচ পৃথিবীতে উপর্য্যুক্ত পুরুষপুঙ্গবগণকে ঐশী ঐশ্বর্য্যে সজ্জিত করিয়া, তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ দ্বারা পূজাও অনেকে করিতেছেন। তাহাতে বিশ্বাসের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়াতেও প্রেম, ভক্তি, রুচি ও প্রীতির আনুগত্যের ব্যত্যয় হয় নাই বটে, ফলতঃ স্থূল বিশ্বাস জনিত সাধনের পথ বন্ধুর বলিয়া যেন মনে হয়। কারণ পরিণামে পূত প্রজ্ঞার প্রকাশ হইলে, যোগিগণকে যখন ঐ বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তখন ঐ রূপ স্থূল বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করা সময়োচিত বলিয়া বিবেচনা হয় না। অবশ্যই বলিব যে, সাধনের যদিও পন্থা অনেক তথাপি মানুষ প্রকৃত পথ অনুসরণেরই আগ্রহ প্রদর্শন করে। বিলাত যাইতে হইলে সমুদ্রের গৌণ পথ ছাড়িয়া অল্প সময়ে নবাবিষ্কৃত ঐ খাল পথে যাওয়াইত বাঞ্ছনীয়। নিশ্চয়ই জানা আবশ্যক যে, সাধন সম্বন্ধে প্রথমতঃ স্থূলের সাহায্যে অভ্যাস যোগ, এটিও আসক্তিমূলক! কেননা, উহা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বের সাধন সম্ভবে না, সুতরাং ঐ অনিশ্চিত ধর্ম্মাসক্তিটী অগ্রেই পরিত্যাগ করা কি উচিত নহে? বাহ্যিক আসক্তির প্রলোভন হইতে মুক্ত হওয়াইত সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। হায়! অনেকেইত ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বুদ্ধ-চৈতন্যের অভিনয় দর্শন করিয়াছেন; কৈ, একটীকেও ত তাঁহাদের মত দেখিতে পাইনা! তাই বলিতেছি, একেইত আমরা সতত সংসারের সেবায় বিহ্বল—তাহার উপর ডবল সাধনের চার্জ্জ? নিশ্চয়ই জানিবেন যে, অভ্যাস নিবন্ধন আসক্তির বন্ধন কখনই ঘুচিয়া যায় না। অতঃপর প্রথম হইতেই আবর্জ্জনা পূর্ণ বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। তাহা হইলে চিরশান্তির উজ্জ্বল পথ পরিষ্কার দৃষ্ট হইবে।

এক্ষণে সাধনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের একটু চিন্তা করা যাক্। সাধনের দুইটী দিক আছে, একটী বহির্মুখিন্—অপরটী অন্তর্মুখিন। প্রথমে বহির্মুখী সাধনের কথাই বলিতেছি। মানুষ ঋষি উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া অন্য দিকে টলিয়া পড়ে। আমরা যে একটী মৃণ্ময় ঘটস্থিত আকাশ তাহাকেই আত্মার স্থিতি মনে করি, কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী বলিবার কথা আছে। যদিও একমাত্র শূন্যকেই লক্ষ্য করিয়া ধ্যান রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে, ঘটের সহিত কোন সম্পর্ক থাকেনা,—ঘটটী আকাশে ডুবিয়া যায়। আবার স্থূল দৃষ্টিতে ঐ ঘটের উপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়াও যে ঐ ঘটকেই দর্শন হয়, ইহাতে কি পূর্ণ পরম চৈতন্যকে সীমায় আবদ্ধ করা হয় না? ঈদৃশ পার্থিব কল্পনায় অসীমাত্মার পূর্ণত্বের স্থায়িত্ব চিন্তা অতীব অসম্ভব। অতএব নিগূঢ় সত্যের নিমিত্ত অনুসন্ধিৎসু হইলে, অবশ্যই জানা যায় যে, সর্ব্ব ব্যাপিনী শক্তি আত্মাতে অনন্ত কাল অক্ষুণ্ণ—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ আত্মারই শক্তিতরঙ্গে প্রত্যেক বস্তুই নিমজ্জিত আছে। বিশেষত্ব এই যে আত্মা জড়ে নির্লিপ্ত—পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় সকলের মধ্যেই স্থিতি করিতেছেন। সূক্ষ্মচিন্তার মূলে দেখিবেন, পরিমিত ঐ মৃণ্ময় ঘট, চিৎসিন্ধুর অতল তলে অদৃশ্য হইয়াছে। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের দর্শন সম্ভব হয় কি? মানুষ বাহ্যদর্শনেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চায় না; কিন্তু উহা যে কাঁচফলক প্রতি ভাসিত দীপের ন্যায় কিছুই নহে, ইহা একটু চিন্তার বিষয় বলিয়া অনেকেরই প্রাণে স্থান পায় না। তবে যদি প্রশ্ন উঠে যে, স্থূলের ভিতরে দর্শনাকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হয় না? এ কথার উত্তরে নিশ্চয়ই বলিব যে, অনন্তের আবার অন্ত কোথায়? কোটি কোটি জগৎকে এক করিলেও একটী উপল খণ্ড সদৃশ মনে করিতে পারা যায়। পরিমিত স্থূল বস্তু অসীম চিন্ময় সত্তাকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিবে এটি কেমন কথা? আত্মা যে অনন্তব্যাপী! তাই বলিতেছি, বাহ্য সাধনে জীবন ক্ষেপ করিলেও তাহা কি বিফল প্রযত্ন নহে? এইত গেল বহির্মুখিন সাধন, এখন অন্তর্মুখিন সাধনের কথা সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

কূর্ম্ম যেমন স্থলভাগে চলিতে চলিতে যদি সম্মুখে একটী কোন রূপ জন্তুকে দেখিতে পায়, তখনই সে হস্ত, পদ, মুখ আপন শরীরের ভিতরে টানিয়া লয়, তেমনই সাধন-প্রয়াসী মানবকেও বাহ্য জগতের তাড়নায় সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ভাবরূপ জীব প্রবাহ চিৎ সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে,

আর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু বহির্জগতের আকাঙ্ক্ষা যদি বিন্দু মাত্রও থাকে, তবে ঐ ভাব স্বরূপ জীব, কখনই চৈতন্য সত্তাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। এবং বহির্মুখিনী চিন্তার আকর্ষণে মরজগতের অনিত্য ভাবে জড়াইয়া পড়িবেই পড়িবে। কিছুতেই সে উত্থানোন্মুখ অন্তর্জগতের সাধন-ক্ষেত্রে আসিবার সুযোগ পাইবে না এই জন্য সিদ্ধাকাঙ্ক্ষী যোগীর অন্তর্মুখী সাধনে সতর্ক থাকা উচিত। ভুলেও যেন মায়াক্লিষ্ট বাসনার তরঙ্গে পড়িয়া আধ্যাত্মিক সাধন-ক্ষেত্র ছাড়িতে না হয়। বিভীষিকাময়ী পৃথিবীর আশু তৃপ্তির উত্তেজনায় অনেকেই বিপদ গ্রস্ত হইতেছেন। অতঃপর অনাসক্ত বৈরাগ্যের সাহায্যে তাহার দমন-নিরত হইয়া ধীর স্থির ভাবে অধ্যাত্মতত্ত্বের নিমিত্ত সাধন পথে মস্তক অবনত করতঃ অকৃত্রিম ব্যাকুলতার সহবাসে সময় ক্ষেপ করিতে হইবে। এই সময়টাই ত্রিতাপ দহন যাতনার পরীক্ষার কাল। প্রকৃত সাধন সিদ্ধার্থী না হইলে, কখনই ইহাতে স্থির থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক, এই তাপ দ্বয় হইতেও আধ্যাত্মিক তাপ শতগুণে অধিক। কারণ ঈদৃশ দুঃসহনীয় ভীষণ তাপে বিমুক্ত না হইলে, সাধনারূঢ় ব্যক্তির অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। সাধন সিদ্ধির সমকালেই ঐ আধ্যাত্মিক তাপের যাতনা অনিবার্য্য বেগে অন্তর্মুখিনী ইচ্ছা-শক্তিকে বহির্মুখীন নরকময় স্থানে লইয়া যায়। এবং বিবিধ প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে আনিয়া অতি কুৎসিৎ ভাবে উন্মত্ত করে। সুধিগণ ত্রিতাপের ছায়া মাত্র দর্শন করিয়াই সাধ-নের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। এই ভয়ানক শত্রু হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় অনাবৃত শাশ্বত প্রেম। এই পবিত্র প্রেমকে আশ্রয় করিয়া সাধন ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করিলে দেখিবেন, চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত যোগামৃত বর্ষিত হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া তড়িচ্ছটার ন্যায় অনুপমেয় মহজ্জ্যোতির স্নিগ্ধ কিরণ ছুটিতেছে, তখন যোগীর নয়ন যুগল হইতে অবিরল প্রেম ধারা যেন শত ধারে চিন্ময় মহা সমুদ্রে মিশিবার জন্য বহিয়া যাইতেছে। মধুর প্রেম-মগ্ন মন, নব অনুরাগের সহিত স্ফটিক স্তম্ভবৎ স্থিরভাবে সাধনাকাঙ্ক্ষী যোগীকে প্রেমের তীব্র তরঙ্গাঘাতে এমনই অধীর করিয়া ফেলে যে, বহিশ্চিন্তার বিন্দুমাত্রও সময় থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন সেই অসীম প্রসার "অনন্তকে পাইব" ইহাই একমাত্র চিন্তা ও সাধনা। তিলার্দ্ধ কালও সাধন চিন্তার বিরাম নাই—অশ্রু ধারার অমৃত হিল্লোলের সঙ্গে কত যে ভাবের লহরী ছুটিয়া যায়, সংখ্যা করা যায় না। আহা! প্রেমের মত্ততা কি বিচিত্র! কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন উন্ম-

ত্তের ন্যায় নৃত্য— এ সকল যে বড়ই অপূর্ব্ব কাণ্ড! এমন যে প্রাণের বস্তু প্রেম, তাহারই সাধনায় আমরা চিরবঞ্চিত রহিয়াছি। বিশ্বাসচক্ষে দেখিলে ঘোর নিরাশা-অন্ধকারের ভিতরেও যে হৃদয়-খনি হইতে আশারূপ উজ্জ্বল মণি দেখা যায়। কিন্তু আলস্যের স্নিগ্ধক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাই বলিয়া দেব-প্রদত্ত সেই মহামণি প্রেমরত্নকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করি না! যে প্রেমের অমিয় ভাবে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী বুদ্ধদেব অট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষতলবাসী হন, যে প্রেমের মত্ততায় মহর্ষি যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াও ঘাতকের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন, যে প্রেমের গভীর আবেগে শিখ শিশুযুগল প্রাচীরের মধ্যে কণ্ঠ দেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত হইলেও ভীত না হইয়া জীবন বলি দিয়াছে, হায়! আমরা সংসারের দাসত্বে সেই প্রেম যে কি বস্তু, তাহা বুঝিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এখন দেখা যাক্, সেই মহারত্ন প্রেম, ইহার সাধন কি?—কিরূপেই বা তাহাকে লাভ করা যায়। প্রেমও দুইটী ভাবে বিভক্ত। একটী স্থূলগত মত্ততা-প্রমত্ত প্রেম, আর একটী স্বর্গীয় শাশ্বত প্রেম। মত্ততা-প্রমত্ত প্রেমের লক্ষণ এই যে, সে উন্মাদিনী ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া প্রাণিজগতের সকল প্রকার স্থূলসঞ্জাত পদার্থ মাত্রকেই অশ্রুসিক্ত করে; এটি ভক্ত যোগীর প্রেম সাধন! অপরটীর সাধনের বিষয় এই যে, পার্থিব তত্ত্বের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার প্রাণীকে সমভাবে গ্রহণ করতঃ তাহাদের সঙ্গে অনুপ্রাণিত হইলে, প্রেমের বস্তুগত মত্ততা দোষটুকু না রাখিয়া এবং স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ প্রভৃতিকে সংযম পূর্ব্বক ধীর ভাবে প্রেমকে ঊর্দ্ধগামী করিলে, সাধনের সংকল্প সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে, এটি জ্ঞান যোগীর প্রেম সাধন! এখন এই উভয় সাধনের কোনটী গ্রহণ করা আবশ্যক? আমি ইতঃপূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, প্রাণীপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে এক করিলেও যখন অনন্তের কণা মাত্রও স্পর্শ করিতে পারা যায় না, এবং এই দৃশ্য জগতের বহির্ভূত আরও যে কত জগৎ রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব, তখন ঈদৃশাবস্থায় ঐরূপ প্রেমের সাধনেও আশা পূর্ণ হয় না। তবে সমপ্রাণতা যতটুকুই হউক, তাহা আদরের বস্তু। উহারও পবিত্র শক্তিতে প্রেমের উজ্জ্বল ভাব কথঞ্চিৎ বিকাশ পায় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইতে একটু ঊর্দ্ধে উঠিতে উপদেশ দিতেছে। মানব হইতে মক্ষিকাটী পর্য্যন্ত অভেদ ভাবে দর্শন করিলেও তাহা সীমাবদ্ধ। কারণ, আমরা কি সমস্ত বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি? তবেই বেশ বুঝা যায় যে, বিশ্ব প্রেমেও শাশ্বত প্রেমকে স্পর্শ করিতে

পারে না। এই নিমিত্তই স্বাভাবিক জ্ঞানের আদেশ যে, হৃদয়ই প্রেমসাধনের বিশুদ্ধ-ক্ষেত্র। অবশ্যই দৃষ্ট জগৎ সমূহের মর্ম্মভেদী সমপ্রাণতারূপ জ্যোতিঃ বিন্দুটুকুও পরিত্যজ্য নহে, উহাতেও সাধন শক্তি আরও অধিকতর শক্তি দেয়— ক্ষতি করে না। বরং ঐ বিশ্ব-প্রেম শাশ্বত প্রেমের সহিত মিশিবার জন্য যার পর নাই আকুল হয়। অল্প সময়েই প্রেম-যোগী ঐ শাশ্বত প্রেমের আলিঙ্গনে মহা প্রেমের উজ্জ্বল পথ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

তৃতীয় উল্লাস।

সাধনে প্রাণ ও প্রেম।

সাধনে প্রাণের সহিত প্রেমের অবিচ্ছিন্ন সখ্য স্থাপন হইলে, শুভ-তত্ত্ব সকল পরিস্ফুট হইয়া মানবের স্বভাবকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল করে; এবং অন্তর্মুখিনী চিন্তাশক্তি এমন একটী অমানুষী মহজ্জ্যোতিঃ-সম্পন্ন মনোমুগ্ধকারী মহোচ্চ স্থানে চলিয়া যায় যে, বহির্জ্জগতের ছায়া মাত্রও ঐ চিন্তাশক্তির ভিতরে প্রবিষ্ট হয় না। সেই মনোমোহন মধুর চিন্তা-লব্ধ সারতত্ত্ব "প্রেম" প্রাণের পবিত্র প্রকৃতি মধ্যে দেখাইয়া দেয় যে, আত্মার অসীম সত্তা হইতে একটী অব্যক্ত জ্যোতিঃ বিকাশ হইতেছে। তখন প্রেম প্রাণের সহচর হইয়া সাধনের অনুকূল প্রবেশ-দ্বারটী প্রশস্ত করিবার জন্য নিজের পবিত্র মূর্ত্তিটী ক্রমে ক্রমে যোগীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। যোগী সেই সময় আত্মার স্বরূপ মহাপ্রেম-সাধনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার বহির্মুখী প্রাণ আর সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ প্রেমে সন্তুষ্ট না হইয়া অনাবৃত মধুর প্রেমের প্রতিবিম্বিত ছবিগুলি স্থায়ীরূপে চিত্রিত করিতে থাকে। চৈতন্যের অভেদ-প্রেমের মত্ততা, হরিদাসের দৈনিক তিন লক্ষ হরিনামে অশ্রু পতন, যীশুর শিষ্যগণের পদধৌত দ্বারা অকৃত্রিম সেবা ভাব—এই সকল দেব-প্রকৃতির মহচ্চরিত্র দর্শনে কেনই বা বিহ্বল করিবে না? তখন যোগী জগতের অস্থায়ী চিত্রে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপর্য্যুক্ত স্বর্গীয় ছবির প্রতিচ্ছায়া রূপ বর্ম্মে মনকে সজ্জিত করিয়া শাশ্বত প্রেমের পবিত্র ভাবে মুগ্ধ হন, এবং ঐ প্রেমের সহিত প্রণয় সংঘটনের জন্য অত্যন্ত আকুল হইতে থাকেন।

প্রেম তখন প্রাণ-মন উভয়ের সঙ্গে সখ্য বন্ধনে নিবদ্ধ থাকিয়া ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, বিনয়-নম্রতা, শান্ত-শীলতা ও দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সুসজ্জিত করিতে ক্রটী করে না। বস্তুতঃই প্রেম-প্রদত্ত সাধনোচিত ঐ সকল দেব-ভূষণে ভূষিত হইলে, সাধন-মগ্ন মানবের শরীর হইতে যোগ-জ্যোতিঃ দেখা দেয়। আহা! সেই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে যে পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়! তাঁহার নিকট যে প্রেম সতত প্রহরী হইয়া রহিয়াছে। কেমন করিয়া অভিমান অহঙ্কার,

দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সাধন-ব্যাহন্তা শক্রগণ মস্তক তুলিবে? তাহারা যে কিঞ্চিল্‌কের ন্যায় কোথায় চলিয়া যায়। বাস্তবিক প্রেমের স্বভাব যে নবনীত হইতেও কোমল—তাহার যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকেই যেন অমৃত বৃষ্টি হয়। বলিতে কি, বিস্তৃতফণা বিশিষ্ট বিষধরও প্রেমের অমিয় দৃষ্টিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রেমিকভক্তগণের সহিত ক্রীড়া-নিরত হয়। প্রেম, ভেদের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া দিয়া কুটিল হৃদয়কেও সরল করে। ইহাতে কেনই বা চিন্তা-শক্তির গতি অন্য দিকে টলিয়া পড়িবে? সুতরাং মন, প্রাণ, প্রেম-সাধন-চিন্তার অব্যাহত শক্তিতে এমনই বদ্ধ হয় যে, আর কোন দিকেই যাইবার পথ পায় না। তখন ঐ তত্ত্বত্রয়ও সুযোগ পাইয়া সেই অব্যক্ত জ্যোতির মূল অন্বেষণের নিমিত্ত চিন্তা শক্তির গতি অত্যন্ত প্রবল করিয়া তুলে। এবং তিলার্দ্ধ কালও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেনা। সেই সময় সাধনাকাঙ্ক্ষী যোগীর অবস্থা একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আর পার্থিব জগতের আপাত মুগ্ধকারী বস্তুর প্রতি কণামাত্রও ইচ্ছা থাকে না। মেরু-শৃঙ্গের ন্যায় স্থির ভাবে থাকিয়া উপর্য্যুক্ত অব্যক্ত জ্যোতির অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয়। এবং অতি দীন ভাবে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন ক্রন্দন করিতে দেখা যায়। কিন্তু এমন অনুকূল অবস্থা ও সাধনসুলভ সময়েও একটা ভীষণ আশঙ্কা আছে। সাধনে যদি মন, প্রাণ, প্রেম, ইহাদের রুচির একটু ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয় সাধন চিন্তার গতি বিচ্ছিন্ন হইয়া যোগীকে পতনের পথে উপস্থিত করিবেই করিবে। কেননা চিন্তা শক্তির সঙ্গে ঐ তত্ত্বত্রয়ের আনুগত্যের বিভ্রাট হইলেই বিপদ! অতঃপর প্রাণ, মন, প্রেম, ইহাদের পরস্পর সকলেরই গতি শক্তির টান শুভাশুভ উভয় দিকেই আছে, বিষয়-বাসনার ভোগ সুখেও অনুরক্ত হয়। আবার ভগবদ্‌ভাবেও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চকিৎমধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। মহর্ষি পরাশরও কলুষিত রুচি-বিকারে বিমুগ্ধ হন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রেরও যোগ ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইন্দ্রাদি দেবগণের ত কথাই নাই। তবে বলিতে কি পারা যায় না যে, ঐ রুচি-শক্তিকে এমনই ঐশীশক্তির সহিত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে হইবে যে, কিছুতেই সাধন-চিন্তার গতি বিরুদ্ধ পথে না যায়। আধ্যাত্মিক তাপজনিত যে কোন প্রলোভনই আসুক না কেন, ঐ অব্যক্ত জ্যোতির্ম্মুখিনী চিন্তা যেন বিচলিত না হয়। সাধন-চিন্তা সবশে থাকিলে মন, প্রাণ, প্রেম এবং অন্যান্য শুভ-তত্ত্ব সকলি অনুকূলে থাকিবে এবং শান্ত, স্নিগ্ধ-মধুর আলিঙ্গন দ্বারা উল্লাস-তরঙ্গে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু সাধনের

পথটী ঠিক ক্ষুরধার স্বরূপ। বড় সতর্ক ভাবে চলিতে হয়, নতুবা স্বতঃই বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। একটু ব্যতিক্রম ঘটিলেই যে সম্মুখে বিষয়াসক্তি বিবিধ প্রলোভন লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, সুযোগ পাইলেই অমনি নরকের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ভিতরে ফেলিয়া দিতে চক্ষের নিমেষ কালের নিমিত্তও অপেক্ষা করিবে না। যাহা হউক, সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপদ হইতে পরিত্রাণের অব্যর্থ মহৌষধ সেই শাশ্বত প্রেম। উহা যতই অন্তরের গভীরতম-প্রদেশ অধিকার করিবে, ততই সাধন-চিন্তা সেই অব্যক্ত জ্যোতির সমীপবর্ত্তী হইবে। মলিন ভাবের সংশয় সমূহ ঘুচিয়া গিয়া আশার স্নিগ্ধনিঃশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিবে এবং হৃদয়ে শান্তিরসের অমৃত-তরঙ্গ ছুটিতে থাকিবে। সাধনের পবিত্র-ক্ষেত্র উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া যোগীর অন্তর বাহির কোনও স্থানে সন্দেহ বা ভ্রান্তির ছায়া প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না, প্রেমের মহাস্রোত বহিয়া যাইবে।

এইরূপ শাশ্বত প্রেমের সাধন সিদ্ধ হইলে, রুচি-শক্তি প্রবলা হইয়া প্রাণের গূঢ়-তত্ত্ব জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে। কারণ, প্রাণের স্বরূপ ও স্বভাবের সঙ্গে চিন্তা-শক্তির পরিচয় না হইলে, সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তন্নিবন্ধন সংক্ষেপে একটু আলোচনা প্রয়োজন। প্রাণ আত্মার অনন্ত প্রবাহ রূপে অভিহিত। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যেই থাকিয়া কোটি কোটি জগৎকে আলোকিত করে, তেমনই প্রাণও আত্মার তরঙ্গরূপে আত্মাতেই নিত্য জড়িত। সুতরাং প্রাণের গতিও চিৎশক্তি হইতেই প্রবাহিত হয়। প্রাণ কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ সঞ্জাত নহে—চিন্ময় সত্তাতেই উহা প্রকটিত। এখানে প্রসঙ্গাধীনে আবার শূন্য তত্ত্বের কথা আসিয়া পড়িল। শূন্য, জগতের স্থিতির আধার হইলেও স্থূলের কারণীভূত নহে! ঋষিরা আকাশকে বিশ্ব-পদার্থের একটী অপরিমিত তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়াও উহার অভ্যন্তরে প্রাণের স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিনী শক্তির অনুসন্ধানে চিন্তা শক্তিকে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু শূন্য তত্ত্বের সহিত পরিমিত স্থূল তত্ত্বের বিশেষত্ব এই যে, আকাশ আত্মার সম্যক স্থিতির একটী অখণ্ড স্থান বিশেষ। কিন্তু উহা চিৎ শক্তির অঙ্গীভূত নহে। সুতরাং আকাশ আত্মাতে রহিয়াছে সত্য, ফলতঃ উহার এমন শক্তি নাই যে, চিন্ময় মহাপ্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে। আত্মা যে ভূততত্ত্বের অতীত, অথচ বিশ্ব সমূহ তাঁহারই অস্পর্শ শক্তিতে স্থিতি করিতেছে। নিত্য চৈতন্যের সত্ত্বাশ্রিত যে কিছু আমরা দেখিতে পাই, সকলি তাহারই অসীম ইচ্ছার অন্তর্ভূত। আর একটী কথা, কল্পান্তর ভাবে স্থিতি-অস্থিতি কিছু ছিলনা,

তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন একমাত্র শূন্যই দর্শনীয় বস্তু রূপে ছিল। ইহা চিন্তা করিতে গেলে, বিষম অজ্ঞেয়বাদের বিভীষিকায় পড়িতে হয়। কেননা, অবিনশ্বর চৈতন্যকে কল্পান্তর কাল কিম্বা সময়ে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। আত্মা নিত্য ও স্বপ্রকাশ। অন্ধকার-আলো ইহাও বিশ্ব-পদার্থে বিজড়িত! আর যদি বিশ্বাস করা যায়, একমাত্র শূন্যাশ্রিত আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিলনা, তাহা হইলে চৈতন্যের পূর্ণ শক্তির প্রতি বিঘ্ন সংঘটিত হয়, কেননা, তিনি স্থূল অস্থূল সকল লইয়াই পূর্ণ। আত্মাতে যদি বিশ্ব-পরমাণুর অভাব থাকে, তবে ঐ সমূহ পরমাণুর অস্তিত্ব কোথা হইতে আইসে? মোটামুটি ভাবিয়া লওয়া উচিত যে, আত্মা যখন অবিধ্বংস নিত্য, তখন এই প্রকাশমান জগৎ প্রপঞ্চেরও বিনাশ নাই, সুতরাং কল্পান্তরে তমঃ আবৃত কিছু ছিলনা, একথায় কিছুতেই মনকে আশ্বস্ত করা যায় না। বস্তুতঃই প্রাণেরও স্বরূপ শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে জানা যায়, চিৎস্বরূপের অনন্তত্ব ও শক্তির পূর্ণত্ব বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয়না।

অনন্তর, অখণ্ড প্রাণ-প্রবাহ * প্রাণী পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড সমূহের ভিতর দিয়া ভূচর, খেচর, জলচর যাবতীয় জন্তু এবং অসীমাকাশকে স্বীয় অনন্ত প্রসার চিন্ময় বক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। এমন কি, ঐ ক্ষুদ্র মাছিটীও প্রাণের অমিয় তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া উড়িতেছে। জন্তু সমূহের ক্ষুদ্র বৃহৎ শরীর সত্ত্বেও প্রাণের স্বরূপ ও শক্তি সম ভাবেই চলিতেছে, অথচ আমরা দেখিলাম, উটি ক্ষুদ্র প্রাণী, এটি প্রকাণ্ড ভীষণাকার জন্তু, কিন্তু ভিতরে প্রাণ-প্রবাহের গতির বিন্দু মাত্রও তারতম্য নাই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি এক প্রাণ সর্ব্বাধারে প্রকাশ পাইতেছে, তবে পশু, পক্ষী মানবাদির কার্য্য সমূহ বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতে কি, অন্যান্য জন্তুর কথা ত অতি দূরে—মানবগণের মধ্যেও পরস্পর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্নতা রহিয়াছে। নির্ভীকান্তরে বলিতে পারা যায় যে, পশু পক্ষ্যাদি ইহারা নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের বহির্ভূতঃ কোন কার্য্য করেনা, তজ্জন্য তাহারা অনুতাপগ্রস্ত নহে। কিন্তু মানবগণ আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াও পাশবিক শক্তির আকর্ষণে নিকৃষ্ট পথে পরিচালিত হয়। আবার সাধু ভাবের আশ্রয় লাভ করিলেও "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নঃ" বিবিধ প্রকার বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া ভেদ ভাব দ্বারা সমপ্রাণতার মধুর তরঙ্গকে বাধা দেয়।

* ইহাকেই একপ্রাণতা কহে। সকলের ভিতরে প্রাণের রূপ এক—উহাই মহাপ্রাণের দর্শন।

সুতরাং মানবীয় শক্তি প্রভাবে ভেদসঙ্কুল বিপজ্জালে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এই কারণে প্রাণের সর্ব্বগত অভেদ মহা তরঙ্গটী বিস্মিত হইয়া যায়। সকল প্রকার শরীর-স্থিত ক্ষুদ্র ভাবের আতিশয্য বশতঃ প্রাণের আধ্যাত্মিক স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হয়না। অবশ্যই বলিব যে, জন্তু বিশেষে কার্য্যের বৈচিত্র ভাব ও প্রাণীর শ্রেণী বিভাগে প্রকৃতির বৈষম্য, উহা মহাপ্রাণের ইচ্ছা শক্তির ভিতরে যথোপযুক্ত বিধানে অনন্ত কালই চলিতেছে। সকলে সরল ভাবে যদি বুঝিয়া লন যে, মানব-প্রকৃতিতেই উন্নতি অবনতির কার্য্য সমূহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে একথায় সংশয় থাকে না। মানুষ শুভাশুভ উভয় দিকদর্শী ও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিভাগ বিষয়ে সুনিপুণ। তন্নিমিত্তই সংসার পাশ বন্ধনের দায়িত্ব লইতে বাধ্য। এবং ঐ পাশ মুক্তিরও শক্তি প্রয়োগের শক্তি আছে, কেননা, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পরিচালনে ক্ষমতা আছে বলিয়া প্রাণের সর্ব্বগত সমস্থিতির কারণ উপলব্ধি করিতে মানবেরই সম্যক প্রকারে অধিকার দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্বাদি জন্তু সকল বরং নিকটে আসিয়া অনুগত হয়, কিন্তু আমরা কিছুতেই সরল সাধু স্বভাবে পরস্পর অভিন্ন হৃদয়ে একপ্রাণতার মধুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিনা। ইহার মূল কারণই অভেদ প্রেমের অভাব। প্রাণের শক্তি-প্রবাহকে প্রাণী বা জন্তু বিশেষে বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিলে অনাবৃত মহাজ্ঞানের সহিত প্রেমের ঘনিষ্টতা দৃঢ় হয়। তাহা হইলে জ্ঞান ও প্রেম, উভয়ের মিলন-সামঞ্জস্য-জনিত সাধন-চিন্তার গতি অধিকতর মধুরবেগে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আনন্দময় কোষের ভিতরে উপস্থিত করে। প্রেমেরই পীযূষ ক্ষরিত অশ্রু মগ্ন স্বভাব হইতে সাধনের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ অনবরত বিকাশ পাইতে থাকে। সাধনাকাঙ্ক্ষীর হৃদয় প্রেমের অমৃত হিল্লোলে ভাসিয়া ভাসিয়া তাঁহার শরীর কদম্ব-কুসুমের ন্যায় কণ্টকিত ও প্রেমোন্মত্ত প্রাণ উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে নিমগ্ন হয়। হায়! প্রেমের কি এতই বিমোহিনী শক্তি! একবার প্রাণে জাগিয়া উঠিলে, আর কি তাহার অভিন্ন আনুগত্য ভুলা যায়! বস্তুতঃ প্রেম ভিন্ন সাধন ক্ষেত্র হৃদয় যে শ্মশানে পরিণত হইবে, তাহার আর সংশয় কি? মনঃশক্তি তীব্র বৈরাগ্যের সাহায্যে যতই কেন শক্তি প্রয়োগ করুক না, সমস্ত প্রাণীর সহিত মানবীয় শক্তি যতই জড়িত হউক না, ইন্দ্রিয়গণ যতই কেন সংযম ব্রত ধরুক না, যদি ইহারা প্রেমের অমিয় অঙ্গস্পর্শ না করে, তবে সকলেরই ঐ আড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রেম সকল প্রকার শুভ প্রবৃত্তির ভিতরে জীবনী শক্তি রূপে প্রবাহিত

হইলে, কোনরূপ বিপদ আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং প্রেম সমস্ত প্রাণীগত প্রাণকে এক করিয়া দেয়। অভেদ প্রেমের স্নিগ্ধ শাসনে স্বার্থপরতা দম্ভ-দ্বেষাদি কুটিল প্রবৃত্তি প্রভৃতি দূরে অবস্থিতি করে। প্রেমের পবিত্র প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী আলোকে অপ্রীতিকর বৃত্তি সকল স্থান পায় না এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধন-স্পৃহা ও উদার নৈতিক চরিত্র বলে, ভেদ বৈচিত্র্য সমুদয় যুগপৎ চলিয়া যায়। শাশ্বত প্রেমের মহোচ্চ ভাবে সাধন ক্ষেত্রে তত্ব-কুসুম সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অধীর করে, কোনরূপ অশান্তির রেখা মাত্রও দেখা যায় না। ঐ বিমলানন্দের ঘন আবর্ত্তমধ্যে শান্তির বিশুদ্ধ উচ্ছ্বাস অনবরত প্রবলতর বেগে বহিয়া যায়, কিছুতেই বাধা মানে না। প্রেম শত্রু-মিত্র, সুরূপ-কুরূপ, যোগী-ভোগী বুঝেনা, সকলকে আলিঙ্গন করতঃ উদারতার মহা স্রোতে ডুবাইয়া দেয়; এবং মানবের মর্ম্মস্থিত ভেদগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সরলতার অভেদ শক্তির অব্যাহত গতি বৃদ্ধি করে। তখন আর সাধনে প্রাণ ও প্রেমের সখ্য বন্ধন শিথিল হইবার উপায় থাকে না। বস্তুতঃ সাধনোদ্যমশীল যোগী প্রেমের মধুর আপ্যায়নে আকৃষ্ট না হইলে, প্রাণের "একত্ব" সংসাধনে শক্তি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন কিরূপে? প্রাণ কি প্রেম শূন্য হইয়া সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? কখনই না। সাধনাকাঙ্ক্ষী যোগী প্রেমের আশ্রয় গ্রহণে অসমর্থ হইলে, তাহার চিন্তা শক্তির মূল শুকাইয়া যায়। কেননা সাধন ক্ষেত্র হৃদয় যে প্রেমের পীযূষ রস সিক্ত না হইলে, সরস ও উর্ব্বরা শক্তি গ্রহণ করিতে পারেনা। নিশ্চয়ই সেই পীযূষরসে, এমন কি, অশান্তিদগ্ধ মরুময় হৃদয় ক্ষেত্রেও স্বর্গীয় তত্ত্ববীজ অঙ্কুরিত হয়। অল্পকাল মধ্যে মহাতেজে আশা-বৃক্ষ উল্লাস, আনন্দ, শান্তিরূপ পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। যোগী ঐ আশা-বৃক্ষ প্রসূত শান্তি ফলাস্বাদনে এতই বিহ্বল হন যে, একমাত্র সাধনের গভীর উৎকণ্ঠা ব্যতীত আর কোনই ইচ্ছা থাকে না। সে সময় তাঁহার অন্তঃকরণে কোনরূপ বাহ্য বাসনা তিলার্দ্ধ কালের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে সক্ষম হয় না। তখনই সাধন-চিন্তা আত্মার অনন্ত শক্তির ভিতরে মিশিবার জন্য অতি দ্রুত গতি চলিতে থাকে। প্রেমোন্মত্ত যোগীরও তখন জ্যোতিশ্চক্ষু ফুটিয়া উঠে ও সাম্য শান্ত দৃষ্টিতে বহির্ভাবের ঘোর অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ভাবটী, সাধন-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মহা-প্রাণের মহা-তরঙ্গের অতল তলে প্রবেশ করতঃ, শাশ্বত প্রেমের পবিত্র আলোকে অভিনব স্বভাবে পরিণত হয়। তখন কোনরূপ জাগতিক স্থূল তত্ত্বের বিকার-বাসনা আর বল প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না।

নির্ব্বিকল্প মহাভাবের মধ্যে সকলই মধুময় হইয়া যায়। তবেই বলিতে পারা যায় যে, সাধনে প্রাণ ও প্রেমের মিলন বিষয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা শক্তিকে স্থির ভাবে পরিচালিত করিলে, কখনই নিষ্ফল প্রযত্ন হইবে না। বরং সাধন বল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সাধন-সিদ্ধ যোগী দেব-শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবেন। এবং স্বর্গীয় শাশ্বত প্রেমের অমৃত তরঙ্গে নিরন্তর ভাসিতে থাকিবেন। এই মহাপ্রেমের মহা শক্তিতে জগতের নর-নারীকে বিশুদ্ধ-জ্ঞানে ভূষিত করিবেন। জগৎ মধুময় হইয়া যাইবে। সকলের মধ্যে মহাপ্রাণের পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ হইবে ; ঈশ্বরের নিত্যভাব ও লীলাভাব একই দর্শন হইবে।

চতুর্থ উল্লাস।

জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি।

জ্ঞান (জ্ঞা) ধাতুতে সিদ্ধ—সুতরাং উহাকে পূর্ণ চিৎবিশিষ্ট স্বয়ং আত্মা ভিন্ন আর কি বলা যায়। এই বিশ্বমণ্ডলে বিবিধ প্রকার শরীরাধারে ঐ সম্বিচ্ছক্তিরই অসীম প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমরা মানবীয় প্রকৃতির অবস্থা ভেদে এবং আমাদের সসীম বুদ্ধির প্ররোচনায় যাবতীয় জন্তু মধ্যে প্রজ্ঞা-তরঙ্গকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করি। ফলতঃ সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যে উহার স্থিত-ভাব একইরূপ—শরীরোপযুক্ত বিকাশ পায়। আমরা বিবিধ পার্থিব তত্ত্বের আবরণে অনাবৃত নিত্য চৈতন্যকে সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া সমস্ত আধারে ঐ পূত প্রজ্ঞার উজ্জ্বল প্রভাকে বিচার-যুক্তির দ্বারা প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করি—উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি! কেননা, শত চেষ্টা করিলেও স্বাভাবিক শক্তির নিকট মানবীয় শক্তি সতত পরাভূত। বুঝিতে হইবে যে, যেমন পৃথিবীর অন্তরাল হইতে প্রাতরুদিত সূর্য্যের রক্তবর্ণ বিকৃত জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইলেও তাহার প্রখর কিরণের বিঘ্নসংঘটিত হয় না, তেমনই বিচার যুক্তিতেও জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রচ্ছন্ন থাকে না। তবে যে জ্ঞানের অবিকৃত স্থিতি সত্ত্বেও তাহার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায় না, উহার কারণ এই যে, যতক্ষণ মানুষ স্বভাবগত ভ্রান্তি-চিন্তার ভীষণ স্রোতে ভাসিতে থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত জ্ঞানের সম্মুখে কিরূপে আসিবে? শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্কলঙ্ক চিন্তার প্রতি অনুরাগ না জন্মিলে, প্রজ্ঞাতত্ত্বের অনুশীলনে তৎপরতা প্রদর্শন করা বৃথা!

অতি সত্য যে, মানুষ অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে জ্ঞানের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিতে চায় না। তাই সময়ে সময়ে বিষয়াসক্তির কূট প্রলোভনে, স্বার্থ-পরতাদির অনিবার্য্য উত্তেজনায়, একেবারে অধীর হইয়া পড়ে। সুতরাং নৈতিক চরিত্র দ্বারা উন্নত উদার প্রকৃতি ও বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত প্রণয় সংস্থাপনে অসমর্থ হয় এবং আত্ম সুখেচ্ছার চরিতার্থতা নিবন্ধন উগ্রকটাক্ষে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি, পলক পাতের অবসরকাল মধ্যেও ভীষণ অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রমাদ উপস্থিত করে। এই যে সমূহ পাশবিক বুদ্ধির পরিচালনা, ইহা কেবল একমাত্র অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই হইয়া

থাকে। অতিধ্রুব সত্য যে, মানব-চরিত্র দেব-চরিত্রে পবিত্র না হইলে, কখনই ঐ মুক্ত-জ্ঞান প্রাণে ফুটিতে পারে না। তন্নিমিত্ত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে কোন তত্ত্বই হউক না, তাঁহারা ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত কাহারও সাধনে প্রবৃত্ত হন না। কারণ যেমন শরীরের ভিতরে জীবনী-শক্তি শোণিত-প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেলে, ঐ শরীর মৃৎপিণ্ডবৎ অসার—তেমনই জ্ঞানবিহীন ধ্যানযোগ সাধনাদি সকলি যে বৃথা হয়। হায়! জ্ঞানপ্রবাহ যে অন্তর-বাহির পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। সেই অন্তরাকাশভেদী জ্ঞানের অনন্তব্যাপিনী প্রভা বাহ্যজগতেও প্রত্যেক প্রাণী ও পদার্থ মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। একটী বৃক্ষ-পল্লবের অতি সূক্ষ্ম শিরার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়াও কি আমরা জ্ঞানের পরিচয় পাই না। ঐ লতা-বৃক্ষটী স্বীয় গ্রন্থীস্থিত আঁকড়া দ্বারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটী তৃণ বা কোনরূপ আশ্রয় পাইলে, তাহাকে কেমন সুন্দর জড়াইয়া ধরে, ইহাতে কি জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রকট ভাব দেখা যায় না! উদ্ভিজ্জগতেও ত জ্ঞানের বিকাশ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। বস্তুতঃ বস্তুগত প্রচ্ছন্ন ভাবেও মহৎ শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। বৃহৎ ক্ষুদ্র কীটাদির মধ্যেও কোন না কোন প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মানবের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব থাকা সত্ত্বেও অগত্যা দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতেছি, পশু পক্ষী উদ্ভিজ্জের দ্বারা জ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্ত্বেরও কিছু কিছু জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। ঐ যে কুক্কুরটী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও "তু" শব্দের আহ্বানে অভিমানের মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়া কেমন সরল ভাবে সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্বর্গীয় সূক্ষ্ম-শিক্ষা তত্ত্বটী কোথা হইতে আসিল? ঐ বাবুই পক্ষীর কুলায় নির্ম্মাণ কারুকার্য্যটী কি জগৎ ধরিবে না? আবার বহু শাখা সমন্বিত সহকার তরুটী ফলভরে অবনত হইয়া দীনতার শিক্ষা দিতেছে, উহার পশ্চাতে উপদেষ্টা কে? মানুষ আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, পশু-পক্ষ্যাদি হইতে যে সকল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। বরং উপেক্ষা দ্বারা হতাদরই করে—এটি বাস্তবিকই প্রকৃতিগত অভ্যাস! নতুবা শত শত বার মুক্তপুরুষদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া একটী পলের জন্যও কেহ তদনুরূপ চরিত্র গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করে না কেন? ঐ যে পূতসলিলা তরঙ্গিণীর তীরস্থিত তুঙ্গ বটবৃক্ষ-তলে শতগ্রন্থী মলিন বসন পরিহিত, ফকীরটীর অগ্নিকল্প উপদেশ সহস্র সহস্র ব্যক্তি শ্রবণ করিলেন, গৃহে আসিয়া ত ঐ ঘোড়দৌড়ের কথা আর মানহানির মোকদ্দমার আলোচনাই অধিক হয়?

হায়! বড়ই দুঃখের বিষয় যে মানবগণ শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়াও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে অসাড় হইয়া যায়। অনিত্য ভোগ-স্পৃহা নিবন্ধন আলস্যপ্রিয়তা এবং কলুষিত প্রেমোন্মত্ততাই ইহার মূল কারণ। কেননা মোহমগ্ন চিত্তের কুটিল চিন্তার সংশ্রবে ঐ সকল কুৎসিৎ ভাব আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য শুভ সঙ্কল্প সমূহ মলিন ভাবে নিমজ্জিত হইয়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক শক্তির গতি অব্যাহত! আমরা যাহাকে অতি ঘৃণিত ও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করি, সেই ব্যক্তিই আবার সৎশিক্ষা প্রদান করে। এমন কোন প্রাণী নাই যে, তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ভিতরে পরিস্ফুট হয় না। বিশ্ব-ক্ষেত্রে যে দিকেই চাহিয়া দেখা যায়, সেই দিকেই ঐ জ্ঞানেরই তরঙ্গ অনিবার্য্য বেগে ছুটিতেছে। নদ, নদী, পর্ব্বত কানন সকল স্থানেই কোন না কোন জ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। বলিতে কি, একখণ্ড মারবেল প্রস্তরে বিবিধ প্রকার রেখার কারুকৌশল ও চিত্র সৌন্দর্য্য যে দেখা যায়, এটি কি স্বাভাবিক শক্তির কার্য্য বিশ্বাস করা যায় না? এই ত গেল স্থূল বস্তুতে স্বাভাবিক চিত্র দৃষ্টান্ত! আবার অতি ক্ষুদ্র প্রাণীতেও স্বাভাবিক শক্তির পরিচালনা কেমন শিক্ষাপ্রদ, তাহাও দেখুন! আমি এক দিবস বাস-গৃহের বারেন্দায় বসিয়া আছি। ঐ বারেন্দার পশ্চিম পার্শ্বে ভিতের গায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা একটা বৃহৎ কীটকে অনেক কষ্টে ও প্রাণপণে ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্রে প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মৃত কীটটাকে উহার ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারিতেছে না। তখন পিপীলিকারা ক্ষুদ্র ছিদ্রটী প্রশস্ত করিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে অনেক সময় লাগিবে বুঝিয়াই ঐ কীটটীকে খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত করিল! অল্পসময়েই ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সমস্তই লইয়া গেল। এই উদ্ভাবিনী-শক্তি-সঞ্জাত-জ্ঞান কি স্বাভাবিক নহে? উহারা কি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও পড়িয়াছিল? তবেই জানা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রবাহ প্রাণিজগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। আমরা আলস্যের ক্রোড়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, সুতরাং ঐ ক্ষুদ্র পিপীলিকা অপেক্ষাও নিশ্চেষ্ট! পরপিণ্ড-পোষিত হইয়া জীবনক্ষেপণ করিতেও বাধ্য! উক্ত পিপীলিকাদিগের নিকট আরও একটী মহোচ্চ শিক্ষার বিষয় এই যে, উহাদের একাগ্রতার সহিত একপ্রাণতার সখ্যবন্ধন কেমন দৃঢ়। কোন প্রকার স্বার্থ-পরতা-কলুষিত ভেদ বুদ্ধির বিন্দু মাত্রও সংস্পর্শ নাই। ফলতঃ মানবগণ প্রকৃতির উচ্চ অধিকার সত্ত্বেও একখণ্ড ভূমির নিমিত্ত

রক্তপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; এবং নর-রুধির-সিক্ত কলেবরে ভীষণ গর্জ্জনে দিগ্বিকম্পিত করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে ছাড়ে না। এমন কি, স্বার্থবশে সহোদর ভ্রাতাকেও বিতাড়িত করিবার উদ্যোগের ত্রুটি করে না। এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ত উপর্য্যুক্ত পশু প্রবৃত্তির মানব-চরিত্রে ও ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগের চরিত্রে স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ কাহার মধ্যে সম্যকরূপে দেখিতে পান? নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, ঘৃণিত স্বভাবের মনুষ্য হইতে পিপীলিকাদিগের নৈতিক জ্ঞান ও একপ্রাণতার অমিয় ভাব কত মহৎ ও উচ্চ।

হয়ত অনেকেই এই প্রজ্ঞা শক্তির পরিচালন সম্বন্ধে ভ্রান্তি জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। বস্তুতঃ প্রাণি-চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করিলে জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে সকলেরই বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, প্রাণী মাত্রই জগতের কোন না কোন কার্য্য করিতেছে। যোগিগণ সমদর্শিতা শক্তি প্রভাবে জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হন, সুতরাং কোনও প্রাণীকেও তাঁহারা নিকৃষ্ট বা নীচ ভাবেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি আপনাকে নীচ ভাবেন, তাহা হইলে পরস্পরের সৌহৃদ্য সহজেই স্থাপন হয়। এবং অল্প সময়েই ধর্ম্মের উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন। কেননা পবিত্র আনুগত্যে সকলেরই প্রকৃতি একতার বিশুদ্ধ ছায়া স্পর্শে সমান হইয়া যায়। তখন আর কোনরূপ স্বার্থ-চিন্তা বা অনিষ্টকর যাতনায় ব্যথিত হইতে হয় না! এই মহতী সহানুভূতি ও মিলনের অমিয় শক্তি বলে ঈশ্বরানুরাগ জাগিয়া উঠে এবং বিশ্বাসের বলও দৃঢ় হয়। আবার এটিও সত্য যে, মানবীয় বাসনাটী ভুলিয়া দেব-ভাব জাগাইতে না পারিলে, পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় স্বভাবের ভিতরে যে গূঢ় তত্ত্বটী নিহিত আছে, তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে না। বস্তুতঃই উন্নত হইতে হইলে, নিজকে যতই নীচ বা ক্ষুদ্র বলিয়া স্থির করা যায়, ততই জগতের প্রীতির চক্ষে স্থান পাইয়া উন্নত স্তরে আসিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইহার বিপরীত পথে চলিলে নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, আপনাকে উন্নত দেখিলে, সে অবনতির দিকে টলিয়া পড়িবেই পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক। ঈদৃশ ইচ্ছার আবেগে ও অহম্ভাব প্রভাবে অহমিকামিশ্র ঘন প্রলোভন দ্বারা চিত্তকে অধীর করিবেই করিবে। সুতরাং শুভ চিন্তা ও সাধু অনুষ্ঠান সকল বিলুপ্ত হইবেনা কেন? আর সেই একতার সহানুভূতি এবং সরলতার মধুর ভাবই বা কেন আসিবে? এজন্য দীনতার সাধন করা নিতান্ত

আবশ্যক। তাহার আশ্রয়ে নিজকে তুচ্ছ জানিয়া উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস স্থাপন বিষয়েও একটু দৃষ্টি রাখা উচিত যে, আমি যদি সর্ব্বদা আপনাকে অবিশ্বাসী বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে, সত্য সত্যই এমন এক সময় আসিবে যে, হৃদয়ের বদ্ধ দ্বার হঠাৎ খুলিয়া যাইবে, ঐ অবিশ্বাসের ভিতরে অনুতাপ আসিয়া ব্যাকুল করিবে, বিশ্বাস তখন আপনা হইতেই আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অসীম শক্তিমণ্ডলে লইয়া যাইবেই যাইবে। অতঃপর প্রাণিজগতেও বৃহৎ ক্ষুদ্র ধনী দরিদ্র সকলেরই নিকট জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আশা করা কর্ত্তব্য। ঐ বিদ্যারত্ন মহাশয় অসংখ্য অসংখ্য শাস্ত্র সমূহ মুখস্থ রাখিয়া প্রলয়কালের ঝটিকার ন্যায় বক্তৃতা করিতেছেন। স্মৃতি শ্রুতি পাতঞ্জল প্রভৃতির সূত্র ব্যাখ্যায় সভা স্থলটী একবারে নীরব! কিন্তু ঐ যে এক পার্শ্বে নিভৃতে একজন নিরক্ষর অপরিচিত ভিক্ষুক অতি ক্ষীণ স্বরে যোগ-ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছেন, তাঁহার অগ্নি-কল্প ধর্ম্মের কথা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ এবং সাত্ত্বিক ভাবের আবেগে অশ্রু-মগ্ন। ঈদৃশ আলোচনা ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি?—নিশ্চয়ই ঐ উভয় উপদেষ্টা হইতে জ্ঞান-রত্ন সঞ্চয় করিতে হইবে। অপরিচিত উক্ত দীন নিরক্ষর ভিক্ষুক এবং বহু শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত উভয়ই এক সূত্রে নিবদ্ধ! কারণ, তত্ত্বাকাঙ্ক্ষী সাধুগণের নিকট জ্ঞান-শিক্ষার পাত্র ভেদ নাই। চৈতন্যদেব ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছিলেন। রূপগোস্বামী দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে বিচার না করিয়াই পরাস্ত স্বীকার করেন এবং জয়পত্র লিখিয়া দেন। এখানে এই উভয় দেব-প্রকৃতির ভিতরে আমরা কোন্ জ্ঞান পাইলাম—আত্ম-অভিমান শূন্য উদার জ্ঞান নহে কি?

উপর্য্যুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় যে, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায় দ্বারা বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন এবং ঐ ভিক্ষুক ব্যক্তিটী স্বাভাবিক জ্ঞানে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সমুদয় অনায়াসে বলিতেছেন, ইহার ভিতরেও একটু চিন্তার বিষয় আছে যে, শাস্ত্র-জ্ঞান পার্থিব কর্ম্ম-কাণ্ডের আবরণে নিবদ্ধ সুতরাং উহার মধ্য দিয়া পূত প্রজ্ঞার বিশ্ব-ব্যাপিনী জ্যোতিঃ স্ফুরণ হওয়া অসম্ভব! কিন্তু আর্য্য ঋষিদিগের হৃদয়-গ্রন্থ হইতে যে স্বাভাবিক তত্ত্ব জগতে আসিয়াছে এখনও মানব-হৃদয়ে সেই প্রজ্ঞাই প্রকাশিত হইতেছে, তথাপি অনেকেই শাস্ত্র জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া স্বাভাবিক চিন্তার প্রতি বড় চেষ্টা করেন না। বস্তুতঃ সূক্ষ্মান্তঃকরণে ভাবিয়া দেখিলে, স্বাভাবিক জ্ঞান কোন রূপ কল্পনায় কলুষিত নহে, উহা নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক। শাস্ত্র জ্ঞানের ভিতরে উহার প্রক্ষিপ্ত

আবরণগুলি ঘুচাইয়া দিলে ঐ স্বাভাবিক জ্ঞানেরই অমৃত-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। জগতে যুক্তি, তর্ক, বিচার প্রভৃতি যত প্রকার জ্ঞানের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বাহ্য কর্ম্মোপযোগী অনেক বিষয়ের উপকার পাওয়া যায় বটে, ফলতঃ ঐ সকল জ্ঞানে সরল চিন্তা-শক্তিও অতি প্রখর হইয়া উঠে। তদ্দ্বারা যোগ, ধর্ম্ম, নৈতিক তত্ত্বের উন্নতি সাধনে বরং বিঘ্নই হইয়া থাকে। বলিতে কি, বিচার জ্ঞানই ভেদ বুদ্ধির পরিচায়ক ও সন্দেহবাদের সহায় স্বরূপ এবং সরল পথকে বন্ধুর করিয়া ফেলে। উহা দ্বারা অহং-সঞ্জাত তর্কের তীব্র তাড়নায় মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। বহু শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরাই আবার অধিকতর অধীর হইয়া পড়েন। এমন কি, বিচার কালে মনুষ্যত্ব ভাবের ব্যত্যয়ও দেখা যায়। অতি শান্ত-স্বভাব-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিকেও দেখা গিয়াছে, তিনিও ক্রোধ-ভরে সংজ্ঞাহীন! তবে কি বলিতে পারা যায় না যে, বিচার-জ্ঞান কি ভয়ঙ্কর। অতএব সকলেরই এই ঘোর অনিষ্ট-প্রদ বিচার-জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করা বিধেয় নহে। উহার বিপদ-সঙ্কুল অবস্থা গুলি স্মরণ করতঃ সতর্ক থাকাই উচিত।

এখন দেখা যাক্ স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তির সম্বন্ধ কি—তাহারই একটু চিন্তা করা আবশ্যক। এই ত্রিবিধ তত্ত্বের পরস্পর অতি গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানবিহীন কর্ম্ম ও ভক্তি উভয়েরই শক্তি দুর্ব্বল! জ্ঞান প্রভাবেই কর্ম্মীর নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তির অভেদ ভাব জাগিয়া উঠে! আবার জ্ঞানেরও ঐ সেবা-নিরত কর্ম্ম ও ভক্তির সহিত আনুগত্য না থাকিলে, তাহারও স্বভাব অত্যন্ত কঠিন ও উগ্র হইয়া পড়ে। কিছুতেই শান্তির অমৃত ক্রোড় গ্রহণ করিতে চায় না। যাহা হউক, প্রথমতঃ কর্ম্ম-যোগ তত্ত্বের চিন্তারই প্রয়োজন হইতেছে। কর্ম্ম (কৃ) ধাতুতে যুক্ত—'কৃ' অর্থে করণ অর্থাৎ কর্ম্ম করা। কর্ম্ম সাধনেরও দুইটী অবস্থা! একটী সকাম—অপরটী নিষ্কাম। কর্ম্ম-যোগের বিষয় শাস্ত্রের উজ্জ্বল চক্ষু গীতায় যথেষ্ট বিবৃত আছে। তথাপি উহারও একটু স্বাভাবিক সাধন চিন্তার বিষয় চেষ্টা করা নিষ্ফল নহে। পুরাণ-জ্ঞান-সম্ভূত সকাম কর্ম্মেই অনেকের প্রবৃত্তি বেশী। কেননা মানুষ সকাম সাধন-জনিত ঐশ্বর্য্য, যশঃ মান ইত্যাদি ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। বস্তুতঃ উহাতে আধ্যাত্মিক বা ঐশী তত্ত্বের সহিত সম্পর্ক কতদূর সম্ভবপর একটু ভাবিবারই কথা! কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনে কোন প্রকার পার্থিব বাসনা নাই, উহা কামনাদি বহির্ভূত। একমাত্র নিত্য বস্তুর প্রতি নির্ভর ও অনুরাগ রাখিয়া

কেবল জ্ঞানের অনাবৃত শক্তি প্রভাবে কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ভুলেও কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা অথবা "আমি এই কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিব" এই সকল বাসনাও থাকিবে না। স্বাভাবিক মুক্ত জ্ঞান কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিল, আমি তাহা পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে যে কি হইবে, কেনই বা করিতেছি, ইহা কিছুই ভাবিতে হইবে না। এবং কোনরূপ সাধুকার্য্য করিতেছি, মনে করিয়া আনন্দ উৎসাহে অধীর না হওয়া ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলার জন্য অপরাধী হইয়াছি, ইহাই হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে রক্ষা করতঃ কর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যে নিঃসহায় স্থবির প্রতিবেশীটী একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত অশ্রুপাত করিতেছে, তাহার নিমিত্ত প্রাণের আবেগে ও আকুল হৃদয়ে একটু চিন্তা করা, এটি কি কর্ত্তব্য নহে? কর্ম্মের ভিত্তিই যে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা—উহার উপর যদি দায়িত্ব বোধ না থাকে, তবে যতই কেন সৎকর্ম্মের আড়ম্বর করুন না, সকলি বৃথা! কারণ, কর্ত্তব্যপরায়ণতার দায়িত্বই কর্ম্মনিষ্ঠ যোগীর প্রধান কার্য্য। উহার অভাবেই মনের গাঢ় অনুরাগের বা দৃঢ়তার ব্যত্যয় হয়। হয় ত আজ উপর্য্যুক্ত প্রতিবেশীটীর প্রতি প্রাণে একটু ব্যাকুলতার উদয় হইল, কাল তাহার অবস্থার বিষয়টীর বিন্দুবিসর্গও স্মরণ রহিল না। ইহাকেই দায়িত্ব-শূন্য কর্ত্তব্যপরায়ণতা বলে। ঈদৃশ কর্ম্ম করা অপেক্ষা বরং না করাই শ্রেয়ঃ। স্বাভাবিক জ্ঞানোপদেশে যে সমূহ কর্ম্ম নিষ্পাদন করা যায়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম এবং তাহাতে বিশুদ্ধ চিন্তার সম্পূর্ণ সংশ্রব আছে। শত শত সাংসারিক কার্য্য নষ্ট হইয়া যাক না কেন; কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে, এই প্রতিজ্ঞা-বল যেন দুর্ব্বল না হয়। উহার ভিতরে নিজের কোনই শক্তি কি কোনরূপ ইচ্ছার কার্য্য না থাকে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। "কর্ম্ম করিতেছি—উহা আমার কর্ত্তব্য—না করিলে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে" এই ভাবটী যতক্ষণ জীবনে জাগিয়া না উঠে, ততক্ষণ কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যায় না।

জগতে অধিকাংশ ব্যক্তিরই কার্য্য কলাপে সকাম কর্ম্মানুষ্ঠিত বিষয়েরই অধিক অনুরাগ দেখা যায়। ইহা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য জ্ঞানে আদৃত হইয়াছে বটে, ফলতঃ ঐ সকল শাস্ত্রেই আবার নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগই শ্রেষ্ঠ, তাহারও যথেষ্ট উপদেশ আছে। ইহার গূঢ় চিন্তায় প্রবেশ করিলে এই সত্যটী জানা যায় যে, মানুষ অন্যকে কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার দিয়াও আশু ফল সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়, এবং এই সহজ সুবিধাটুকুত কম নহে। সুতরাং উহাতে বদ্ধ থাকিতে কেনই বা যত্ন হইবে না? বলিতে চাহিনা যে,

সকাম কর্ম্মের ভিতরে কোন সত্য নাই—অবশ্যই আছে, উহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রবেশ করিবারই সম্ভবতঃ একটী দ্বার-স্বরূপ। কিন্তু চিরজীবন তাহাতেই বদ্ধ থাকা যেন সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যিনি প্রকৃত কর্ম্মী—তাঁহার ঐরূপ কর্ম্মযোগের প্রতি অনুরাগ কেন হইবে? যিনি আঙ্গুর ফল খাইয়াছেন, তিনি কি কখন চিত্রিত ফলে সন্তুষ্ট হন? যে কর্ম্ম সাধনে অনন্ত শক্তিমণ্ডলে মিশিতে পারা যায়, তাহারই ত সাধন করা বিধেয়। অবশ্য নিত্য বস্তুর আকাজ্ক্ষা করিতে হইলে সংসার ক্ষেত্রে কঠোরতার কিঞ্চিৎ যাতনাও সহ্য করিতে হয়। নিজের বুদ্ধিবল হারাইয়া একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে পারিলে, কর্ম্মযোগের উজ্জ্বল পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়, ইহা নিশ্চিত সত্য। নির্ভরশীল যোগীরা ত নিজের কোনই কর্ত্তৃত্ব রাখেন না। একমাত্র ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তাহা পালন করাই তাঁহাদের কর্ম্ম-যোগ। নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধনে কর্ম্মযোগীর কোন-রূপ কামনা বা বাসনাযুক্ত ইচ্ছা থাকিবে না। যাঁহার হৃদয় উদার প্রেমে পূর্ণ—তাঁহারই কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃই যিনি নিজের সুখেচ্ছা ও ভোগ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরদুঃখ দূরীকরণ নিমিত্ত সতত ব্যস্ত, বলিতে কি, তিনি শত্রুর অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও অকৃত্রিম প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা সখ্য-বন্ধনে বিজড়িত থাকিতে বিরত হন না। চক্ষের নিমেষ কালের নিমিত্তও তাঁহার শুভ চিন্তার প্রতি কোন বিঘ্ন সংঘটন হয় না। ভাবিয়া দেখিলে এরূপ কর্ম্মীই জগতে নিষ্কাম কর্ম্মী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু একটী কথা এই যে, কর্ম্মনিষ্ঠ যোগীর প্রাণে অহেতুকী ভক্তি ও সেবাশক্তির প্রয়োজন হয়,—তাঁহার যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের সঙ্গে ভক্তির প্রীতি না জন্মে এবং সেবার আকাজ্ক্ষা অনুরাগ না থাকে বা এরূপ অবস্থাতে কর্ম্ম-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেও তাহার পরিণাম কি—সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। এখানে আর একটী কথা উল্লেখ করিতেছি, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরদুঃখ-কাতরতা, ইহাও কর্ত্তব্য কর্ম্মের একটী প্রধান সহায়। অতি নিশ্চিত যে ইহা দ্বারা সেবা-ভক্তি-কর্ম্ম ইহাদের পরস্পর এতই ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হয় যে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা। ঈদৃশ অবস্থাতেই কর্ম্ম-নিষ্ঠ কর্ম্মী কর্ম্ম-সাধনের পবিত্র পথে উপস্থিত হইয়া শান্তির অতলতলে নিমজ্জিত হন, এবং অজস্র অমিয়-অশ্রু-তরঙ্গে নীরস প্রাণকে সরস করিয়া লন। তখন তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের বিঘ্ন-বিড়ম্বনা আর থাকে না।

বাস্তবিক নিষ্কাম কর্ম্মীর হৃদয়ে ভক্তির অভেদ ভাবটা পরিস্ফুরণ হইলে

যোগের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি জন্মে। তখন আর তিনি কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন থাকিতে পারেন না। কারণ কর্ম্মের সহিত ভক্তির যে অবিচ্ছিন্ন প্রীতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ জ্ঞানের অমৃত উত্তেজনা ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রতি মুহূর্ত্তে পড়িতেছে। তাই বলিতেছি, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির মিলন কি মধুর হইতেও মধুর। একবার মনে করিলেও প্রাণ শীতল হয়। ভক্তি যে (ভজ) ধাতুতে সিদ্ধ। কর্ম্মের প্রণয়-বন্ধনে ভক্তি জড়িত হইলে, সাধনশীল ভক্তের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র প্রাণ হইতে কতই যে পীযূষধারা বর্ষিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু ভক্ত যোগীকেও সতত সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য যে, একটী পলক-পাতের অবসরকাল মধ্যেও যেন বিন্দুমাত্র কোনরূপ ফল কামনা কিংবা পার্থিব সুখের বাসনা অন্তরে প্রবেশ না করে। প্রাণী নির্ব্বিশেষে সেবাব্রত পালন এবং পরদুঃখে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে পারিলে জানা যায় যে, ভক্তির নির্ম্মলাশক্তির মৃদুতরঙ্গ প্রাণে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। তখনই ঐ সান্ধ্যসময়ে দুর্গম পথি মধ্যে অতিবৃদ্ধ পঙ্গুটী ভীষণ চিন্তায় আকুল—তাহাকে স্কন্ধে লইয়া তাহার জীর্ণ কুটিরে যাইতে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ থাকে না, প্রাণ আকুল হয়। বস্তুতঃ যখন মানব-প্রাণ ঐশীশক্তির আকর্ষণে পড়ে, তখন একমাত্র কর্ত্তব্যতাই তাহার পশ্চাতে থাকিয়া তাহাকে উর্দ্ধে উঠাইয়া দেয়। ফলতঃ "কর্ত্তব্য"—ইহাকেও নিঃস্বার্থ ভাবের ভিতরে রাখিতে হইবে। যিনি, ঐ রাজ-পথের এক পার্শ্বে নিঃস্ব অনাথ শিশুটী যে রোদন করিতেছে, তাহাকে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া পুত্রবৎ বাৎসল্যের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন; যিনি ঐ যে অন্ধটী ঘোর অন্ধকারে অরণ্যপথে চলিয়াছে, তাহার দক্ষিণ হস্ত খানি ধরিয়া উহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া দেন, যিনি ঐ জনশূন্য বৃক্ষ তলে ক্ষতরোগে আক্রান্ত, সেই অসহায় অপরিচিত দরিদ্রটীকে ঔষধাদি দ্বারা তাহার আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত নিকটে থাকিয়া সেবা করেন, নিশ্চয় ইঁহারা প্রকৃত ভক্তি সাধনের উপযুক্ত ভক্ত ও পাত্র। ইঁহারাই অহেতুকী ভক্তির মর্ম্ম জানিয়াছেন, এবং পর-সেবার ভিতরে যে প্রাণ-মুগ্ধ আনন্দ উচ্ছ্বাস ও মধুর ভাবটুক রহিয়াছে, তাহার আস্বাদন ভোগ করিবার যোগ্য! ইঁহারাই ত ভক্তির স্নিগ্ধ শক্তির আশ্রয়ে পবিত্র ও ধন্য হইয়াছেন, এবং মানব-চরিত্রকে দেব চরিত্রে গঠন করিয়া মহাপ্রাণতার অখণ্ড উচ্ছ্বাসে নিয়তকাল ভাসিতেছেন। আহা! অভেদ-ভক্তির অকৃত্রিম সেবার মধুর মাহাত্ম্যটুক যিনি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীতে আত্মার অবস্থিতির গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়া পদ-দলিত তৃণ হইতেও নীচ স্বভাবে আকৃষ্ট

হন। জগতে সকলের মধ্যে অনাদি চিন্ময় শক্তির জ্বলন্ত জ্যোতিতে ডুবিয়া যান। জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে একটী ক্ষুদ্র কীট ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,উভয়েরই অন্তরে একই আত্মার বিকাশ প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন তাঁহার প্রতি কেমন করিয়া ভেদ প্রবৃত্তি উগ্র মূর্ত্তিতে শাসন-ইচ্ছা প্রবল রাখিবে? সে যে ভক্তের অভেদ-ভক্তির সম্মুখে আসিতেই পারে না! কেননা ভক্তির স্বর্গীয় বিশুদ্ধ সেবায়, বিশ্ব-বিচিত্র-ক্ষেত্রেও সকলকে এক করিয়া দেয়। সুতরাং যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকেই নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মলা ভক্তির সেবায় ভক্তগণের অজস্র অশ্রু-সুধা-বর্ষণ ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। বস্তুতঃই অপ্রভেদ ভক্তির অকৃত্রিম ভালবাসায় ব্রাহ্মণ যবনে এক প্রেমে উন্মত্ত হন; শত্রু, মিত্র-ভাবে আর আলিঙ্গন না করিয়া শান্তি পায় না। অনুতাপের তীব্র দহনে দ্বেষ-দম্ভাদি কুটিল চরিত্র বিনষ্ট হইলে, কে এমন আছেন যে ভক্তির স্নেহময়ী মাতৃশক্তির পূজা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন! তাঁহার যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও পর-সেবা বিরতি ইচ্ছা হয় না, ঐ রুগ্ন ভগ্ন নিরাশ্রয় ভাইটীর "কষ্টের পরাকষ্ঠা নাই" তাহারই চিন্তায় সতত আকুল ও অশ্রুধারায় নিমজ্জিত থাকেন। ভগবদ্‌তত্ত্বদর্শী ভক্তের প্রাণ যখন ভক্তি-তরঙ্গিণীর পূত প্রবাহে নিমগ্ন হয়, তখন তাঁহার বহির্ভাবের দৃষ্টি থাকে না, অথচ সকল প্রকার শরীরাধারে এক নিত্য সত্য পরম চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না। তখনই ভক্তের হৃদয়ে নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত নির্ম্মলা ভক্তির মধুর মিলনের বিশ্ব-মুগ্ধ সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয়ে বঞ্চিত থাকিলে তাদৃশ মিলন সৌন্দর্য্য থাকে না, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সকাম ও আসক্তির অনুগত হয়, ভক্তি প্রখরা হইয়া অতিশয় অস্থিরতা প্রদর্শন করে। এই জন্য কর্ম্মী এবং ভক্তকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়। ইঁহাদের উভয়কেই জ্ঞানের বিশুদ্ধ উপদেশ লইয়া কর্ম্ম ও ভক্তির সঙ্গে মিলিত থাকা উচিত। তাহা না হইলে, প্রকৃত তত্ত্বের অনুশীলন করা সকলি বৃথা হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে এখানে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, ভরসা করি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এক সময় একজন জ্ঞান-যোগী তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। পথিমধ্যে এক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মযোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে জ্ঞানযোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? তিনি বলিলেন, "তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই"—মূলকথা, তীর্থ পর্য্যটনে তিনিও বাহির হইয়াছেন। জ্ঞানযোগী বড় সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, তবে এক সঙ্গেই কেন চলুন না! কর্ম্মযোগী তদুত্তরে

বলিয়াছিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? তিনিও ঐ কথাই তাঁহাকে জানাইলেন। নানাবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উভয়েরই বড় সদ্ভাব জন্মিল! একদিন গমন-পান্থে আর একজন ভক্তযোগীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাকেও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও তীর্থ দর্শনের কথাই বলিলেন। জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত তিনটী যোগী মিলিত হইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। সে দিন অধিক পথ-পর্য্যটন-পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া রাজপথের এক পার্শ্বে একখানি দোকানের সম্মুখে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থ বৃক্ষতলে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন বেলা ঠিক দুই প্রহর! দোকানীর একখানি ঘরমাত্র ঐ ঘরের চালায় একটী গাভী বাঁধা রহিয়াছে। কিছু দূর ব্যবধানে একটী জলাশয় আছে, দোকানী সেই সময় স্নান করিতে যায়। ইতিমধ্যে ঐ ঘরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কর্ম্মনিষ্ঠযোগী কর্ত্তব্যপরায়ণতার তীব্র দংশনে কমণ্ডলুটী হস্তে করিয়া জলাশয়ের অভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময় জ্ঞানযোগী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, ঘরখানি পুড়িয়া যাইতেছে, তাই জল আনিতে যাইতেছি, বিলম্ব হইলে ঐ গাভীটীও পুড়িয়া মরিবে। জ্ঞানযোগী একটুক হাস্য করিয়া বলিলেন, বিলক্ষণ! ঐ ক্ষুদ্র পাত্রটীর জলে অত বড় ঘরখানি রক্ষা করিবেন? আপনি ঐ গাভীটিকেই কেন লইয়া আসুন না! কর্ম্মযোগী অবাক্ হইয়া কিছুকাল পর বলিলেন, তাইত! তখন অতি সত্বর গমনে গাভীটীকে লইয়া আসিলেন। দোকানী গৃহে আসিয়া দেখেন, তাহার ঘরখানি পুড়িতেছে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া গাভীটি যে কর্ম্মযোগীর নিকট প্রাপ্ত হইল, উহাতেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তি ভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। সে দিন দোকানী তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না, যথাসাধ্য অতিথি সৎকার সমাপন করতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষে যোগীত্রয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইতে যাইতে রাজ-পথের নিকটে একটী নিম্ব বৃক্ষ ছিল, ভক্ত যোগী ছিন্ন তরুর ন্যায় ঐ বৃক্ষ মূলে পড়িয়া গেলেন—আর উঠেন না! জ্ঞানযোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ঐরূপ পড়িয়া রহিলেন কেন? ভক্ত তদুত্তরে এই কথাটী বলিয়াছিলেন, মহাশয়! এই নিম্বকাষ্ঠে জগন্নাথদেব গঠিত হইয়াছেন, এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই ভক্ত যোগীর হৃদয়ে তখন অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত ভগবৎপ্রেম জাগিয়াছিল, তথাপি, জ্ঞানযোগী তাঁহার সান্ত্বনা কল্পে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নিম্ব বৃক্ষটী ত স্বভাবেই রহিয়াছে, তবে এত অস্থির হওয়ার প্রয়োজন কি,

যদি কখন এই বৃক্ষ দ্বারা ঐ দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হয়, তখনই ত প্রণাম ও পূজা-অর্চ্চনার কথা—এখন কি? ভক্ত সংজ্ঞা লাভ করিলে, যোগীত্রয় তীর্থ দর্শনে চলিয়া গেলেন।

তবেই দেখুন! কর্ম্মীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যদি জ্ঞানের বীজ না পড়ে, তাহা হইলে প্রাণভেদী কর্ত্তব্যানুরাগের শক্তিও দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং কর্ম্ম-যোগের বিঘ্ন সংঘটিত হয়। ভক্তও প্রজ্ঞাতত্ত্বের বাহিরে থাকিলে, উন্মাদিনী ভক্তির অসার উত্তেজনায় বন্ধুর পথ ভ্রমণ করতঃ অতিশয় ক্লান্ত ও অধীর হন। সুতরাং জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তির সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন না হইলে, এক এক কর্ম্মী এবং ভক্তের স্বর্গীয় শান্তির প্রত্যাশা করা সুদূরপরাহত। কেননা জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম ও ভক্তির জীবন রক্ষা হওয়াই যে অসম্ভব। উহারা যে জ্ঞানের চির সেবক। সেবিকারূপে নিজ নিজ যোগ ধর্ম্মের অমিয় রসে নিয়তকাল নিমগ্ন রহিয়াছে। বস্তুতঃই কর্ম্মীর ভিতরে অহেতুকী ভক্তি এবং ভক্তের অন্তরে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন সিদ্ধ হইলেই ত সার্ব্বভৌমিক প্রেমের সাহায্যে যোগতত্ত্বের বিমলানন্দ প্রাণে প্রকাশ পায়। তখন আর মতভেদ, ধর্ম্মভেদ ও সম্প্রদায় ভেদ কিছুমাত্র থাকে না। সকলের মধ্যে জ্ঞান,কর্ম্ম, ভক্তি এক সুরে কার্য্য করিতে থাকে, কোন প্রকার বিঘ্নপ্রদ বিভ্রাট-বিড়ম্বনা উপস্থিত হয় না। সরলতার উদার আনুগত্যে প্রত্যেক প্রাণীর মুখমণ্ডলে সৌহৃদ্যতার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে জান্তব জগৎ যেন আনন্দের অনিবার্য্য আবর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। এবং মানব-চিত্তকে একতার দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ রাখিতে একান্ত ব্যগ্র ও উৎসাহিত হয়। আমরা বুঝিলাম না যে, প্রাণীজগৎ কেন? শূন্যভেদী অখণ্ড চিন্ময় মহাদেশে শক্তি-প্রবাহের ব্যাপারই ত যথেষ্ট—ইহার গভীর চিন্তায় প্রবেশ করিলে কি জানা যায় না যে, মহাপ্রাণের বিকাশ-তরঙ্গ ও চৈতন্য তত্ত্বের প্রত্যক্ষতার সঙ্গে বিশ্বাস স্থায়ী নিবন্ধন জান্তব শরীর? এই শরীর-যন্ত্র ক্ষণ-ভঙ্গুর হইলেও পলক কালের মধ্যে যদি বিশ্বভেদী চিৎশক্তিকে ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলেই ত স্বাভাবিক যোগের প্রশস্ত পথ একটু উন্মুক্ত দেখিলাম। কিন্তু বিশ্বের বাহ্য আবরণে আবদ্ধ থাকিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তির উত্তাল তরঙ্গে ভাসিতেছি, তথাপি একবার পরম তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না, তাই আমরা জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির উদার মিলন সামঞ্জস্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসি। যে কোন যোগ-সাধন-সিদ্ধান্তে উপনীত হই না কেন, তাহার গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ না করিয়া যদি একদেশদর্শীতার ভ্রমে মূল সত্যের অনু-

সন্ধানে বিরত হই, তাহা হইলে যোগ-শক্তি প্রাণে প্রবিষ্ট হইবে কিরূপে? রাজ-যোগ, হঠযোগ, বিজ্ঞানযোগ প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে স্বাভাবিক ঐশী শক্তি রহিয়াছে। যেমন শরীর-স্থায়িত্বের সর্ব্বপ্রধান জীবনীশক্তি শোণিত-প্রবাহ, তেমনই সমস্ত যোগের ভিতরেও একমাত্র স্বাভাবিক যোগ শক্তি বিদ্যমান আছে। প্রত্যুত সকলেরই বহির্ভাবটী ঘুচিয়া গেলে, অন্তরস্থ ভাবের ভিতরে নিশ্চয়ই উপর্য্যুক্ত যোগসমূহ, অভেদ চিন্তার অনুকূলে সাহায্য করিবেই করিবে। অতএব এই জলবিম্ববৎ নশ্বর শরীরের অবস্থাটী স্মরণ করতঃ জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতির অবিচ্ছিন্ন মিলনের জন্য সতত অনুরক্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। বিষয়-বাসনার তুঙ্গ তরঙ্গে পড়িয়া আর সময় পাত করা বিধেয় নহে।

পঞ্চম উল্লাস।

সংযম-চিন্তা।

মানব-চরিত্র গঠন করিতে হইলে প্রথমতঃ বাক সংযম চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ, বহুভাষীরা অধিক সময় বিবিধ গল্প-কল্পনার অনুরোধে অসত্যের নিবিড় জালে জড়িত হইয়া পড়েন। বিশেষ কোনরূপ প্রমোদসূচক আলোচনার পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য নিমিত্ত এবং কৌতুকাবহ অসার কথায় শ্রোতৃবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিতে যথেষ্ট উল্লাসিত হন। কিন্তু ঐ লোকচিত্ত-বিনোদনকারী গল্প-তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িলে যে সত্যের স্থায়িত্ব সম্ভবে না, এটি ক্ষণ কালের জন্যও স্মরণ হয় না। বস্তুতঃই আমরা ঈদৃশ অবস্থাতেই সময় পাত করিতেছি। প্রাচ্য ঋষি-ভাবটী অনাস্থা রূপ অন্ধকার কূপে ডুবাইয়া দিয়াছি। আহা! সেই ঋষি-পুঙ্গবগণের পদাঙ্ক স্পর্শ-চিন্তা না করিয়া যে ভ্রান্তি-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইতেছি এবং কত যে সত্যের অপলাপ করিতেছি, তাহার কি পরিসীমা আছে? আর্য্য ঋষিগণ পুরাকালে যে সকল ধর্ম্ম-চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহা এখন কোথায়? হায়! তাঁহারা অসার বাহ্য কথার আড়ম্বরে যে সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াই ত অরণ্যআশ্রয় করিয়াছিলেন। সংযম-সাধন সম্বন্ধেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মৌনব্রত গ্রহণ করেন। তবেই বুঝা যাইতেছে যে সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা বাক্য সংযম—ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই তাঁহারা মুনি নামে অভিহিত হইয়াছেন। মুনি অর্থে মৌনব্রতধারী ঋষি—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

(গীতা, ২য় অধ্যায়, ৫৬ শ্লোক)

দুঃখ সন্তাপে যিনি উদ্বিগ্ন বা ব্যাকুল না হন ও সুখৈশ্বর্য্যের প্রাণমুগ্ধ-প্রলোভনে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃহা রাখেন না এবং যে কোনও ভাবেই হউক ভয়ক্রোধাদিতে বিগতরাগ হইয়া স্থির ধীর ভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি মুনিনামে বাচ্য। তাঁহারই হৃদয়ে সংযমের বিশুদ্ধ লক্ষণ বিকাশ পাইয়াছে। এখানে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি সংযমের মৌলিক তত্ত্ব বাক্ সংযমই হইল, তবে জগৎ কি একেবারে নীরব থাকিবে?—একথার

উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ঋষিরা সংযম চিন্তারও দুইটী দিক্ দেখাইয়াছেন। মুনি ও ঋষি-ভাব এক হইলেও তাহার সাধন প্রণালী দ্বিবিধ। ঋষিদিগের অধিকাংশেরই সংযম মত, সকল প্রকার লোভনীয় ও সাধন-বিঘ্নপ্রদ বস্তু মাত্রকেই পরিত্যাগ করতঃ একাগ্রতার নিমিত্ত সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া—মুনি-পুঙ্গবগণের সংযম ভাব, জগতের ভিতরে অবস্থিতি করিয়াও সার তত্ত্বের অনুসন্ধান ইচ্ছায় নির্ব্বাক্ অবলম্বনে সত্যরক্ষা এবং নিজ নিজ হৃদয়ে মহত্তত্ত্ব সমূহ সঞ্চয় রাখা। আমরা এই দুইটী দিক্কেই প্রাণগ্রাহী বলিয়া মনে করি ও তাহার সারগর্ভ উপদেশ সতত স্মরণ পূর্ব্বক সংযম-চিন্তার উন্নতি কল্পে কেনই বা উদাসীন থাকিব ? কিন্তু ইহার ভিতরেও সত্যনিষ্ঠ বাক্-সংযুক্ত সংযমী ঋষিগণই যেন উদার ভাবে একটু জগতের উন্নতি নিবন্ধন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারা পরদুঃখকাতর, সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট মানবদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহাদের বাক্-সংযমের উদ্দেশ্য এই যে, সত্য ভিন্ন অসার বাহ্য কথায় মনোনিবেশ করিতে হইবে না, অথচ সদুপদেশ দ্বারা ধর্ম্মহীন ব্যক্তির জীবনে সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে হইবে। মৌনব্রতধারী মুনিদিগের ভাব নীরব—তাঁহারা হস্ত-মস্তকের ভঙ্গী সঙ্কেতে নিরক্ষর অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে যতটুকু জ্ঞানের আলো দেখাইতে পারেন। ফলতঃ এই উভয় ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্য বস্তু মৌনিঅবস্থায় বদ্ধ থাকিলেও ঐ অস্ফুরিত সত্য, সাঙ্কেতিক ভাব-ভঙ্গীতেও নির্ম্মল পবিত্র তত্ত্বই প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এখানে মৌনী ও বাক্যুক্ত সত্য একই হইয়া পড়িল, সুতরাং উভয় দিকেই সংযম চিন্তার পথ উন্মুক্ত। কিন্তু সংসারাশ্রমী মানবগণের পক্ষে অসত্য আলোচনায় যে বাক্ সংযত ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রেয়ঃ। এবং উহা সুলভ ও সর্ব্বজন গৃহীত—তবে যাঁহারা মৌনব্রত গ্রহণে সুবিধা বোধ করেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যখন উভয় দিকেই সংযম-চিন্তার উপায় রহিয়াছে, তখন যাঁহার যেটী ইচ্ছা হয়, করিতে পারেন। আশ্রম আশ্রিত স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বেষ্টিত সংসার ক্ষেত্রে ঐ ঋষি-ভাব বাক্ সংযমনই কর্ত্তব্য। সংসারত্যাগী সংযমীর পক্ষে মৌনব্রত গ্রহণ করা দোষের নহে।

যাহা হউক, এখানে একটী বলিবার কথা এই যে,বহির্ভাবের বিবিধ বিষয়িনী চিন্তার ঘন ঘূর্ণনে মৌনব্রতধারী অতি সুদৃঢ় সংযমীর চিত্তকেও জগতের স্পৃহনীয় পদার্থের সৌন্দর্য্যে বিহ্বল করিয়া তুলে। তাঁহার অন্তর্মুখিনী নীরব

চিন্তাকে, সজন কোলাহলপূর্ণ প্রমোদ সুখের মিষ্ট তরঙ্গে ফেলিয়া পতন পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত করে এবং মনের চাঞ্চল্য বা উন্মত্ততার বেশ প্রবল করিয়া দেয়। সুতরাং মৌনব্রতধারীর সংযম চিন্তা ক্ষণ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখনই তিনি বিষয়-বাসনার অনিবার্য্য স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া উঠিবার আর পথ পান না। তাঁহার মনঃসংযম দূরের কথা—পূর্ব্ব-সঞ্চিত উন্নত অবস্থাটুকুও থাকে না। এই জন্য মৌনব্রতধারীকে অগ্রে বহির্সংযম সংগ্রামে জয়লাভ করা উচিত। নতুবা ঐরূপ বিপদাশঙ্কা একটী অনুপলের নিমিত্তও নিবৃত্ত হয় না। একেই ত রিপুকুল প্রতিকূল পথে লইবার জন্য ব্যস্ত—তাহার উপর ইন্দ্রিয়গণ মোহ মন্ত্রে মুগ্ধ করিতে ত্রুটি করে না, এমন অবস্থায় ইহাদেরই সংযম উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ যতই মনঃ শক্তি সাম্যগুণে, ইন্দ্রিয় ও রিপু সমূহের অন্তর্ভেদ করিবে, ততই মানব-চরিত্র পবিত্রতার কর্ম্মে ভূষিত হইয়া সংযম যুদ্ধের জয়লাভে সক্ষম হইবে। তখনই বহির্ভাবের আসক্তি ঘুচিয়া যাইবে। এবং অন্তর্মুখিনী চিন্তা শক্তি, পূত প্রজ্ঞার সহিত মিশিয়া সংযমীর অন্তরাকাশে চৈতন্য রাজ্যের অব্যক্ত জ্যোতিঃ ও অনুপম সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় সংসারাসক্তির আকর্ষণ যুগপৎ চলিয়া যায়, সকল প্রকার প্রিয় বস্তুর প্রতি অপ্রীতি জন্মে, বলিতে কি, আশ্রম-অনুসৃত বৈরাগ্যের সান্ত্বনায় অহঙ্কার, অভিমান, দ্বেষ দম্ভাদি ও অহমিকামিত্বের [illegible] শাসন সমূহ কিছুমাত্র থাকে না। অল্প সময়ের মধ্যে মানব-চরিত্র এমনই সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থিতি করে যে, তাহাকে কোন প্রকার প্রলোভন সংযমের নিমিত্ত বিন্দুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না। ঐরূপ চরিত্রবান সংযমীকে সহসা কেহ অযথা তিরস্কার করিলেও তিনি তাহা সময়োচিত পুরস্কার জ্ঞানে স্থির ধীর ভাবে হাস্য মুখে মধুর সম্ভাষণ দ্বারা তাহার মুখ চুম্বন বা আলিঙ্গন না করিলে প্রাণে শান্তি পান না। এমন কি, কেহ গাত্রে পূতিগন্ধময় অস্পৃশ্য বস্তু দিলেও যেন চন্দন কৌস্তুভ বর্ষণ তুল্য তাঁহার বোধ হয়। বাস্তবিকই সংযম সাধনের সহায় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, এই ত্রিবিধ গুণের পবিত্র সংস্পর্শেই সংযমীর প্রকৃতি কোনরূপ পার্থের পদার্থে বিকৃতি অবলম্বন করে না। উদার নৈতিক বলে তিনি অতি ধীর ভাবে দুঃখ ক্লেশ, শোক সন্তাপ প্রভৃতি যন্ত্রণা সহ্য করিতে সক্ষম হন। ফলতঃ যতক্ষণ ঐ সমূহ দুঃসহনীয় যাতনা ঈশ্বর-প্রেরিত কৃপার দান বলিয়া মনে না হয়, ততক্ষণ সংযম-শক্তি প্রাণে আসিতেই পারে না। শীতের শৈত্যে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, বসন্তের নবীন উল্লাস উদ্দীপনে স্থির থাকিয়া সংযম পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইলে, ইন্দ্রিয়গণ কিম্বা কামাদি রিপু সমূহ অথবা দুষ্প্রবৃত্তিদিগের কোনও শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না। ঐশী শক্তি মানব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দেব শক্তি প্রদান করিলে ক্ষমা আর কেমন করিয়া সময়পাত করিবে, অনতি-বিলম্বে সংযমীর হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি দিতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃই এই পবিত্র শক্তিময়ী ক্ষমার নিকট সকলেই পরাস্ত।

এখানে একটী দৃষ্টান্ত দেখাইলে, ভরসা করি, অপ্রীতির কারণ হইবে না। এই সামান্য কথাটিতেই ক্ষমার নির্ম্মল স্বভাব বুঝা যাইবে। বিশ্বক্ষেত্রে সকলি বিচিত্র! একজন দরিদ্র হঠাৎ বড় লোক হইলেন, চারিদিক্ হইতে অর্থাগম হইতে লাগিল। দরিদ্র ব্যক্তির সম্পদও বিড়ম্বনা—তাঁহার ক্রমেই ধনমত্ততা-জনিত দম্ভ অহঙ্কার প্রবল হইয়া উঠিল। আর একজন শিক্ষিত চরিত্রবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি অর্থাভাব বশতঃ অত্যন্ত ক্লেশে পড়িয়া ঐ বড় লোকটীর নিকট কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। অসুবিধা নিবন্ধন ঋণ শোধ দিতে বিলম্ব হইল, সুতরাং ধন-গর্ব্বিত বড় লোকটী একটু তীব্র ভাষায় বলিলেন, "তুমিত বড় বদ্‌লোক—কৈ টাকা গুলিত এ পর্য্যন্ত দিলে না!" ভদ্র লোকটী ঐ উগ্র ভাষায় ভীত ও লজ্জাবনত বদনে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আমার দৈনিক অভাবই ঘুচেনা, ইহাই একমাত্র বিলম্বের কারণ।" এইরূপ দুঃখসূচক কথা শুনিয়াও ধনমত্ত বাবুটীর দয়ার সঞ্চার হইল না। পুনর্ব্বার একটু বেশী রকমে বলিলেন, "তুমি যদি নিজের সম্মান রক্ষা করিতে চাও, তবে এখনই মায় সুদ বেবাক টাকা পরিশোধ কর, নতুবা তোমার সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে।" বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, দুই চারটী কথা বার্ত্তা চলিতে না চলিতেই দম্ভ-প্রিয় বাবু ক্রোধান্ধ হইয়া ভদ্র লোকটীর প্রতি গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে কয়টী চপটা-ঘাতও বাকি রাখিলেন না। হায়! ক্রোধের কি তীক্ষ্ণ প্রভাব! সামান্য কারণেও বিচলিত করিয়া ফেলে। কিন্তু ধৈর্য্যশীল ভদ্রটী এতই সরল যে, তাদৃশ কর্কশ কটূক্তিতে ও উভয় হস্তের আঘাতেও অধীর না হইয়া বরং বড় লোকটীকে বিবিধ জ্ঞান গর্ভ উপদেশ দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। এবং করজোড়ে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি দুঃখিত হইবেন না—আপনার আরক্ত চক্ষুর খরদৃষ্টিতে ও ক্রোধোচিত কার্য্যে বড়ই শান্তি অনুভব করিয়াছি। কেননা আমার অবস্থার অনুকূলে ক্ষমাই সান্ত্বনা দিয়াছে। আহা! ক্ষমতা শক্তি কি অমৃতময়ী—আমি তদ্দ্বারা সংযমের যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছি।"

এই ঘটনাটিতে কি বুঝিব না যে, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করিলে মনুষ্য-

ত্বের গূঢ় তত্ত্ব জানা যায় এবং সংযমের নির্ম্মল ছায়াস্পর্শে জগৎকে আপনার মনে করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। তবেই বলিতে পারা যায় যে, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ইহারা সম প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধুর আনুগত্যে সংযমের শক্তি যেন এতই দৃঢ় করে যে, সংযমী (অনলহক) মহর্ষি মনস্থুরের ন্যায় অস্ত্রাঘাতেও বিচলিত হন না। প্রত্যেক আঘাতে তাঁহার ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা শক্তি যেন ঐ নিষ্ঠুর ঘাতককে মধুর আকর্ষণে বিশ্বজনীন প্রেমে জড়িত করিবার জন্য তড়িদ্বেগে ছুটিতেছে। পশ্চাতে ক্ষমা, সংযমের সঙ্গে মিলিত হইয়া আততায়ীর উগ্র স্বভাবকেও অমৃত-তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেছে। তখন সে অনুতাপ-অগ্নিতে পূত হইয়া সাধুভাবে কেন আসিবে না? আহা! এমন যে পরহিতসাধিনী ক্ষমা—তাহারই সেবায় আমরা বঞ্চিত রহিয়াছি। একটু সম্মান-মর্য্যাদার ত্রুটী হইলে অমনি অধৈর্য্য-অসহিষ্ণুতার উত্তেজনায় ক্রোধভরে কত যে অনিষ্ট ঘটনার আয়োজন প্রবৃত্ত হই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, ঐরূপ অসার সম্মান-গৌরব যে অতি ঘৃণিত ও লোক-নিন্দিত, একবার স্মরণ করিলে লজ্জায় নতশির হইতে হয়—এটি কি কখন আমরা মনে করি? কেমন করিয়া বলিবে যে ক্ষমার আশ্রয়ে, জন-বিঘ্নকারিণী অসৎ চিন্তা হইতে মুক্তি পাইব, ইহা কি দুরাশার কথা নহে? সংসারে দেখিতেও পাওয়া যায়, প্রাচীন রীতির তিরোধানে লোক-চরিত্র আত্মম্ভরিতা দোষে এতই কলুষিত হইয়াছে যে, পুত্রও পিতাকে ক্ষমা করিতে সম্মত নহেন। স্বার্থের দাস হইয়া কষ্ট দিতেও ত্রুটি করে না। পিতৃ-ভক্তিত দূরের কথা—ঐশ্বর্য্যের সীমা কোথায়, তাহাই ভাবিয়া অস্থির। কিন্তু পিতৃ শক্তি পুত্র স্নেহের ভিতরে যে সতত অবস্থিতি করে, ইহা অনেকেই চিন্তা করেন না। পিতা কঠোর কষ্টের ভিতর দিয়াও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার, ইঙ্গিতে ক্ষমার সঙ্গে পুত্রের মঙ্গল কামনাই করেন। হায়! ঐশ্বর্য্য-পিপাসা কি ভয়ঙ্কর, কিছুতেই আশা নিবৃত্ত হয় না। আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিনা যে, সমুদ্র হইতে অসংখ্য অসংখ্য বিম্বের উৎপত্তি হইতেছে, আবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই সংসারেও প্রাণিসকল তদনুরূপ জন্মিতেছে, কালগ্রাসে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। রাজনগর শ্যামলক্ষেত্রে পরিণত হয়—ঐ দরিদ্রের জীর্ণকুটীরও সৌধ সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। এযে শ্মশানে প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিতে রাজা ও প্রজা এক অবস্থায় ভস্মসাৎ হইতেছেন, ধন-সম্পদ জল-স্রোতের ন্যায় কোথায় চলিয়া যাইতেছে। এ সকল দেখিয়াও কি স্বার্থ-সুখের যবনিকা পতন হইবে না? এই ভীষণ অভিনয় দর্শনেও কি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমার অমৃত ক্রোড় পরিত্যাগ করা বিধেয়? তাই

বলিতেছিলাম, অচ্যুতানন্দদায়িনী ক্ষমার শরণাপন্ন হইলে সংযম সাধনে বিঘ্ন সম্ভবে না। সৎশিক্ষা দ্বারা যতই উদার ভাব গ্রহণের অধিকার জন্মিবে, ততই প্রাণে প্রেমের তরঙ্গ বহিতে আরম্ভ করিবে এবং জন-সৌহৃদ্যতার বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে থাকিবে।

যাহা হউক, বাক্‌সংযত নীরব অবস্থাতে সংযম-চিন্তার সহজ উপায় থাকা সত্বেও উহাতে বিঘ্ন সম্ভাবনা আছে। আমি মৌনব্রত গ্রহণ করিলাম—অথচ আমার মন, ঐ নাট্যাভিনয়ের প্রাণমুগ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিল, কিম্বা কোন্ মন্ত্রণা বলে এক জন বড় লোক হইব, সেই চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলাম। এমত স্থলে সেই বাক্‌সংযম মৌনব্রত গ্রহণের মূল্য কি রহিল? আর আপনি যদি সংসারে স্ত্রীপুত্র-পরিবারবর্গের নানাবিধ তাড়নার মধ্যে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচলিত ভাবে সংযম-সাধনে পরাঙ্মুখ না হন—আপনার মন, মরজগতের অতীত স্থানে যাইবার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রিয় বস্তুতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে নিশ্চয়ই বলিব, আপনাতে সংযমের শিক্ষা বীরত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে,—আপনিই প্রকৃত সংযমী। কেননা, বিবিধ প্রলোভন-পূর্ণ সংসারের ভিতরে যিনি স্থিরচিত্তে দুঃখে সুখে, হর্ষ বিষাদে সংযম ব্রত পালন করেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। জ্ঞানী হইলেও হয় না, সিদ্ধ সাধক হইলেও হয় না, যদি তাঁহাদের একাগ্রতার দৃঢ় বন্ধন না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা সংযমের ফল কি দাঁড়াইল? জ্ঞানের গভীরতার ভিতরেও মত্ততার কারণ রহিয়াছে, বহু শাস্ত্রবিদ্ মনস্বীগণও জ্ঞান-গর্ব্বে অধীর হইয়া বিচার জ্ঞানের তীক্ষ্ণ ধারে জগতের মস্তক ছেদনেও পরাঙ্মুখ নহেন। সুতরাং অত্যুজ্জ্বল দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াও সংযম চিন্তার প্রকৃষ্ট পন্থা চাহিয়া দেখেন না। ইহাতে কি জানিব না যে, সর্ব্বগুন-বিশিষ্ট মহাতেজস্বী জ্ঞানী হইয়াও ঐ জ্ঞানোন্মত্ততা-জনিত চরিত্রকে সাত্বিক পথে আনিতে সক্ষম হন না? তিনি যদি তর্কসঞ্জাত বিচার জ্ঞানকে পরিত্যাগ করত অনাবৃত মুক্ত জ্ঞানের সঙ্গে দীনতার সম্বন্ধ রাখিতেন, ও শান্ত সমাহিত সখ্য ভাবে সকলের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, তবে জ্ঞানের মধুর ভাবের ভিতরে সংযম সাধনে সংযমের সৌন্দর্য্য এমনই ফুটিত যেন সুবর্ণে হীরক জড়িত হইয়া অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছে! বাস্তবিকই স্বাভাবিক জ্ঞানের আলোকে বিদ্যার অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব অভিমান এবং শাস্ত্রাভ্যাসের প্রখর তরঙ্গ সংযম না করিলে, বিদ্যা বিড়ম্বনা হইয়া ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত করে। তবেই দেখা যায় যে, জ্ঞানোন্মত্ততার আবর্ত্তেও মনঃশক্তি নানা

দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই প্রেমিক ভক্তগণ বিচার-জ্ঞানের মত্ততাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহাদের মস্তকের উপর দিয়া ভয়ানক তর্ক-ঝটিকা যতই প্রবল বেগে প্রেমের অমিয় আস্বাদন ভোগ করিতে থাকেন। আবার প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণেরও জ্ঞান যোগী অপেক্ষা বিপদাশঙ্কা অধিক! জ্ঞানের মত্ততায় অবশ্য অহঙ্কার, অভিমান, আত্ম-সম্মানকে আনিয়া দেয় সত্য, ফলতঃ প্রেমের মত্ততায় আরও অধিকতর ভয়ের কারণ রহিয়াছে। যদিও ভক্তগণ ভক্তি ও দীনতার মধুর আস্বাদনে প্রেম-পীযূষ-প্রবাহে নিমজ্জিত থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগকে মত্ততা প্রেমের অনিবার্য্য আঘাত বড় পাইতে হয়, কেননা, সেই প্রেমের উন্মাদিনী শক্তি প্রভাবে ভক্তগণ ধৈর্য্যচ্যুত হন।

বাস্তবিকই প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাসে স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু, মত্ততা, হুঙ্কার, বৈবর্ণ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি সাত্বিক ভাবের উত্তেজনা প্রবল হয়, বলিতে কি, সংযমের অভাবে ঐ সকল সাত্বিক ভাবের পরস্পর সমাবেশ সূত্রে ভক্তের প্রতি রোমকূপ হইতে রক্ত বহির্গত হওয়াতে, জীবনী শক্তি ক্ষয় হয় এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। পরিশেষে বৈবর্ণ ও ঘন কম্পনের অনিবার্য্য বেগে মূর্চ্ছা আসিয়া সংজ্ঞা বিনষ্ট করে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, এমন যে সাত্বিক অবস্থা—তাহাতেও ঐ সকল ভাবের কম্পনাতিশয্য বশতঃ ঈশ্বর দর্শনে ব্যাঘাত জন্মায়। প্রেম-পীযূষ-বারিধি চৈতন্য দেব বলিয়াছিলেন, "অশ্রু আমার প্রভু দর্শনের বিঘ্ন করিতেছে"—তাঁহার এই কথাটিতে স্পষ্টই জানা যায় যে, অসংযম-জনিত ভাবের প্রখর তরঙ্গে ঐরূপ ঘটে। আমি বলিতে পারি না যে, যদি তিনি সংযম দ্বারা ঐ অবিশ্রান্ত অশ্রুর মহাবেগ হৃদয়ের নিভৃত স্থানে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ঐরূপ আক্ষেপ করিতেন না। প্রেমিক ভক্তের সংযম ধারণা করা বড়ই কষ্টের কথা! কেননা, তাঁহারা ভাবের আবির্ভাবে এমন একটু সময় পান না যে, সংযম সাধনে প্রবৃত্ত হন! অনেক ভক্তকেও দেখা গিয়াছে, হরিনাম কীর্ত্তনে প্রেমের মহাতরঙ্গ মধ্যে মত্ততার আবেশে উন্মত্ত করিলে, পরিশেষে মূর্চ্ছায় অচেতন হইয়া পড়েন। তাঁহারা ঐ মহাস্রোতে ভাসিয়াও যদি মনকে ধৈর্য্য-রজ্জুর দ্বারা বাঁধিতে পারিতেন, তাহা হইলে কখনই মূর্চ্ছার দংশনে ভূতলে পতিত হইয়া অচেতন হইতেন না। বৈবর্ণ, হুঙ্কার, মত্ততাই মূর্চ্ছার প্রবল সহায়, সুতরাং উহাদের ছায়া স্পর্শ মাত্রই সংযম সাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ দর্শন-বিঘ্নকারিনী মূর্চ্ছারও দুইটী অবস্থা রহিয়াছে। একটী ঈশ্বর দর্শন বিরহে প্রেমের উচ্ছ্বাস অবস্থা—অপরটী

ভাবোন্মত্তায় সংজ্ঞাহীন অচেতন অবস্থা, কিন্তু এই দুইটী অবস্থাতেই সংযমের অভাবে বিঘ্ন সংঘটিত করে। কারণ ভাবের তরঙ্গাঘাতে ভক্তের সমস্ত শরীর কদম্ব-কুসুমের ন্যায় কণ্টকিত হইলেও তাঁহাকে অধৈর্য্য অবস্থায় ঐ মত্ততাই উন্মত্ত করিয়া ফেলে। সংযম-বল না থাকিলে, মনের দৃঢ়তা থাকেনা এবং স্বেদ, স্তম্ভ, বেপথু প্রভৃতির ঘন তাড়নায় অত্যন্ত আকুল হইতে হয়, সুতরাং ভোগ সুখের মধুর আস্বাদন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা চলিয়া যায়। বস্তুতঃ যখন উপর্য্যুক্ত ভাব সমূহ স্ব স্ব প্রকৃতির কার্য্য বিকাশ করে, তখন ধৈর্য্যেরও দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। কিরূপে "দর্শন" আশা পূর্ণ হইবে? তাহা যে ভাবের চাঞ্চল্য-জনিত নিরাশায় পরিণত হয়। কারণ মত্ততা, প্রমত্ত প্রেম, কখনই বিক্ষিপ্ত স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। প্রীতিও প্রখরা বিকট রূপে ভাবের অধীনে থাকিয়া ধৈর্য্যচ্যুত করিতে ক্ষান্ত হয় না। এ জন্য ভাব-মধুরতা যতই কেন আদরের বস্তু হউক না, যদি সংযমের সঙ্গে জড়িত না থাকে, তাহা হইলে উহার মধ্যে ঐ স্বেদ, কম্প, পুলকাদির শান্ত ভাব কেন আসিবে? "দর্শন" পথ বা উন্মুক্ত কেন হইবে? প্রাণে প্রেমের স্থির স্থিতিত্বেরই বা আশা কি? আমি বলিতে পারি না যে, ঐ সমূহ ভাব-তত্ত্ব প্রাণের প্রিয় বস্তু নহে। তবে উহাদের উল্লাস উচ্ছ্বাস, অতিশয় প্রবল—যোগীই হউক আর ভক্তই হউক, অথবা সাধকই হউক, যখন অন্তঃকরণে ভেদ করিয়া পুলক কম্পন প্রভৃতির প্রখর তরঙ্গ ছুটিতে থাকে, তখন কাহার সাধ্য যে ঐ মহাবেগ সহ্য করিতে পারে। তবে যাঁহারা নীরব ভোগ-প্রয়াসী, তাঁহারা ধৈর্য্য ধারণা বলে স্থির ও ধীর ভাবে প্রাণে গ্রহণ করতঃ অন্তরশ্রু দ্বারা উহাদের সেবার প্রীতি সম্ভোগ করেন। সুতরাং বাহ্যোন্মাদ উৎপীড়ন বিড়ম্বনাদি কিছুমাত্র থাকে না। সেই সময়েই ভাব শক্তির স্নিগ্ধ স্রোত ধীরে ধীরে বহিয়া বিষাদ-দগ্ধ অন্তঃকরণকে শীতল করে। এবং কম্পনের অমিয় কম্পন, মত্ততার ধৈর্য্যধারণ, পুলকের স্বর্গীয় আলোক দর্শন হয়। তখনই জানা যায় যে, উপরিউক্ত-ভাব-তত্ত্ব সমূহের বিশুদ্ধ অনুগত্যেই আবার "স্বরূপ" সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারা যায়। আহা! সংযম চিন্তা শক্তির প্রভাব কি প্রীতিপ্রদ! তদ্দ্বারা শত্রু, মিত্র ভাবে বাধ্য হয় এবং কামাদি রিপুগণ বশীভূত হইয়া যায়। আর কোন রূপ জুগুপ্সিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা হয় না, দেব-চরিত্র লাভ করিয়া বিশ্ব প্রাণীকে উদার প্রেমে আলিঙ্গন করিবার শক্তি জন্মে। এবং অনবরত হৃদয়-উৎস হইতে আনন্দলহরী বহিয়া যাওয়াতে দ্বেষ-দম্ভ-দলিত চির যাতনাগ্রস্ত মন, শান্তি রসে পরিতৃপ্ত হয়।

এই প্রাণিজগতে যাহারই উপর মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি পড়ে, সকলেই যেন আপনার প্রিয় সুহৃদ্ ও প্রীতির বস্তু হইয়া আনন্দে বিহ্বল করে,—আপন পর ভেদ ভাবের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। ভিতরে বাহিরে সেই অচ্যুতানন্দদায়িনী মহা-শক্তির নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। একটী শুষ্ক পাত্রেও প্রেমের চিত্র রেখার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনের ব্যত্যয় হয় না।

এখন সংযম শিক্ষার সহজ উপায় কি, তাহারই চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়। জগতে যে কোন সাধু-কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, প্রথমতঃ চরিত্রকে পবিত্র-সংস্কারে ধৌত করা আবশ্যক। আমার বাহ্য পবিত্রতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু মনের শঠতাপূর্ণ স্বার্থ-ভাব-জনিত অন্তরে অতি ঘৃণিত কার্য্যগুলি অনবরত ফুটিতেছে—ইহাতে কি জানিব যে, ঐ বাহ্য দৃষ্টান্ত ফলপ্রদ হইবে—তাহা যদি মনে করি, তবে নিশ্চয়ই আমি চরিত্রকে পাপ-পঙ্কে কলুষিত করিতেছি। যিনি বহির্ভাব অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত ও জটা-রুদ্রাক্ষধারী না হইয়া নীরবে শুভ বৃত্তি দ্বারা সাধু-কার্য্যের কর্ত্তব্যতা প্রাণে পোষণ করেন এবং অপরের অভাব-জনিত দুঃখ তাড়নায় ব্যথিত হইয়া সেই অভাব সম্পূরণের সদিচ্ছায় আজীবন পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, বস্তুতঃ তিনিই আপন প্রকৃতিকে পূত সংস্কারে পরিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারই প্রাণে সংযম-চিন্তার বর্ণপরিচয় আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে উচ্চ শিক্ষার অধিকার প্রাপ্ত হওতঃ অতি কোমল স্বভাবে জগতের সেবায় সাধু-চরিত্র লাভ করেন। এবং জীবন-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শরীর ও মনের অস্থায়িত্ব বা অনিত্যতার কারণ সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। অল্প সময়েই ক্ষণভঙ্গুর দৈহিক ভাবের পরিণাম ছবিটী প্রাণ-পটে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ঐ অন্তর্দৃষ্টিতে একটী বিচিত্র চিত্র দেখিতে পান। এই যে মাংস-তর্কাদি আবৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও হস্ত-পদাদি জড়িত শরীর সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে যে মেরুদণ্ড সজ্জিত দেহ-কঙ্কাল রহিয়াছে, ঐ কঙ্কালটী যদি সর্ব্বদা স্মরণ করেন, কিম্বা অন্তশ্চক্ষু উন্মেষিত করিয়া জ্ঞান-দর্শনে নিজ নিজ বিকৃত-অস্থি মুখখানি দৃষ্ট করেন, তবে মাংস-ত্বকাদি আবরণময় শরীরটী যে কি, তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষীভূত হইতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ তাহার উপর সতত দৃষ্টি পড়িলে, এমনই সুযোগ রহিয়াছে যে, অনতিবিলম্বেই আশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্য আসিয়া দেখা দিবেই দিবে। বিশেষতঃ ঐ সংসার শুভাকাঙ্ক্ষী বৈরাগ্যের যে সংযমের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, ইহা বুঝিতে পারিলে সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে, কি সাধন-রাজ্য, কি

যোগারূঢ় অবস্থাতেই হউক, ধৈর্য্য ধারণ করিতে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে না। ধীরতার সংস্পর্শে ও সংযমের সাহায্যে পবিত্র স্বভাব আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। বিবিধ প্রকার অশান্তি-যাতনার প্রখর বেগ মস্তকে ঠেলিয়া কুর্ম্মের ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট সহিষ্ণুতার শক্তি জাগিয়া উঠে। অশেষ উৎপীড়নেও ধৈর্য্যের স্থিরগতি অতি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। বাস্তবিকই ধৈর্য্যের অসাধারণ বলে সংযম-চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অপমান-নির্য্যতনকেও প্রিয় সঙ্গী করিয়া সাধনে বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। বরং আরও তাঁহাদের প্রাণে সরল উদার ভাব বৃদ্ধি পায়, এবং একতার মধুর হিল্লোলে সংসার-তাপ দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়। তখনই অভেদ ভক্তির বিশ্ব-মোহিনী শক্তিতে মনের অসার চিন্তা ও ভিত্তি-শূন্য কল্পনা সমূহ চলিয়া যায়।

দুঃখের কথা যে, এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও অসার প্রবৃত্তির তিরোধান হয় না। ঐ, ঐশ্বর্য্য-লোলুপা বাসনা-রাক্ষসীর কোপে অনেকেই অধীর হইয়া পড়িতেছেন। জীবন, যৌবন, ধন, সকলই কালের অতল উদরে প্রবেশ করিতেছে, তথাপি শত শত সম্রাট পরস্পর বিজিগীষা বশতঃ পৃথিবীকে রক্তস্রোতে স্নাত করিয়াও কিন্তু কৈ—কেহই ত মৃত্যুকে পরাজয় করিলেন না! তবে এত গর্ব্ব-গৌরবের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় কেন? তাই বলিতেছি, যখন শরীরের স্থায়িত্ব একটী নিঃশ্বাসের সময়টুক মধ্যেও থাকে না, তখন কি জানিব না যে, সম্পদ-সুখ-বাসনাদি ইন্দ্রজালের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী! মানুষ যতক্ষণ ঈদৃশ পরিণাম চিন্তার গূঢ় প্রদেশে উপনীত না হয়, ততক্ষণ তাহার স্বভাবের সঙ্কীর্ণতা দূর হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। কেননা, ব্রহ্মচর্য্য সাধন-বিহীন ব্যক্তির সাধুপথ অবলম্বন করা অসম্ভব। যাঁহার ঐ ব্রত-সিদ্ধাবস্থায় সংসারে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারাই অনাসক্ত বৈরাগ্যের আশ্রয়ে ভৌতিক তত্ত্বের পরিণাম-অস্তিত্ব বুঝিয়া, জগতের স্পৃহনীয় পদার্থের ঘোর প্রলোভনের মধ্যেও সংযম দ্বারা পবিত্রতার মহাবেগে উর্দ্ধে চলিয়া যান। হায়! এমন যে সংযম-সাধনের সহজ শিক্ষা—তদ্বিষয় অনেকেই একটু চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, বিষয়-লিপ্সার আতিশয্যে কোথায় দাঁড়াইতেছেন! ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বলিতে পারা যায় যে, জগতের সকল স্থানেই নানাপ্রকার মতের বিরোধ-বিভীষিকার প্রাদুর্ভাব ভিন্ন অন্য কিছু দেখা যায় না। অতি দীন কাঙ্গাল যদু বলিতেছেন, পৃথিবীর মধ্যে নীচ আমি—ঐশ্বর্য্যশালী মধু বলিতেছেন, সমগ্র পৃথিবীই আমার নীচে। এই উভয় ব্যক্তির বিভিন্ন ইচ্ছার ভিতরে আমরা কি বলিতে পারিব না

যে, যত্নের মত জীবন পবিত্র করিতে না পারিলে, এবং প্রাণে, দীনতার বল না রাখিলে, সংযম শিক্ষা হয় না। কিন্তু মধুর জীবনাদর্শে চিত্ত শুদ্ধি ত দূরের কথা—ধরাকে শরা ভাবিয়া অহঙ্কারের বশে যে অধঃপতিত হইতে হয়, এটি কি আমরা হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকি? নিশ্চয়ই বলিব যে, সংসার-সুহৃৎ আশ্রম অনাসক্ত বৈরাগ্যের মহাতেজে সম্মান-অভিমানকে পোড়াইয়া না দিলে, জীবনের উন্নতির আশা করা অসম্ভব। অত্যুক্তির কথা নহে, নির্ম্মলা চিন্তার কোনও স্থানে যদি সর্ষপকণা সদৃশও পার্থিব মোহময় বস্তুর ছায়া পড়ে, তাহা হইলে কখনই ঐ শুভ চিন্তা ঊর্দ্ধ প্রদেশে অগ্রসর হইতে পারিবে না, নিম্ন স্তরে অতি চঞ্চল ভাব গ্রহণ করিবে। ক্রমেই ভ্রান্তি-জালে জড়িত হইলে তাহার আর প্রশান্ত গতি থাকিবে না এবং ঐ চিন্তা-শক্তিই আবার নিরাশার নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে লইয়া যাইবে। তখন অন্তশ্চক্ষুতে বেশ দেখা যাইবে যে, ঐ মোহময়ী ছায়াই বিস্তৃত রূপে মহচ্চিন্তাকে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। সুতরাং নির্ম্মলা চিন্তার বিপথগামিনী অবস্থায় যে মানব-চিত্তে বিকল্প ভাবের তরঙ্গ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, এটিত অতি নিশ্চিত সত্য! অথচ এই সকল ভাবী আশঙ্কা জানিয়া শুনিয়াও যে ঐশ্বর্য্য স্পৃহার অনিবার্য্য আবেগ মত্ততারই বৃদ্ধি কামনা করা—ইহাকেই কি উচিত মনে করিব?—কখনই না। প্রাণি সমূহের শ্রেণী বিভাগে মানবগণ কোন কোন অংশে উন্নতি-শক্তি সম্পন্ন—কারণ, শুভ, অশুভ, মিষ্ট, তিক্ত, সুগন্ধ দুর্গন্ধ অনুভব করিতে সক্ষম। সেই মানবই যদি আত্মম্ভরিতাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সেবানুরাগিণী সাধ্বী আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সংযম প্রয়াসী না হয়, তবে পশুতে আর ঐ মানবে বিভিন্নতা কি? অতএব সকলেই সমপ্রাণে যদি নির্ম্মলা চিন্তার বক্ষে ঐ মোহময় বস্তুর ছায়াটী ঘুচাইবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহাই যে সংযম সাধনের বীরত্ব—এ কথা কেনই বা প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইবে না? চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ, ইহারাই বা কেন আশ্বাস প্রদান করিবে না। ইহা অতি নিশ্চিত যে, মানবীয় শক্তি চলিয়া গেলে, দেব শক্তি প্রভাবে মানব-জীবন পবিত্র হয়, তখন পৃথিবীর কোনও বস্তুতে স্পৃহা থাকে না। কিন্তু এমন একটী জুড়াইবার স্থান আছে যে, সকল সুখ-নিদান পুত্র, কলত্র, ধন, মান, যশঃ-খ্যাতি সমস্তই ধূলিকণার ন্যায় জ্ঞান করিয়া নির্জ্জনে নীরব চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হয়। সিদ্ধ সাধকগণ তাহারই জন্য পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা উন্মত্ত—সেটি কি?—উহাই জগতাতীত অখণ্ড জ্যোতিঃ মণ্ডল। তাহারই ভিতরে অবিচ্ছিন্ন স্থিতি সঙ্কল্পে সংযম চিন্তার

প্রয়োজন! এবং বিষয়ানুরক্তি হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা বৈরাগ্যোচিত নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য ঋষিরা সিদ্ধাবস্থায় শুভ ফল লাভ করিয়াও সংযম সাধনে বিরত ছিলেন না। তাঁহারা সংসার ক্ষেত্রে বা সাধন ক্ষেত্রে প্রাণে সমশক্তির স্থায়িত্ব কল্পে উদাসীন রহিতেন না। বলিতে কি, যোগী ভক্ত, সাধক ইঁহাদিগের মধ্যেও যাঁহারা আনন্দময় কোষে নিয়ত নিমজ্জিত রহিতেন, তাঁহারাও ঐ ভূমানন্দের আবেগ উচ্ছ্বাস সংবরণে অসমর্থ হইয়া ভোগ বিরত ভাবে সংযমের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। নতুবা সেই মহাতৃপ্তির বেগ এতই বৃদ্ধি পাইত যে, সহ্য করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। এই কারণে জ্ঞানীরা শুভাশুভ উভয় দিকেই সংযমের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন না। অতঃপর জগতের নর-নারী সকলেরই উচিত যে, দেব-ভাবের ছায়া স্পর্শ পূর্ব্বক কর্ম্ম ভূমির উপর দাঁড়াইয়া সংযমের উজ্জ্বল পরীক্ষায় অনাসক্তি দ্বারা সমস্ত কার্য্যের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেন। সংযমই সর্ব্বপ্রকার সাধনের পথ প্রদর্শক। তাই বলিতে ছিলাম যে, সকলেরই সংযমী হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর আলস্যের ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকা বিধেয় নহে।

ষষ্ঠ উল্লাস।

ত্যাগ বা সন্ন্যাস।

ত্যাগ 'ত্যজ' ধাতুতে পরিপুষ্ট—উহার প্রকৃতিই বর্জ্জন অথবা পরিহার। এখন দেখা আবশ্যক যে, ত্যাগের মৌলিক তত্ত্বটী কি?—বস্তুতঃ ত্যাগেরও দুইটী দিক্ আছে। একটী বাসনা জড়িত স্থূল বস্তু, আর একটী বৈরাগ্য তাড়িত দ্বেষ দম্ভাদি অশুভ বৃত্তি ইত্যাদি। বস্তু সঞ্জাত ত্যাগ, জগতের স্পৃহনীয় ধনৈশ্বর্য্যাদির ভোগ ইচ্ছা। বৈরাগ্য শাসনে ত্যাগ, ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস নিবন্ধন ও তাহাদের বিকারময় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি! এ জন্য উভয় দিকেরই ত্যাগের উপায় সম্বন্ধে সফল প্রযত্ন চিন্তা অতীব কর্ত্তব্য। মানুষ প্রথমতঃ যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রিয় ভোগ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বর্জ্জনীয় বস্তু সমস্ত গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর বিলাস-মুগ্ধ বিষয়ের ভিতরেই তৃপ্তির নিদান বুঝিয়া থাকে। কিন্তু সেই যৌবনাবস্থা চলিয়া গেলে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়াও ঐ বিলাস সুখ-বাসনাদি ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং শরীর, মন, বুদ্ধি ক্রমেই অসার হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা-জালে জড়িত থাকিয়া বরং শুভ তত্ত্বগুলিকেই পরিত্যাগ করে। সকল প্রকার অনিষ্টপ্রদ কার্য্য গুলি প্রাণে সঞ্চিত রাখিতে সঙ্কুচিত হয় না। সংসারে ঐরূপ প্রকৃতি গত মনুষ্যই এখন অধিক দৃষ্ট হয়। সকল দেশে, সকল সম্প্রদায়ের মানব-শ্রেণীর মধ্যে অল্প লোকেরই অশুভ-বর্জ্জন দ্বারা দেব-চরিত্র গ্রহণের অনুরাগ রহিয়াছে বটে কিন্তু আবার অনেকেরই ত্যাগ ত দূরের কথা স্বার্থের অতল উদর পূর্ণ করিবার জন্য সময় সঙ্কীর্ণ। এইরূপ মানব-চরিত্রের অবস্থা দেখিলে কি প্রাণে যাতনা হয় না? এমন পাষাণ হৃদয় কার যে, তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না? আহা, সম্মুখে শত শত জ্বলন্ত জীবনের আদর্শ রাখিয়াও কি পশু চরিত্রে দিনাতিবাহিত করা উচিত!

আর্য্য ঋষিদিগের সময়ে তাঁহারা ধর্ম্ম সাধনের সুবিধা নিবন্ধন চারিটী আশ্রম বিভাগ করিয়াছিলেন। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় বানপ্রস্থ, চতুর্থ সন্ন্যাস বা ভিক্ষুকাশ্রম। এই চারিটী আশ্রম নির্দ্দিষ্ট স্থলে এখন তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। ইহার মূলে প্রবেশ করিলে জানা যায়, প্রত্যেক আশ্রমেরই পরিণামে "ত্যাগ" রাখিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম—

ইহার শেষ বানপ্রস্থ—আবার সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষামাত্র সম্বল। সুতরাং এইরূপ ত্যাগের ব্যবস্থা স্থলেও ইহা বর্ত্তমানে হিতকর বলিয়া যেন মনে হয় না। কেননা, পরিবর্ত্তন শীল জগতে মানব জীবনের স্থায়িত্ব অতি অল্প—সময় কৈ যে, ঐ ঋষি-নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যায়! তজ্জন্যই একটু গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয় যে, উপর্য্যুক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ই পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত আছে! সর্ব্ব প্রথমেইত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা সময়ে ভোগ বাসনাদি ত্যাগ—তৎপর গার্হস্থ্যেও বিবিধ প্রলোভন ও স্পৃহনীয় বস্তুতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা সংসারে আসঙ্গলিপ্সা ও অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি বীতরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক যদি ঈশ্বর-চিন্তার জীবন্ত শক্তি গ্রহণ করা যায় তবে কি বানপ্রস্থের সাধন হয় না? কোন প্রকার অযথা ইন্দ্রিয় পরিচালনের কার্য্য না করিয়া নিরাসক্ত ভাবে ঈশ্বরের প্রজা বৃদ্ধির গূঢ় ধর্ম্ম যাহাতে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিত্বে কলুষিত না হয়, ঈদৃশ মুক্ত স্বভাবে কি সন্ন্যাস তত্ত্বের শিক্ষা বুঝিব না? পুত্র, কলত্র, বন্ধু বান্ধবগণের পার্থিব অনুরাগের আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া একমাত্র পরোপকার মহাব্রত সাধনে জীবন ঢালিয়া দিলে, তার কি স্বার্থ ত্যাগ হইবে না? উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যু হইলে তজ্জনিত শোকে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যিনি সেবা ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি কি সংসার পাশ মুক্ত ত্যাগী নহেন? নিশ্চয়ই বলিব, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভিতরেই বানপ্রস্থাদি আশ্রমত্রয় সম্মিলিত রহিয়াছে। ক্ষিপ্ত বা বিরক্ত বৈরাগ্যের উৎপীড়নে নির্জ্জন গিরি, গুহায় অবস্থিতি করিলেই কি ত্যাগ হইল? মনের বনে কামাদি রিপুগণ সতত বিচরণ করিতেছে, শাল, তাল, হিন্তাল সমাকীর্ণ বাহ্যবনে গিয়া ত্যাগী হইবে কিরূপে? আত্মাভিমান, বিষয় লালসা, অনিত্য ভোগপ্রিয়তা প্রভৃতির প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত না হইলে আশ্রম বিভাগেও শান্তি সম্ভবে না। আসক্তির তীব্র কটাক্ষে পড়িয়া স্বার্থসাধনের জন্য মত্ত থাকিলে, ত্যাগের আশা কোথায়? এই কারণে জনপূর্ণ সংসার মধ্যে ক্ষিপ্ত ও বিরক্ত বৈরাগ্যের শক্তি অতি দুর্ব্বল। তন্নিমিত্তই আত্মম্ভরিতাদি আসক্তির দমন সাধনে অনাসক্ত বৈরাগ্যের প্রয়োজন। নিরাসক্ত জীবন ব্যতীত ঐ অনাসক্ত বৈরাগ্যের দেখা, অতীব দুর্ল্লভ।

অতএব গৃহস্থাশ্রম সাধন স্থলে ঐ অনাসক্ত বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। কারণ, যখন গার্হস্থ্যাশ্রমেই চারিটী পন্থার ধর্ম্ম সুন্দর মত সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন এই বহু জনপদ সমাকীর্ণ সংসারই নির্জ্জন নীরব-চিন্তার প্রকৃষ্ট স্থান ও ত্যাগোপযোগী বীরত্বের শিক্ষা ক্ষেত্র! পর্ব্বত, বন, মরু প্রান্তর

সর্ব্বত্রই পশু পক্ষী সরীসৃপাদি প্রাণী পূর্ণ সংসার—কোন স্থানই নিরাপদ নহে। নির্ম্মল শুদ্ধচিত্তে ইহার ভিতরেই পদ্ম পত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। যাঁহারা বিরক্ত বৈরাগ্যের শাসনে ঈশ্বরের সংসার বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারাই কনক কামিনীকে বিষসদৃশ ভাবিয়া দাম্পত্য ধর্ম্ম সাধনে উদাসীন! সকলেই কি হিমালয়ের উত্তর সীমায় গিরি গহ্বরে নিমীলিত নয়নে বসিয়া রহিবেন? বিধাতার বিধানের উদ্দেশ্য কি? যথোপযুক্ত ধনৈশ্বর্য্য,—প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে ঈশ্বরের ভাণ্ডার স্বরূপ সজ্জিত থাকিবে। এবং সেই ধন সাধু সঙ্কল্প দ্বারা সৎকার্য্যে ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বরের প্রজা বৃদ্ধির বিধান রক্ষা নিবন্ধন সাধ্বী স্ত্রীর সহিত ভোগেচ্ছা বিরত সাত্বিক মিলনে পবিত্র প্রেম-যোগে পুত্র, নির্ম্মলা প্রীতিযোগে কন্যা জন্মিলে ঐ স্ত্রীতে-স্বামীতে এবং পুত্র কন্যাতে একই চিৎতরঙ্গ বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রেমের বিধানে এটাও জানিব যে, এই সংসারই ত অনল, জল, সুধা বিষ, হর্ষ, বিষাদ, শুভ, অশুভ, শত্রু, মিত্র, জ্ঞানী, মূর্খ, অন্ধকার, আলো এ সকলকে বক্ষে লইয়া বিবিধ বৈচিত্র্য ভাব বিকাশ করিতেছে। এবং প্রকৃতি পুঞ্জের সমবায় শক্তির কোনরূপ অসামঞ্জস্য জনিত যে কোন বিপদ সংঘটিত হয়, তাহারও মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়ার শক্তি দিতেছে। ধৈর্য্যশীল মহাপুরুষগণ ইহার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া সংসারকে অগ্নিকল্প চক্ষে দেখেন নাই। যাহা হউক, সংসার বিচিত্র ক্ষেত্র হইলেও সাধনের বল বৃদ্ধি করে। অবশ্য স্বার্থ সঞ্জাত আসক্তি সমূহকে সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জন করা প্রার্থনীয় কিন্তু ইহার একমাত্র সাধন মনের প্রতিই নির্ভর করে। কেননা তাহার বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিই ভয়াবহ। বস্তুতঃই কৌপীনধারী সন্ন্যাসী যদি ঐ আসক্তির বশে লোভনীয় পদার্থেই আকৃষ্ট থাকেন, তবে কন্দ, মূল, ফলাশী বনবাসী হইয়াই বা ফল কি দাঁড়াইল? কোন রূপ অভাব জন্য অর্থ লালসায় লোকালয়ের সাহায্য না লইলে, কষ্ট বোধ হয়; এরূপ স্থলে সংসার ও বন উভয়ই তাঁহার পক্ষে একই ভাবে পরিণত? আবার এদিকে আশ্রম অনাসক্ত সংসারীকেও দেখুন, অতুল বিভবশালী নির্ম্মল প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি যদি গৃহস্থাশ্রমে অট্টালিকায় স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও অনাসক্ত বৈরাগ্যের আশ্রয়ে ঐ বুভুক্ষিত দরিদ্রটিকে নানা উপাদেয় দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া নিজে নির্লোভ বশতঃ অপরিসীম সন্তোষ সম্ভোগ করেন, এরূপ পবিত্র প্রকৃতির সাধু পুরুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাসনার ত্যাগ কি বলিব না? গাত্রে বহু মূল্যের বস্ত্র খানি রহিয়াছে, পথি মধ্যে ঐ

শীত বাত কম্পিত নিরাশ্রয় দরিদ্রটীর কাতর মুখ দেখিয়া তখনই তাহার কষ্ট নিবারণ জন্য তাহাকে দিলেন, তিনি কি আশ্রম অনাসক্ত ত্যাগী নহেন? প্রচুর ধন-সম্পদের উপর স্থিতি করিয়াও যিনি দরিদ্রের নিকট দয়া শিক্ষার নিমিত্ত আকুল হন, তিনিই ত্যাগের গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াছেন। এই পৃথিবী বিকার ভারাক্রান্ত হইলেও উহার ভিতরে প্রবেশ করিলে, নির্ব্বিকার তত্ত্বেরও সম্ভবত শিক্ষা পাওয়া যায়। মনের নির্লিপ্ত চিন্তাটী যদি প্রতিকূল পদার্থের উপর পড়ে, তাহা হইলেও ঐ বিরুদ্ধ বস্তু সমুদয়ই আবার অনুকূল পথে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সাহায্য করে। মানুষ যাহাকে যন্ত্রণাপ্রদ অহিতকর বলিয়া বর্জ্জন করিতে চায়, তাহারই দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয়। তীব্র কালকূট ভক্ষণে প্রাণ বিনাশ হয় সত্য, ফলতঃ ঐ কালকূটই ঔষধ রূপে ঘোর বিকারগ্রস্থ রোগীকে রক্ষা করে। যে অগ্নি গ্রাম নগর অনায়াসে ভস্মসাৎ করিতে পারে, সেই অগ্নিই দৈনিক কার্য্য রন্ধনাদির ভিতরে থাকিয়া নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তত করিয়া দেয় এবং শিল্প দ্রব্যাদির গঠন সাহায্য করে। এক সময় যিনি স্বার্থ মুগ্ধ হইয়া অনিষ্ট করিতে ক্রটী করেন নাই, সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনিই আবার নিঃস্বার্থ ভাবে ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। তবেই দেখা যায়, যাহা দ্বারা ঘোরতর অনিষ্টোৎপাদিত হয়, তাহারই দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই বিশ্ব-বৈচিত্র্য রহস্য! এই জনপূর্ণ সংসারেই সুধিগণ সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ কামনায় নিরাসক্ত ভাবে কনক-কামিনীর সহিত মিলিত থাকিয়াও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হন না।

যাহা হউক, নিরাশার কথা নহে যে, বিশ্ব-জড়িত বাসনা ও আসক্তির বিকার-অবস্থার পরির্ত্তন হয় না! অমঙ্গলের ভিতরে মঙ্গল ঘটনা সমূহের পরিস্ফুরণ হওয়া অসম্ভব নয়। বিষয়াসক্ত চিত্ত শুভ চিন্তার স্নিগ্ধ তরঙ্গে নিমজ্জিত হইলে ঐ বাসনা ও আসক্তি—উহারাই আবার বিশুদ্ধ ভাব আনিয়া জগতের আপাত মুগ্ধ বিচিত্র চিত্র হইতে উদ্ধার করে এবং বিষয় লোলুপ হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির উচ্চ মস্তক অবনত করিয়া দেয়, সুতরাং শত্রুরও শুভ অনুষ্ঠানে মানুষ মহত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারে। তবেই দেখুন, ত্যাগের প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ স্বার্থাভিলাষিণী আসক্তি-বাসনা ইহারা ঈশ্বর মুখিনী চিন্তার ভিতরে প্রবেশ না করে। বাস্তবিক উহাদিগের প্রতি সম্যক প্রকার প্রজ্ঞা চক্ষুর দৃষ্টি রাখা ও মনঃশক্তির পরিচালনা করা নিতান্ত আবশ্যক। শুভাশুভ, যাহাই কেন হউক না, উভয়দিকেই মনের গতিশক্তি আছে। সে, আসক্তি ও বাসনাদির অসার

তৃপ্তির মধ্যেও মানুষকে ডুবাইতে পারে বটে কিন্তু ঐ মন যদি সত্য পথ হইতে বিচলিত না হয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, মোহময় বস্তুর প্রলোভন জালে বদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দেয়। আহা! যে চিন্তা চক্রবৎ সংসার আবর্ত্তে প্রতি মুহূর্ত্ত ঘুরাইতেছে, সেই চিন্তাই সাধন ব্যাহন্তা অহিতাচারী শত্রু সমূহকে বশীভূত করিয়া উচ্চ সোপানে উন্নীত করিতে ক্রটী করে না ও ত্যাগের মহামন্ত্র শিক্ষা দিতেও ছাড়ে না। নিশ্চেষ্টতার সহবাসে মানবের যতই কেন পার্থিব সুখের দিকে দৃষ্টি পড়ুক না, ঐ পূত চিন্তা প্রবাহ অসীম জ্যোতিঃ সিন্ধু মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য এতই প্রখর বেগে চলিতে থাকিবে যে, পলক পাতের সময় টুকও ক্ষান্ত থাকিবে না। তখনই ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকা সমূহ অন্তরাকাশ হইতে দূরীকৃত হইয়া সত্যের অখণ্ড আলোক প্রত্যক্ষীভূত হইবে। এবং ঐ মোহ জাল বদ্ধ নিশ্চেষ্ট মানবগণের অরুচি, অতৃপ্তি, অনিচ্ছা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমুদয় সর্প শল্কবৎ সরিয়া পড়িবে ও আশাপিপাসা ক্রমেই বাড়িতে আরম্ভ করিবে, কিছুতেই বাধা মানিবে না, ত্যাগের বিষয় গুলি স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইতে থাকিবে। অন্নময় হইতে আনন্দময় মহাকোষ পর্য্যন্ত ঐ নির্ম্মলা চিন্তার গতি দীপশিখার ন্যায় অতি স্থির ও সম উর্দ্ধভাবে চলিতে থাকিবে। তখন জগতের সহিত কোন সম্পর্ক রহিবে না। এবং অব্যয় অনাদি নিত্য শক্তির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে কোন সংশয় রহিবে না। কিন্তু এখানে একটী কথা উঠিতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী মহা চৈতন্যের তরঙ্গক্ষেত্র এই প্রাণিপূর্ণ জগৎ—বিঘ্নপ্রদ ও যন্ত্রণাদায়ক হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়, জগতের পরমাণু অবিধ্বংস সত্বেও মানবাদি ও সকল প্রকার শরীর ভাবের ত অভাব আছে? বিশেষতঃ এই জড় জগৎ সসীমাবস্থায় অসীম সত্ত্বার মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতেছে। এ জন্য তৎপ্রতি আত্ম নির্ভর করা যায় না। কেননা, বাহ্যবস্তু জাত কলুষিত চিন্তাগুলি ত্যাগের কারণীভূত—সন্দেহ নাই। তবে অচিরস্থায়ী উদ্ভিজ্জাদি দ্বারা কিছু শিক্ষা সম্ভব হইলেও তাহা বিকারে আচ্ছন্ন! সুতরাং জগত তত্ত্বের প্রত্যেক বস্তুর উপর আসক্তির আবরণ সত্বে স্থূলের আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত নহে—ঈদৃশাবস্থায় উহা অবশ্যই ত্যাগোপযোগী। অতএব অন্তর্জগতে দর্শন-পথ পরিষ্কার দেখিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া উচিত! আর একটী কথা এই যে, যদিও জাগতিক তত্ত্বের পরমাণু সমষ্টি শরীর—উহা যন্ত্র রূপে চৈতন্যের তরঙ্গ-ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু তাহারও অস্তিত্ব ক্ষণ ভঙ্গুর! এমত স্থলে, স্থূলে অস্পর্শ চৈতন্য অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইলে, ঐ শরীর-যন্ত্রটিকে কি আসক্তির বস্তু বলা

যায় না? সত্য সত্যই ত সে,—মৃত্যুর কবলে পড়িয়া আপনা হইতেই ত্যাগ করে। তবে জগৎ কোন অংশে শুভ, কোন অংশে অশুভ, একথা অবশ্য প্রযুজ্য। কারণ, ঐশী শক্তির মধ্যে বিশ্ব বৈচিত্র্য উহাও একটী দৃশ্য রহস্য! জগৎ অসীম চিন্ময় সত্তার ভিতরে অবস্থিত করিয়াও স্থূল ও সীমায় আবদ্ধ! বিশেষতঃ উহার পরমাণুর ভাবের বিকাশ উদ্ভিজ্জ ও জান্তবাদির শরীরেরও বিনাশ আছে। এই কারণে বিশ্বের বৈচিত্র্য দৃশ্য রহস্য বলিতে বিস্ময়ের কথা নহে। এই বিশ্ব-সঞ্জাত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব শরীরে আত্মার তরঙ্গ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুইটী ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু উভয় দেহীরই তিরোধান বিধান জনিত চৈতন্যের চিরস্থিতি সম্ভব পর নহে সুতরাং এমন একটী স্থূল চক্ষের অতীত নিত্য স্থিতির স্থান আছে যে, যোগীরা তাহাতে সমাধি যোগে চির শান্তি লাভ করেন। সেই স্থানে যাইবার ঐ অন্তর্জগতই প্রশস্ত পথ স্বরূপ। অতঃপর বহির্জগতের অহিতকর বিকৃত বস্তু সমূহ যুগপৎ বর্জ্জন করাই-বিধেয়। কারণ ঐ সুনির্ম্মলা চিন্তা বিকার-কলুষিত হইলে পরিমিত স্থূল ছায়া ভেদ করিয়া উর্দ্ধে অগ্রসর হইতে পারে না, তজ্জন্য প্রতি মূহূর্ত্তে অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টি এমনি রাখিতে হইবে যে, কোনরূপ কল্পনার আঘাতে উহার গতি ভঙ্গ না নয়।

বিশ্বক্ষেত্রে আমরা একদিকে যথেষ্ট শুভ দেখিতে পাই। অস্থায়ী অনিত্যতার ভিতরেও অব্যয় অনন্ত শক্তির তরঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রাণিপূর্ণ জগচ্চিত্রে কি আমরা দেখিতে পাই না যে, ভৌতিক তত্ত্বময় জলবিম্ববৎ শরীর, ক্ষণ ভঙ্গুর সত্ত্বেও উহাই যন্ত্ররূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রবাহ বহন করিতেছে। এবং চৈতন্যের জ্বলন্ত সত্ত্বা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইতেছে। আবার মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শত শত দৈহিক লীলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—শত শত উৎপন্ন হইয়া ঐ প্রাণি জগতের অভাব স্থানটী পূরণ করিয়াও দিতেছে। অথচ আমরা দেখিলাম, দেহীমাত্রই ধ্বংসশীল! কিন্তু হরণ পূরণে প্রাণীলীলার বিরাম নাই। ইহাই জগতের শুভ—উহার বিকার ভাবটিই অশুভ। যাহা হউক, আমরা যদি ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর শরীরের স্থিতি কালটুক মধ্যেও চরিত্রকে পবিত্রতার সঙ্গে মিশাইয়া দেহ স্থিত আত্মার অস্পর্শ তরঙ্গ রূপের স্ফূর্ত্তিমাত্রও প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে তৎসময় টুকুও অন্ধকার মগ্ন প্রকৃতিকে উজ্জ্বল চিন্তা প্রদেশে লইয়া যাইতে পারি। তাহা হইলে অখণ্ড জ্যোতিঃ মণ্ডলের গমন পথ বিরোধী অসার ভোগ ইচ্ছার ঘন উত্তেজনা কি ত্যাগ করিতে পারি না? নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে সত্য নিষ্ঠ ভাবে মনের একাগ্রতা জন্মিলে কিছুতেই বিঘ্নপ্রদ চিন্তা দ্বারা

আকুল হইতে হয় না। বলিতে কি, আধ্যাত্মিক সাধন-সহায় বিশুদ্ধ তত্ত্বেও কোনরূপ বিকার ঘটিলে তাহাও পরিত্যাগ যোগ্য। জ্ঞান যদি অহঙ্কার যুক্ত হয়, কর্ম্ম যদি স্বার্থ জড়িত থাকে, ভক্তি যদি কৈতব কলঙ্কে টলিয়া পড়ে, তবে কি ঐ জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে?—নিশ্চয়ই তৎপ্রতি নিস্পৃহতা প্রদর্শন করিতে হইবে। স্থূল কি অস্থূল যাই কেন হউক না, উহার বিকার কলুষিত ভাবটুকু যে ত্যাগের বস্তু, তাহা কে অস্বীকার করিবে? জ্ঞানই হউক, আর কর্ম্ম ও ভক্তিই হউক, কিম্বা যে কোন শুভ তত্ত্বই হউক অসার কল্পনায় কলঙ্কিত হইলে, অবশ্যই উহা পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তই চৈতন্য দেব অহঙ্কার যুক্ত বিচার জ্ঞান, ব্যবহারিক অসার কর্ম্ম, প্রখরা কৈতব ভক্তিকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই। তিনি অনাবৃত মুক্ত জ্ঞানে, অহেতুকী ভক্তির সহিত মধুর প্রেমের আস্বাদন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম অকৈতব নির্ম্মলা ভক্তিরই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বহির্জগতের একমাত্র লোভনীয় বস্তু সমূহের আকাঙ্ক্ষা গেলেই যে ত্যাগ বা সন্ন্যাস সাধন হইল তাহা নহে। অন্তর্জগতেও বিপদাশঙ্কা যথেষ্ট আছে। আমি নানা উপাদেয় ভোক্ষ্য বস্তুর স্থলে গলিত পত্রাহারী হইলাম, দিব্য পরিচ্ছদে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক গৈরিক রুদ্রাক্ষধারী সন্ন্যাসী সাজিলাম কিন্তু আমার অন্তর-রাজ্যে তীব্র বৈরাগ্য রাজ-ভূষণে ভূষিত হইয়া ত্রিতল গৃহের কল্পনা করিতেছে, অন্তরিন্দ্রিয়গণ নিয়ত বিভব সুখ লালসায় অত্যন্ত আকুল হইতেছে, ভগবদ্‌রুচি অসার আমোদ-প্রমোদ বা নাট্যশালায় অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত ঘন ঘন মধুর আশ্বাসে অধীর করিয়া তুলিতেছে। এই সকলই যদি অন্তরে নিয়তকাল জাগ্রত থাকে, তাহা হইলে গৈরিকধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া ফল কি হইল? গলিত পত্র ভক্ষণেই বা ত্যাগের বীরত্ব কোথায় রহিল? আর আপনার যদি নানা বিষয় কার্য্যের উপরেও হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে কোনও স্থানে অসার কামনাদি বিন্দুমাত্রও স্পর্শ না করে, এমত স্থলে আপনাকে ত্যাগী বা সন্ন্যাসী কেন বলিব না! তবেই দেখা যাইতেছেযে, অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তি যাঁহার নির্ম্মল স্বভাবে এক হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ত্যাগসিদ্ধ—ইহা অতি নিশ্চিত।

বস্তুতঃই অন্তরে বাহির সমসূত্রে মন গাঁথা না থাকিলে দেব-চরিত্র লাভ করা অতি দুর্ল্লভ! এই মর জগতের প্রাণি-লীলার পরিণাম প্রতি মূহূর্ত্ত প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতেও অনেকেই মোহ বশতঃ স্বার্থ জ্ঞানে বিজড়িত। এমন কি, অশীতিবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধদিগকেও স্বার্থের অনুরোধে কপট প্রবঞ্চনা, পরশ্রী

প্রভৃতি কুটিল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখা যায়। কিছুতেই চিরশান্তির উজ্জ্বল পথানুসরণে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। ঐ ধন ভাণ্ডার কিসে সুসজ্জিত থাকিবে, তাহারই জন্য সতত ব্যস্ত! কিন্তু একটী প্রশ্বাস পরিত্যাগের সময়টুক মধ্যেই যে, সকল সুখের শেষ হইয়া যায়, তাহা ভাবিবারও অবসর থাকে না। অনিবার্য্য অশান্তির অগ্নিকল্প দহন যাতনা সহ্য করিতেও স্বীকৃত কিন্তু স্বার্থ কলুষিত চরিত্রের মলিনতা ও হৃদয়ের কূট কল্পনা-প্রসূত কুচিন্তার জঞ্জাল আবর্জ্জনা সমূহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এমন স্থলে নিঃস্বার্থ দেব চরিত্রের আশা, সুদূর পরাহত, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। ফলতঃ অনাসক্ত নির্ম্মল চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, আমরা অনিত্য ভোগ প্রয়াসী হইয়া সম্মুখে কালের যে করাল মুখ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাকেও উপেক্ষা করতঃ, অসার সুখের মধুর আস্বাদনে অমরত্ব লাভ করিব—আর সদসৎ ও মহত্তত্ত্ব অনুশীলনের প্রয়োজন কি এই ইচ্ছা প্রণোদিত কর্ম্মের ভৃত্যরূপে নানা প্রকার অসত্যের বোঝা বহন করিতেছি। হায়! অক্লান্ত হৃদয়ে এমন কি, চক্ষের নিমেষ কালের সময় টুকও দুরাকাঙ্ক্ষিনী কুচিন্তার বিকারময় কার্য্য গুলি পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহি। ঈদৃশ অসার ভার মগ্ন নিশ্চেষ্টকে জ্ঞান কৃত অপরাধী বলিতে ক্ষতি কি? আমরা অনায়াসে অযথা অমিত ব্যয় সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হই না, অথচ ঐ যে দ্বার দেশে বুভুক্ষিত রুগ্ন দুঃখীটী চীৎকার করিতেছে, তাহাকে একমুষ্টি অন্ন দিতে ভ্রূকুটি দ্বারা তাড়াইয়াছি। এমন কুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিকে কি পৃথিবীর ভার স্বরূপ মনে করা যায় না? আবার এ কথাও বলি যে ঐরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য আকুল প্রাণে কি এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবেন না? বিশ্ব-বিধানে ইহাও ত দেখা যায় মানুষ মোহ-ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিলেও জাগ্রত হইতে পারে। অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারেও অনাবৃত জ্ঞানের আলো বিকাশ পায়। মূর্খ জনেরও অন্তর হইতে দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র, পরিস্ফুট হইয়া থাকে। তিক্ত রসপ্রদ নিম্ববৃক্ষ অধিক সারবান হইলে চন্দনে পরিণত হইয়া বিশুদ্ধ গন্ধে প্রাণ শীতল করে। সুতরাং বিশ্ব-রাজ্যে নিরাশার নিবিড় তিমিরে কাহাকেও চিরদিন থাকিতে হয় না। ইহাই ত প্রাণিজগতের অপূর্ব্ব অভিনয়!

যাহা হউক, ইতঃপূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা ভয়ানক অনিষ্টোৎপাদন হয়, তাহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রাণগত প্রযত্নে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়া থাকে। বিশ্ব-ভাবন পরমেশ্বর এমন কোন বস্তু বা পদার্থ রাখেন নাই যে,

উহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। বলিতে কি, অশান্তির দহন-যাতনা না থাকিলে, শান্তির অমিয় আস্বাদন বুঝিবার শক্তি থাকিত না। দুঃখ না থাকিলে, সুখ যে কি বস্তু কে জানিত? পুতিগন্ধ না থাকিলে, চম্পক-চন্দনাদির দিগ্ব্যাপ্ত সৌরভ কি অনুভব হইত? কামাদি রিপু-চরিত্রের আঘাতেই সদ্‌গুণ প্রভৃতির শক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ফলতঃ বিশ্ব-বিধানের মূলপ্রদেশে প্রবেশ করিলে জানা যায়, জগৎ যাহাকে পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করে, তদ্দ্বারাই প্রাণের প্রিয় বস্তু সমূহ লাভ করা যায়। কিন্তু এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তবে কি ঐ সকল ত্যাগোপযোগী বস্তুগুলি গ্রহণ করা আবশ্যক? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে পারা যায়, অগ্নি যেমন সময় বিশেষে সকলের সাহায্যকারী—তাই বলিয়া উহাকে কেহ শরীরের কোনও স্থানে স্থান দিতে পারেন কি? তেমনি শোক, মোহ, সন্তাপ ইত্যাদি ইহাদিগেরও সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়া সার বস্তুরই ভোগেচ্ছা বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা এই ভীষণ পরীক্ষার স্থলে মায়াময়ী পৃথিবীতে নির্ভীকচিত্তে আপন অভীষ্ট চিন্তার উজ্জ্বল পথ পরিষ্কার দেখেন, তাঁহারাই অহিতকর প্রবৃত্তির উত্তেজনা সমূহকে ঐশীতত্ত্বে মার্জ্জিত করিয়া তাহাদেরই সংস্পর্শে অধিকতর উপকৃত হন। যাঁহারা অশান্তির ক্রোড়ে শান্তি, দুঃখের ক্রোড়ে সুখ, যাতনার ক্রোড়ে আনন্দ, ক্রোধের ক্রোড়ে ক্ষমার সখ্যভাব দর্শন করেন, তাঁহারাই ত্যাগের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাঁহারা বিষে সুধা, উত্তাপে শৈত্য, যন্ত্রণায় উল্লাস এই মধুর সামঞ্জস্যের নিমিত্ত ব্যগ্র—তাঁহারাই দেব-স্বভাবে প্রকৃত সন্ন্যাসী। তখনই তাঁহাদের ভেদ-বিপদ সঙ্কুল বিঘ্নপ্রদ ত্যাগের বস্তু সকল যুগপৎ অন্তর্হিত হয়, এবং সকল প্রকার প্রাণীর প্রতি প্রীতির পবিত্র দৃষ্টি বিকাশ পায়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম সাধনেও বিশুদ্ধ সন্ন্যাসের স্নিগ্ধ তরঙ্গে আকুল প্রাণ শীতল করে। বাস্তবিকই স্বাভাবিক সরল চিন্তার অমৃত উচ্ছ্বাসে আশ্রমবাসীগণও নির্ব্বিঘ্নে অন্তর্ন্যাসী হইয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধ যোগী হইতে পারেন। কিন্তু ভস্মভূষণ ও কৌপীন-কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ, অরণ্যবাসী হইলেও যদ্যপি সংসারের ভোগেচ্ছার আশা নিবৃত্ত না হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে উহা বহির্ন্যাসীর কঠোরতার দৃষ্টান্ত ব্যতীত কিছু বলা যায় না। আর এ কথাও অতি সত্য যে গৃহত্যাগী গিরিগুহাবাসী সন্ন্যাসীর সম্মুখে, পর দুঃখ কাতর লোকহিতৈষী প্রচার ব্রতধারীরাও জ্বলন্ত আদর্শ।* তাঁহারা বিশ্ব-প্রেমে বিহ্বল হইয়া একপ্রাণতার মহামিলনের ভিখারী।

---

* ধর্ম্মবীর বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জগতের নরনারীর দুরবস্থা দেখিয়াই ত

যাহা হউক, মানব-হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত স্ফটিক প্রস্তরবৎ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল-নিষ্কলঙ্ক না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মার জ্যোতিঃ প্রবাহ প্রতিবিম্বিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, পার্থিব সুখের আশা জনিত মোহ-ভ্রান্তির রেখা মাত্রও প্রাণে থাকিতে অন্তর্য্যাসী হইয়া মহচ্চিন্তাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করা সুদূর পরাহত। অথচ তত্ত্ববস্তু অতি নিকটে,—তথাপি দেখা যায় না। হায়! কস্তুরীগন্ধমুগ্ধ কুরঙ্গ যেমন স্বীয় নাভিতে ঐ কস্তুরীর খণি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বনভাগ ঘুরিয়া মরে, তেমনই বহির্য্যাসীকেও ভ্রান্তির নিবিড় তিমিরে হৃদয়স্থিত চৈতন্যকে প্রচ্ছন্ন পূর্ব্বক নিয়তকাল ভ্রমণ-পরিশ্রমে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এমত স্থলে নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, বাহ্যিক লালসার তিরোধান না হইলে ত্যাগের কঠোর সাধনাও বৃথা হইয়া যায়।

যিনি জ্ঞান কীলকে ধৈর্য্য-রজ্জু দ্বারা মোহ-মগ্ন প্রবৃত্তি সমূহকে বাঁধিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে কুচিন্তা-কলুষিত মলিন ভাব গুলি মধুর প্রেমে ধৌত করতঃ ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়াছেন, তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যিনি আসক্তি পূর্ণ বহির্জগতের অতীত অখণ্ড চিন্ময় জগতের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইতে সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যিনি স্ব দ্বারা ব্যতীত অপর রমণীকে দর্শন মাত্র মনে মনে ঐ মাতৃ শক্তির পূজার উপকরণ পশুবৃত্তি বলি দিয়া শান্তির বিমল তরঙ্গে নিমজ্জিত হন তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী;

যিনি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, সময় চক্রের নিষ্পেষণে দরিদ্রতার কশাঘাতেও একমুষ্টি অন্নের জন্য বিচলিত নহেন, বরং প্রতি মুহূর্ত্ত আনন্দ সম্ভোগ করেন, তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যিনি স্ত্রী পুত্র ধনৈশ্বর্য্যে নিজের আমিত্ব স্বামীত্ব কিছু নাই সকলই ঈশ্বরের— সর্ব্বদা সেবা নিরত হইয়া কর্ত্তব্য পালনের কোন অংশে ত্রুটী হইলে, তজ্জনিত সম্পূর্ণ দায়িত্ব আছে, এই নিঃস্বার্থ চিন্তা সতত মনে রাখেন; তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যিনি চারি বেদ, চৌদ্দশাস্ত্র, অষ্টাদশ পুরাণ মুখস্থ করিয়াও যীশুর মত শিশু চরিত্র শিক্ষার নিমিত্ত একটী বালক দেখিলে, তাহাকে ক্রোড়ে পাইয়া কৃতার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? মোহ তিমিরাচ্ছন্ন মানব সকলকে ধর্ম্ম পথে আনিবার জন্য কতই না কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত নির্জ্জন গিরিগুহায় একাকী আত্ম সুখ তৃপ্তির ইচ্ছা করেন নাই!

হন, এবং অতি দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিরও উপদেশ উপেক্ষা করেন না, তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যিনি উদ্ধত উগ্রচেতা অমর্ষপরায়ণ অর্থাভিমানীর অন্যায় তিরস্কারকে পুরস্কার মনে করিয়া তাহারই সহিত প্রীতি সংস্থাপনের জন্য ব্যস্ত—তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যিনি বর্ষা তরঙ্গিনীর তুঙ্গ তরঙ্গ মগ্ন বিপন্নকে, উদ্ধার কামনায় নিজ জীবনের বিন্দুমাত্রও আশা রাখেন না, ঐ নদী গর্ভ স্থিত ভাইটীর নিমিত্ত প্রাণ দেন, তিনিই সংসারে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

আমরা প্রত্যেক গৃহস্থই যদ্যপি নিজ নিজ পরিবারবর্গ ও ধন সম্পদ যা কিছু সমস্তই ঈশ্বরের, তাঁহারই আদেশ পালনে নিযুক্ত আছি, ইহাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি, এবং অনিত্য সুখ-নিদান বিলাসিতার তরঙ্গে পরিবারবর্গকে ডুবাইয়া ধর্ম্ম-ভাব হইতে বঞ্চিত না করি, তাহা হইলে সংসারে অনাসক্ত সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করা কি সম্ভবে না? আর্য্য ঋষিরা অরণ্যবাসী হইয়াও স্ত্রী-পুত্র প্রিয়জন পরিত্যাগ করেন নাই। লোকালয় ও বন একই কথা! অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুরাগ প্রাণে জাগ্রত থাকিলে গৃহস্থাশ্রমেও অনাসক্ত বৈরাগ্য সাধনে শক্তি জন্মে। এবং পার্থিব দেহের পরিণাম প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ধন সম্পদ, আত্মীয় সুহৃৎ সকলই কালের অতল উদরে চলিয়া যাইতেছে, সম্রাটও চিরজীবি নহেন, ঐ দরিদ্রটিরও সেই অবস্থা! কিন্তু উভয়েই একই শ্মশানের অতিথি—ঐ চিতাগ্নিতে ভস্ম হন—একখানি অস্থিও থাকে না! ভাবিয়া দেখিলে, এটি কি বুঝিবেন না যে, স্ত্রী-পুত্র সম্পদরাশি সকলি নশ্বর—পরস্পর শরীর ভাবটীও বরফ নির্ম্মিত পুতল মাত্র! আপনি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারিবেন না—ধূলির সহিত মিশিতে হইবেই হইবে,—এটিত ধ্রুব সত্য? তবে অনিশ্চিত বাসনা-স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই কি উচিত মনে করিবেন? গৃহবাসে থাকিয়াওত সন্ন্যাস তত্ত্বের কোন বিঘ্ন দেখা যায় না। অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, সংসারই সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র! এখানেও ত্যাগ বা সন্ন্যাসের যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। সূক্ষ্ম চিন্তার মূলে প্রবেশ করিলে জানা যায়, ধন জন পরিবার বেষ্টিত হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে সিদ্ধ মনোরথ হইলে, আর কাহাকেও বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয় না! মনের বন পরিষ্কার করিয়া কামাদি রিপুগণ এবং দ্বেষ দম্ভ অহঙ্কার রূপ হিংস্র জন্তু সকলকে তাড়াইয়া দিলে, গৃহস্থাশ্রমে কেনই বা ত্যাগ সিদ্ধ হইবে না! এই সাধনইত

মানবের বীরত্ব! অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতরেও অনাসক্ত বৈরাগ্য স্থিতি করিতেছে। ঐ রাজর্ষি জনক তিনি কি জগতের উজ্জল দৃষ্টান্ত নহেন? অতএব সংসারে থাকিয়াই সন্ন্যাস সাধন করা বিধেয়। আত্মসুখ প্রয়াসী মানবেরাই তীব্র বৈরাগ্যের প্ররোচনে বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বরের পুত্র কন্যার সেবা ব্রত উপেক্ষা নিবন্ধন দায়িত্বটুক যে থাকিয়াই যায়, ইহা তাঁহারা মনে করেন না। সুতরাং পর্ব্বত গুহাবাসী হইয়াও কিছু হইল না! যদি নিবিড় অরণ্যবাসই শ্রেষ্ঠ হইত তবে বিধাতার এই বিচিত্র চিত্রময় জগতেরই বা প্রয়োজন কি ছিল? একমাত্র অসীম মহা চৈতন্য থাকিলেইত যথেষ্ট! আহা! বিবিধ প্রকার প্রাণিসকলের শরীরাধারে চিৎ তরঙ্গের উচ্ছ্বাসলীলার ভাবটী কি মধুর হইতে ও মধুর নহে? হিমালয়ের উত্তর সীমায় দুই চারিটী জটাধারী মহা-পুরুষ রাখিয়া দিলেই কি তাঁহার অনন্ত ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া যাইত? আমরা ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিতে না পারিয়া সংসারকে বিষ দৃষ্টে চাহিয়া থাকি এবং বিরক্ত বৈরাগ্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করতঃ তৃপ্তি লাভ করি। ফলতঃ বিশ্ব সংসার যে সাধনের বিশুদ্ধ স্থান ও পরিবার বেষ্টিত আশ্রমটিও যে স্বতন্ত্র নহে, ইহা জানিতে পারিলে, বিপদাশঙ্কা কেনই বা উপস্থিত হইবে? নির্ভীকান্তঃকরণে বলিতে পারা যায় যে, গৃহস্থাশ্রমেও ত্যাগ বা সন্ন্যাসের বিঘ্ন সম্ভবে না। অতুল বিভব ভোগীও ত্যাগী বা সন্ন্যাসী হইতে পারেন, ত্যাগের ত মনেরই সহিত সম্বন্ধ? মন বশীভূত না থাকিলে, সজনই হউক আর নির্জ্জনই হউক, কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না। এই পারিবারিক জন কোলাহল পূর্ণ সংসারটিকে ঈশ্বরের সংসার করিয়া লইতে পারিলে, তবে দেখিবেন ঐ স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি উহারাই আবার ধর্ম্ম সাধনের শক্তি বৃদ্ধি করিবে, এবং সাধন-পথ সহায় হইবে। প্রত্যেক গৃহে শান্তির বিমলধারা বহিতে থাকিবে, আনন্দের পরাকাষ্ঠা রহিবে না। জনপূর্ণ সংসার মধ্যেও অনাসক্ত সন্ন্যাসতত্ত্বের আবির্ভাবে, স্বর্গীয় প্রেম আপনা হইতেই আসিবে। হৃদয়ভেদী সাধনের অমৃত উচ্ছ্বাস সকলের প্রাণে অনবরত ছুটিতে থাকিবে, নিরাশার কথা নাই।

সপ্তম উল্লাস।

আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব।

আত্মা শব্দে ধৃতি, বুদ্ধি মন ইত্যাদি অনেক প্রকার আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মা একমাত্র চিন্ময় অসীম শক্তি সম্পন্ন অনাদি নিত্য। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যিনি নিরাকার অনন্ত ব্যাপী, তিনি স্থূলাতীত হইয়া আকার বিশিষ্ট হন কিরূপে ? এবং তাঁহার অখণ্ড শক্তির স্ফূর্ত্তি বিবিধ ভাবে দৃষ্ট হয় ইহারই বা কারণ কি ? আবার ঐ পূর্ণ সত্ত্বার ভিতরে পরিমিত তত্ত্বজাত জগৎ বৈচিত্র্যই বা কেন ?

এই নিগূঢ় তত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, এক আত্মা ব্যতীত আর কিছু নাই, আত্মাই শক্তি তরঙ্গের সমষ্টি! ঐ পূর্ণ শক্তিই আত্মা বা ঈশ্বর নামে অভিহিত! তিনি নিরুপাধি সত্বেও সিদ্ধ পুরুষদিগের প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা নিবন্ধন তাঁহাদের পবিত্র হৃদয় হইতে নাম বা উপাধি প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, বৈদিককালের উচ্চ ভূমিতে যখন আর্য্য ঋষিরা উপনীত হন, তখন স্থূল তত্ত্ব জড়িত এক একটী শক্তিমাত্র বুঝিয়া পরিশেষে ঐ সকল শক্তি চিন্তার চরম স্থানে উপস্থিত হইলে জানিতে পারিলেন যে, উহা-দিগের উপরেও আর একটী অখণ্ড শক্তি কার্য্য করিতেছে। তখন হইতে ঋষিরা তাহারই চিন্তা ও পূজা বন্দনায় নিরত প্রাণ হইয়া ব্রহ্ম নিরূপণে প্রবৃত্ত হন। বিপুল অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত সাধন বলে অল্প সময়েই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিরাকারেও রূপ আছে! কিন্তু উহা লোক চক্ষুর বহির্ভূতঃ অব্যক্ত রূপ—আত্মা হইতেই প্রকাশ পায়, যোগিরা জ্যোতিশ্চক্ষুতে দর্শন করেন, তাহা এই—

> "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্,
> যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।"
>
> (উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত।)

এইরূপ রূপ তত্ত্বের প্রত্যক্ষ্যানুভূতিতে সাধন সিদ্ধ হইয়া আত্মার স্বরূপ নির্ণয় হয়। স্ব—শব্দ নিজ বা (স্বয়ং) আত্মা স্বয়ংই কখন জ্ঞান রূপে কখন আনন্দ-রূপে কখন শান্তি রূপে প্রকটিত হইয়া ঋষিদিগকে স্থূলের বিকার তরঙ্গ হইতে

বিমুক্ত করেন। ঋষি পুঙ্গবেরা ধ্রুব সত্যরূপে জানিলেন যে, আনন্দ, শান্তি, প্রেম ইত্যাদি যখন হৃদয় হইতে ফুটিয়া উঠে, তখন ঐ সকল রূপ তত্ত্ব, কোন আকারে পরিণত হয় না। তবেই বুঝা যায় যে, যখন যে তত্ত্বই হৃদয়ে পরিস্ফুট হউক না কেন, একই সত্তার প্রকার ভেদ মাত্র। জ্ঞান, শান্তি জ্যোতিঃ প্রভৃতি "রূপ" প্রত্যেকই অসীম রূপেই প্রকাশ পায়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাস্তবিকই যোগীরা উহা প্রজ্ঞা চক্ষুতে দর্শন করিয়া স্থূল সঞ্জাত পার্থিব রূপের প্রতি ততটা আগ্রহ বা অনুরাগ রাখিলেন না, সুতরাং তাঁহারা সেই অরূপ রূপ সাগরের অতলতলে প্রবেশ করিলেন। হয়ত অনেকে বলিবেন, অরূপে রূপ কেন? "মাথা নাই যার তার আবার মাথার ব্যথা!" একথাটী শুনিতে অতি সুন্দর কিন্তু উহার সম্বন্ধে বলিবার গূঢ় সত্য আছে। অনাদি শব্দ রূপ "অ" নিত্য ও নিরাকার মহাকাশ ব্যাপী নাদ ব্রহ্ম! সুতরাং অরূপ স্বরূপ যে "আত্মা" তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ঐ স্বর স্বরূপ "অ" হইতেই "অহমস্মি—আমি আছি—অনন্তকাল আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইতেছে। এই শুদ্ধ বুদ্ধ নিরবয়ব "অ" ভয়ে অভয়, কপটে অকপট পাপে অপাপবিদ্ধম!" সকল প্রকার সাঙ্কেতিক বর্ণ ও ভাষায় অবস্থিতি করিতেছে। অথচ আমরা উহাকে বর্ণ বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ অ-য়ের আবরণে, বস্তু কিম্বা তত্ত্ব সমূহের আদিতে রাখিয়া উক্ত নিরবয়ব শব্দ ব্রহ্ম অয়ের শুদ্ধ প্রকৃতিকে বিকৃতি দেখিতেছি, তাহা বুঝিলাম না! নিত্য বস্তুর অগ্রে রাখিয়া অনিত্য বস্তু বুঝিতেছি—সার তত্ত্বের প্রথমে রাখিয়া অসার তত্ত্ব জানিতেছি—সত্যের সম্মুখে রাখিয়া অসত্য ভাবিতেছি। এইরূপে স্থূলের অধিকারে প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ ও নিকটের বস্তুকে দূরে ফেলিয়া ভ্রমে ভ্রমণ করিতেছি এবং বিষম ভ্রান্তি বশতঃ নিত্য বস্তুকে বিকৃত চক্ষে দেখিয়া প্রতি নিয়ত অনিত্য বাহ্যরূপ সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত হইতেছি। তজ্জন্য প্রকৃত স্বরূপ তত্ত্বের নিমিত্ত আকুল হইনা।

অপিচ, অনেকেই অরূপের রূপ ও সৌন্দর্য্য তিনটী তিনটী ভাবের ভিতরে দর্শন করেন। প্রথমটি পশু, পক্ষী, মানবাদির শরীরাকারে, দ্বিতীয়টী বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাকারে, তৃতীয়টী স্বর্ণ, রজত, হীরকাদি ধাতু-প্রস্তর প্রভৃতির আকারে—কিন্তু আত্মার স্বরূপ জ্যোতিঃ কি জান্তব জগতে কি উদ্ভিজ্জ জগতে, কি ধাতু প্রস্তরাদিতে পাত্র স্থিত পারদবৎ অস্পর্শ প্রকট ভাব—ইহ স্বতঃ সিদ্ধ! সিদ্ধযোগিগণ আত্মার রূপ ও সৌন্দর্য্য কোন প্রকার স্থূল বস্তুর মধ্যে দেখিতেন না! কেননা, তাঁহারা ঐ সমস্ত বাহ্য-আবরণ পরিত্যাগ করতঃ

অন্তশ্চক্ষুতে "আনন্দরূপমমৃতম্" ইত্যাদি রূপ নিরাকারেই দর্শন করিতেন। সেই সকল মহা যোগীরা মুক্ত প্রজ্ঞার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্পর্শ করিয়া জানিলেন যে, ভঙ্গুর শরীর ত তাঁহাদের রূপ নহে? উহারও আসক্তি ত্যাগ করতঃ, অন্তরাকাশে অব্যক্ত জ্যোতির্ম্ময় আত্মার অখণ্ড রূপ দর্শনেই আনন্দ ও শান্তি—ইহা ব্যতীত আর কিছুতেই প্রকৃত তৃপ্তি নাই। উহাই দৃঢ় রূপে স্থিরীকৃত হইলে, তখন হইতে জগতের প্রীতির বস্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তত আগ্রহ রহিল না।

এই ত গেল যোগিদিগের রূপ দর্শনের ভাব! এখন ভক্ত ও সাধকগণের রূপ-দর্শন বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। ভক্তগণ অহেতুকী ভক্তির মিষ্ট আনুগত্যে এতই আকুল হইয়া পড়েন যে, বিশাল বিশ্বমণ্ডলের সকল প্রকার পদার্থেই ভগবানের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পান। এমন কি, একটী পত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরার ভিতরে অতি সূক্ষ্ম কারুকৌশল ও কার্য্য শক্তির বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুপ্লুত নয়নে সংজ্ঞাহীন হন। আহা! ভগভাবের কি অমৃত উচ্ছ্বাস যে, তাঁহারা মধুর প্রেমে মগ্ন হইয়া হিংস্র জন্তুকেও আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন না। বস্তুতঃই অকৈতব ভালবাসায় শ্বাপদ ভল্লুকাদি পশুগণও প্রেমের আকর্ষণে সতৃষ্ণ নয়নে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। ধন্য ভগবৎ প্রেম! যাহাকে স্পর্শমাত্র ভক্তগণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ! ভাবাবেশে এতই উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা প্রবল হয় যে, চেতনা-শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেনই বা যাইবে না! একেত অহেতুকী ভক্তির সহিত দীনতার অকৃত্রিম সখীভাবে অভেদ মিলনে মধুর আনুগত্য—ইহাতে কৈতব-কলঙ্ক ও বিচার-জ্ঞান কেনই বা যাইবে না? ভক্তিই বা উন্মাদিনী শক্তির পরিচয় দিতে বিরত থাকিবে কেন? সুতরাং ভক্তের চিত্ত অবিচার ভক্তির সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হইয়া ধাতু, শীলা, দারু নির্ম্মিত মূর্ত্তি যাই কেন হউক না তাহাতেই ভগবানের দর্শন-ভাবে বিহ্বল হন।

সাধকগণ মধ্যেও তদনুরূপ দর্শন ভাব দেখা যায়। তবে বিশেষত্ব এই যে, সাকার নিরাকারে সংমিশ্রণে যোগ দ্বারা সাধনের মত ও প্রণালীগুলি রহিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, স্থূল বস্তুর ভিতর দিয়াও নিরাকার ধারণা হইতে পারে। আরও বলেন যে, বেদান্ত মতে জগৎ প্রপঞ্চময় হইলেও যখন উহা ঐশী শক্তির বহির্ভূত নহে, তখন স্থূল তত্ত্ব জাত কোন একটী বস্তুকে অবলম্বন করিলে, ঈশ্বর দর্শনে বিঘ্ন সম্ভবে না। কেননা জড় জগতেও নিরবয়ব অখণ্ড আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। পার্থিব পদার্থের মধ্যে দিয়াও নিরাকার আত্মার স্ফূর্ত্তি

দেখা যায়। তাহা যদি না হইত তবে এই প্রাণিজগতে হস্তপদাদি বিশিষ্ট শরীর কোষের বিধানে চৈতন্যের প্রকাশ ভাবেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। জগৎ বৈচিত্র্য-চিত্রের রেখা-প্রবিষ্ট শক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। আবার এটিও অতি সত্য যে, বৃক্ষের ফলটী সুপক্ক হইলেই ত তৎস্থিত ফুলটী শুকাইয়া যায় এবং অল্প সময়েই খসিয়া পড়ে। তদবস্থায় আসিলে, ঐ সাকার চিন্তার পরপারেই নিরাকারেও ভগবদ্ স্বরূপ দর্শনের আর কোন বিঘ্ন সম্ভবে না। ইহাতেও সেই নিত্য স্থিত ভূমির উপর উঠিবার শক্তি জন্মে ও জলৌকার ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ গন্তব্য তৃণ গ্রহণের ন্যায় চলিতে পারা যায়। এইরূপ সাধনাই ত বিশ্বাসভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার সহজ উপায়। একটী লম্ফ দিয়াই কি উত্তুঙ্গ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করা যায়! এই রূপ বহুবিধ মীমাংসার কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু শাস্ত্রের অত্যুজ্জ্বল জ্ঞান গর্ভ উপদেশ সত্ত্বেও, তাহাতে কোন কথা বলিবার না থাকিলেও, সাকার-নিরাকারের মিশ্রণ যোগে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনার বিষয় আছে যে, যেমন অধঃ ঊর্দ্ধ দুইটী গতিশক্তির একত্ব সংঘটন অতি অসম্ভব, তেমনই স্থূল অস্থূলে যোগ ইহাও সম্পূর্ণ বিভ্রাট জনক সন্দেহ নাই। একটু স্থির ভাবে তাকাইয়াই কেন দেখুন না,—একটী নীল বর্ণের পদ্ম, আর একটী রক্ত বর্ণের গোলাপ ফুল আপনার সম্মুখে রহিয়াছে; এখন ঐ দুইটী পুষ্পের অবয়ব ও বর্ণের সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সত্য সত্যই কি আপনি ঐ নীল লোহিত উভয় বর্ণকে এক অবস্থায় দেখিতে পান? কখনই না! নিশ্চয়ই আপনার অন্তরে ফটোগ্রাফের ন্যায় ফুল দুইটীর আকৃতি এবং বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে! তবেই বুঝুন, স্বভাবের বিপর্য্যয় নিবন্ধন ভিন্নতা যায় না। এ জন্য অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, মিশ্রন যোগে আত্মার অখণ্ড শক্তি ও স্বরূপের প্রকাশ যেন অসম্ভবই মনে হয়। আরও দেখুন, জগত্তত্ত্বের ত দূরের কথা! ধ্যানাবস্থায় যখন শরীর কোষটীও সরিয়া পড়ে, তখন ঐ বস্তুগত বদ্ধ ভাবে সময় পাত করা কতদূর মঙ্গলপ্রদ সহজেই জানা যায়। অতঃপর প্রথম হইতে সার তত্ত্বেরই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আচ্ছা যোগী, ভক্ত, সাধক ইঁহাদের "স্বরূপ" দর্শনের বিষয় কিছু কিছু বুঝিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই ত্রিবিধ মনীষীগণ মধ্যে আত্মার "রূপ" দর্শন কোন শ্রেণীর প্রকৃত?—ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য সত্ত্বেও তত্ত্ব চিন্তার আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল প্রযত্ন নহে। বস্তুতঃ একটু সূক্ষ্ম ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,

পরস্পর সাধন প্রণালীর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ যোগাভ্যাসের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও উদ্দেশ্যের তারতম্য দেখা যায় না। সকলেরই ত্যাগ স্বীকার এবং চরিত্র পবিত্র একীভূত; কিন্তু অবলম্বন প্রভেদ হইলেও প্রাণের ব্যাকুলতা এক—তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই। তবে দর্শন সম্বন্ধে মতের অনৈক্য অনেক রহিয়াছে। যাহা হউক, সকল সম্প্রদায় মধ্যেই সাধুসঙ্কল্প—সিদ্ধ সাধনের পথ পরিষ্কৃত—অথচ তাহা পার্থিব ভাবের তরঙ্গাঘাতে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। উপর্য্যুক্ত ত্রিবিধ সাধু মণ্ডলীরই প্রাণ ঈশ্বর দর্শনের নিমিত্ত আকুল! ভক্তের দাস্যভাবে প্রভুভাবে সাধকের সন্তানত্বভাবে মাতৃ-ভাব, যোগীর মহামিলন যোগভাবে সখা বা বন্ধুভাব; কিন্তু স্বরূপ দর্শনে পরস্পর মতের বিভিন্ন দেখা যায়। ভক্ত, দারু, ধাতু, প্রস্তরাদিতে মত্ততা প্রমত্ত প্রেম ও উন্মাদিনী ভক্তির উচ্ছ্বাসে মগ্ন! সাধক জড় অজড় বুঝেন না, সাকার নিরাকার সংমিশ্রণ যোগে বিহ্বল! যোগী একমাত্র চিন্ময় অসীম সত্তা ব্যতীত পরিমিত পদার্থে পরিতৃপ্ত নহেন। কেননা তিনি অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে জানেন যে, কোটী কোটী জগৎকে একত্র করিলেও অসীম ব্রহ্ম-সিন্ধু মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বিন্দু স্বরূপ, সুতরাং নিরাকার আত্মার রূপ স্থূলের অতীত। যদি ইহাই নিশ্চিত সত্য হয়, তাহা হইলে সংমিশ্রণ ও অহেতুকী ভক্তি যোগে আত্মার "রূপ" দর্শন কতদূর সম্ভবপর একটুক ভাবিবারই কথা!

যাহা হউক, এক্ষণে একটী বলিবার বিষয় এই যে, প্রাণিপূর্ণ বিশাল বিশ্ব-ক্ষেত্রে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানবে ও উদ্ভিজ্জ জগতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রভৃতি এবং ধাতু প্রস্তর অর্থাৎ স্বর্ণ, রোপ্য হীরকাদিতে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া সকলের মন মুগ্ধ করিতেছে, ইহার প্রত্যেকের ভিতরেইত আত্মার অব্যক্ত জ্যোতিঃ বিদ্যমান আছে; তবে ঐ সকল বস্তু গুলির মধ্যে কি ভগবানের "রূপ" দর্শন হয় না? সকল রূপেইত তাঁহার রূপ মিশিয়া রহিয়াছে। স্বরূপ শক্তি, সৌন্দর্য্য যদি সর্ব্বাধারে স্থিতি না করিত, তাহা হইলে কখনই জগতের জীবন্ত চিত্র সমূহ ফুটিয়া উঠিত না! একটী বালুকণার ভিতরেও যে বিশ্বরূপের অব্যক্ত জ্যোতিঃ বিকাশ পাইতেছে, ইহাতে কি কোন সন্দেহ আসিতে পারে? ঐ ক্ষুদ্র কোহিনুর হীরক খণ্ড হইতে কি ব্রহ্ম স্বরূপের অমানুষী জ্যোতি বাহির হই-তেছে না? পত্র পুষ্প ফলে কাহার সৌন্দর্য্য বিকাশ পাইতেছে? জগচ্চিত্রের ভিতর দিয়া ভগবানের রূপ ফুটিতেছে না? ঘোর তমোময়ী নিশীথিনীতে অসংখ্য নক্ষত্র খচিত ব্যোম-বসন-ভূষিতা বিশ্বজননীর অসীম রূপের আভাস-ছটা কি

প্রকাশ পাইতেছে না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি অনন্ত ব্যাপী নিরাকার রূপের প্রকট ভাব সপ্রমাণ হয় না? অতি সত্য যে, বিশ্ববিভুর বিশ্বরচনার গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ শক্তি না জন্মিলে ইহা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব! বিধাতা এই বিশাল বিশ্ব সমূহের প্রত্যেক পদার্থ জাত অণুর ভিতরে অমানুষী শক্তি সৌন্দর্য্য কেন যে ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনিই জানেন।

বাস্তবিক, উপর্য্যুক্ত প্রশ্ন তত্ত্বের মীমাংসা বড় সহজ নহে। কারণ, ঈশ্বরের বিধান তত্ত্বে প্রবেশ করা মানবের সাধ্যাতীত। তবে কি যোগনিষ্ঠ মহা মনস্বীদিগের উপদেশ মস্তকে বহন করিয়া বুঝিব না যে, জড় জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই মোহ মরীচিকাময় ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু নহে, উহা কেবল অসার আশার তরঙ্গ মাত্র। ঐ সম্রাট পর রাজ্য গ্রাসের নিমিত্ত বিপুল আয়োজন করিতেছেন, হঠাৎ উৎকট পীড়ায় মূহুর্ত্ত মধ্যে শ্মশানের চিতাগ্নিতে তাঁহার কনক কান্তি শরীররটী ভস্মরাশিতে পরিণত, সকলি বিচিত্র! ভঙ্গুর শরীরের ভিতর দিয়া বিধাতৃ শক্তি বিকাশ পাইয়াও তাহা ঐ অনন্ত শক্তিতেই স্থিতি করে কিন্তু শরীরটী পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশিয়া যায়। নিউটন আসিলেন তাঁহার দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হইল—তিনি এখন কোথায়? পুরুষ পুঙ্গব মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—গীতা গ্রন্থ পাঠে শত শত ধর্ম্মহীন ব্যক্তি মৃত প্রাণে জীবন পাইয়া—সেই বাসুদেব এখন কোথায়? প্রেম বারিধি চৈতন্য দেব তান্ত্রিক-শাসনের সময় বঙ্গ বক্ষে রক্ত স্রোতের প্রবল গতিকে বাধা দিয়া অহিংসা পরম ধর্ম্মের মহাবেগে প্রবাহিত করিলেন—তিনি এখন কোথায়? তাই বলিতে ছিলাম, নিমেষকাল মধ্যে সাকার ভাব চলিয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল মহাপুরুষ দিগের কার্য্য সমূহ এখনও প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর শরীর বা পরিমিত স্থূল বস্তু ধরিলে সত্য বস্তু নিরূপণ হয় না। অনন্ত চিন্ময় পর ব্রহ্মকে পিতৃ মাতৃ যে ভাবেই হউক রূপক কল্পনায় নক্ষত্র চিত্রিত আকাশ অম্বরে বিভূষিত করিলেও তাহা সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে—উহাকেইত সাকার "বিরাটরূপ" বলে। আর অধিক বলিতে চাহি না, ভৌতিক তত্ত্ব সঞ্জাত রূপের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধির বিষয় সহজেই বুঝুন, ঐ মন বিমোহনকারী গোলাপ ফুলটি আজ কেমন সৌন্দর্য্য ও পরিমল রাশি ঢালিয়া দিল, পরদিন তাহার পাঁপরী সকল খসিয়া পড়িল, আর সেই রূপও সৌন্দর্য্যের চিহ্নও রহিল না। তাহার দিগ্ব্যাপ্ত সৌরভ, প্রাণ মুগ্ধ সৌন্দর্য্য নয়নানন্দদায়ক দর্শন তৃপ্তি—এ সকল কোথায় গেল? তবেই বলিতে পারা যায় যে, সীমাবদ্ধ স্থূল জড়িত রূপ অসীম সত্তাশ্রিত

হইলেও ভৌতিক তত্ত্বের বিকার দোষে কলুষিত, বিশেষতঃ পার্থিব পদার্থ গত রূপের অভাব আছে। এই কারণে সিদ্ধযোগী মহাপুরুষগণ আত্মার "রূপ" তত্ত্বের বিষয় নিরাকারেই স্থির করিয়াছেন, ঐ "আনন্দরূপমমৃতম্।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জগৎটী কি কিছুই নয়! তবে কি এই বিশ্বচিত্রের মধ্যে অসীম আত্মার সম্যকরূপ প্রকাশ পায় না ? ঐ বৃক্ষটীর শিকর শিরার রস যোগাইতেছে, পত্র শিরায় তাহা আকর্ষণ করিয়া কাণ্ডটীকে রক্ষা করিতেছে, ইহার শক্তিদাতা কে ? কলনাদিনী নদী পুলিনে মনমুগ্ধকর স্বাভাবিক চিত্র সমূহ ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহারই বা কারু কৌশলকর্ত্তা কে ? ঐ অসীমাকাশে ইন্দ্রায়ুধ মধ্যে সাতটী রং কে ফলাইয়া দিয়াছে! সকল প্রকার প্রাণি তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইলে, আত্মার শক্তি তরঙ্গ সর্ব্বাধারে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? কেননা, বিশ্বকেন্দ্রীভূত প্রত্যেক পদার্থ মধ্যেও ঐশী শক্তি কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ঐ সকল প্রশ্নোত্তরে এটি অতি সত্য যে সসীম স্থূল জগতের প্রতি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝাযায়, চক্ষের নিমেষ কাল মধ্যে জগত্তত্ত্ব সমূহ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কখন স্থূল কখন পরমাণুতে পরিণত! এই কারণে উহার স্থায়িত্ব ক্ষণ ভঙ্গুর—এ বিষয় ইতঃপূর্ব্ব বিবৃত হইয়াছে, এখানে পুনরুক্তি অত্যুক্তি মাত্র। তবে বলিবার কথা যে, পরিমিত স্থূল পদার্থ নির্ম্মিত বস্তুতে আপাততঃ মানব চিত্তকে ভগবন্মুখিনী চিন্তার দিকে ফিরাইয়া দেয় বটে, কিন্তু ঐ জড় তত্ত্ব জাত যাই কেন হউক না উহার চির স্থায়িত্ব না থাকা সত্ত্বে পরিত্যজ্য। কেননা অতি নিশ্চিত সত্য যে, যেমন মূলহীন বৃক্ষের প্রযত্নাতিশয়েও পরিণামে সুফল ইচ্ছা বৃথা হয়, তেমনই আশু তৃপ্তিপ্রদ স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া জীবন ক্ষেপন করিলেও পূর্ণ চৈতন্যময় আত্মার দর্শন আশা অসম্ভব। অতঃপর উহাতে চিরবদ্ধ না থাকাই শ্রেয়ঃ।

আপনি অবশ্যই মনে করিতে পারেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বরের শক্তি ফুটিতেছে কিন্তু উহা সকলি পরিবর্ত্তন শীল—কাল যাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ তাহার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তবেই দেখুন, পরিমিত অস্থায়ী পার্থিব পদার্থ মধ্যে অনন্তব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করা কিছুতে সম্ভব পর নহে। আমরা স্বতঃই অনভীপ্সিত বিষয়ের আলোচনায় উন্মত্ত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চাহি না। তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের নির্ব্বিকল্প নিত্যরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিমিত অনিত্য ক্ষণ স্থায়ী রূপই ভাল বাসি। কেননা, বিশ্বসৌন্দর্য্য কি কখন ভুলাযায়? উহা যে সহজেই চিত্তপটে চিত্রিত হয়। তাই,

সহসা ছাড়িতে পারা যায় না। সত্য কথা! কূপমগ্ন মণ্ডুকের পক্ষে সমুদ্র দর্শনের তৃপ্তি কি সম্ভব? আমাদেরও যেন সেইরূপই দশা ঘটিয়াছে। যদি কেহ স্বচ্ছ দর্পন খানি সম্মুখে রাখিয়া দেন, আমরা তাহাতে ধর্ম্মহীন মলিন দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইব—তাহার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিব না! আমার কোন স্থানে অভ্রান্ত সত্যের কথা শুনিলে, তখনই বদ্ধ ভাবের আতিশয্য বশতঃ তর্ক যুক্তির দ্বারা নিজের মত প্রবল রাখিতে ত্রুটি করিব না! এই ভীষণ ব্যাধি কি ঘুচিবে না? কবে ঐ নিরক্ষর কৃষকটীর নিকট সরল উপদেশ শুনিয়া তাহার মর্ম্মগুলি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিব, কবে ঐ বিশ্বজনীন উদার প্রেমের দৃঢ় বন্ধনে সকল প্রাণীর সঙ্গে নিবদ্ধ থাকিব, কবে ঐ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচার জ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষকের সরল ভাবের ভিতর দিয়া জলন্ত সত্যের উজ্জ্বল আলোকে মানুষ হইব, এসকল ত একবার ভুলেও চিন্তা করি না! বস্তুতঃই যে পর্য্যন্ত সমপ্রাণতার আলিঙ্গনে শাস্ত্রাভিমানের তীব্র হুঙ্কার বিনষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত অন্তশ্চক্ষুর সাম্য দৃষ্টি পরিস্ফুট হইবে না। সুতরাং আত্মার অখণ্ড রূপ দর্শন নিতান্ত অসম্ভব। কারণ, অজ্ঞানতার ঘোর তিমিরে অনন্ত জ্যোতিরাকাশ পথ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তজ্জন্য মহচ্চিন্তা ও অবিচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা চলিয়া যায়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা চলিয়া যায়। নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ ভাবে নিবদ্ধ থাকিয়া মরীচিকামুগ্ধ মৃগের ন্যায় অবিশ্রান্ত ভ্রমণ ক্লেশে ব্যথিত এবং অশান্তির অগ্নিকল্প দহনে দগ্ধীভূত হইতে হয়। জ্ঞানী হইলেও হয় না, যোগী হইলেও হয় না, যতক্ষণ অভেদ উদার স্বভাব প্রাণে স্থান না পায়, ততক্ষণ দেব-শক্তি গ্রহণের অধিকার জন্মে না। তর্ক চূড়ামণিই হউন বা বিদ্যাবিনোদই হউন কিম্বা রাজ মন্ত্রীই হউন ঐ কৃষকের সরল স্বভাবের নিকট তাঁহারা পরাস্ত! কারণ, স্বাভাবিক জ্ঞান যে শাস্ত্র গণ্ডি ভেদ করতঃ নিরক্ষর ব্যক্তির শূন্য হৃদয়কেও মহত্তত্ত্বের আলোকে আলোকিত করে; জগতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

নিঃশঙ্কচিত্তে বলিব যে, বিশ্বজনীন প্রেম ব্যতীত সরল উদার ভাব জন্মে না, অকপট ভক্তি ব্যতীত অভেদ সেবা-ভাব প্রকাশ পায় না, নির্ম্মলা প্রীতি ব্যতীত ধনী দরিদ্রে মিলন সংঘটন সম্ভবে না, অশ্রুমগ্না রুচি ব্যতীত অন্তশ্চক্ষু ফোটে না। যাঁহারা নিমেষ কালের জন্য সাধু-সঙ্কল্পে বিরত নহেন, যাঁহারা প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে শুভ চিন্তার আশ্রয় লইতে সময়পাত করেন না, যাঁহারা ধর্ম্মহীন ব্যক্তির মুক্তির নিমিত্ত নিষ্কাম প্রার্থনা দ্বারা নিয়ত অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই অসীম জ্যোতিঃ-মণ্ডলে আত্মার প্রকৃত রূপ দর্শন করিতে সক্ষম। সমপ্রাণদর্শী পরদুঃখ কাতর

মুক্ত পুরুষ ভিন্ন অন্যে ইহা ঘটে না। কেননা বহু পাঠে জ্ঞানলাভ করিলেও যদি বিচার-তর্ক তরঙ্গের বেগ উপশমিত না হয়, তবে সেই দিগ্বিজয়ী বিদ্বানও তত্ত্ব সাধনে দুর্ব্বল! কিন্তু হৃদয় শাস্ত্র হইতে স্বাভাবিক জ্ঞান কণা মাত্রও প্রাণ-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিলে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অসঙ্খ্য শিখা ধারণ করতঃ গ্রাম-নগর ভস্মীভূত করে, তেমনই ঐ অগ্নিকণা সদৃশ স্বাভাবিক জ্ঞান ক্রমশঃ প্রদীপ্তাকারে অসার ভাব সমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। তবেই বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মলা চিন্তাশক্তি পরিস্ফুট হইলে, এই প্রাণিজগতের একটী কোণে নীচ বংশীয় ক অক্ষর বর্জ্জিত চির দুঃখী পড়িয়া আছে, এমন ব্যক্তিও পরম তত্ত্ব লাভ করে, এবং অল্প সময়ে তাহার সাধু শক্তি প্রভাবে, স্বরূপ তত্ত্বের প্রদেশে নিগূঢ় সত্য সমূহ আর অপ্রকাশ থাকিতে পারে না।

এখানে শাস্ত্রানুশীলন সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শাস্ত্রও দুইটী ভাবে বিভক্ত। একটী বদ্ধ ভাব! অপরটী মুক্ত ভাব! বদ্ধ ভাব জনিত শাস্ত্র চিন্তা উহাই বিপদ সঙ্কুল! কারণ, একটী অভ্রান্ত সর্ব্বাদরনীয় জ্বলন্ত সত্য লাভ হইলে, উহা "শাস্ত্রে নাই" বলিয়া পরিত্যজ্য—কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য নহে—তাহা আকাশে বিলীন হইয়া যায়। এই বদ্ধ ভাবে কি কখন কোনরূপ মঙ্গলের আশা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব? ঐ রূপ শাস্ত্রাভ্যাসে কেবল কল্পনা রঞ্জিত বিবিধ ভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া বড় সঙ্কটে পড়িতে হয়, তাহাতে সহসা শান্তির আশ্রয় পাওয়া সুদূর পরাহত। কিন্তু মুক্ত ভাব জনিত শাস্ত্রানুশীলনে সেটি ঘটে না। উহাদ্বারা শান্তির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে জুড়াইবার স্থান পায় ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরং মুক্ত ভাবের শাস্ত্রানুমোদিত যে সকল উপদেশ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। ঐ শাস্ত্র-চিন্তা-লব্ধ-জ্ঞান সকলেরই আদরের বস্তু! তবে যে সকল শাস্ত্রে ঐশী ভাবের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সকল শাস্ত্রই পরিত্যজ্য! আর যদ্দারা দীনতা, সহিষ্ণুতা ভগবৎ একাগ্রতা প্রভৃতি প্রাণে পরিস্ফূরণ না হয়, কেবল পাণ্ডিত্যের অভিমানে চিত্তকে কলুষিত করে, এবং বিদ্যার বিচার-বিজয় ইচ্ছা প্রবল হয়, উহাতেই ঘোরতর বিপদ!! নতুবা কে বলিবে যে, শাস্ত্রোপদেশে মোহ পাশ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইবে না! শাস্ত্রের আশ্রয়ে কি কখন বিঘ্ন সংঘটিত হইতে পারে? বরং তাহাতে ভগবৎ তত্ত্ব নিরূপণে সকল প্রকারে শক্তি জন্মে। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় ঐ সমস্ত শাস্ত্রকেও ছাড়িতে হয়। আবার সেই স্বাভাবিক জ্ঞান প্রভাবে হৃদয়েই প্রকৃত সত্যের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বিকাশ পায়। বাহ্যরূপের

আকাঙ্ক্ষা জনিত আসক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইতেই পারে না। বলিতে কি দেখিতে দেখিতে ভ্রান্তি তিমির তরঙ্গ মগ্না রুচি, প্রীতি, ইচ্ছা ইহারা মুক্তি লাভ করিয়া অসীম আত্মার স্বরূপ সিন্ধু মধ্যে প্রবেশ জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করে। মন তখন বাধ্য হইয়া উজ্জ্বল প্রভাময় মহাপ্রেমের শরণাপন্ন হইতে এতই ব্যাকুল হয় যে, জগতের প্রাণ মুগ্ধ প্রলোভন সমূহ তাহার নিকট পরাভূত ঃ—সাধ্য কি যে, কোন বিঘ্ন উপস্থিত করে! সেই মহাপ্রেমের মধুর সংসর্গে কোনরূপ স্থূল রূপের কণামাত্র ছায়াও অন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। একমাত্র অনন্তব্যাপী আত্মার স্বরূপ চিন্তা, মহাবেগে চলিতে আরম্ভ করে। ঐ চিন্তা শক্তি গন্তব্য স্থলে আসিলে, তাহার সেই অনিবার্য্য দ্রুতগতির মহাবেগ থামিয়া যায়। তখনই অন্তরে দিব্যচক্ষুর অখণ্ড দৃষ্টি পরিস্ফুট হয় এবং "আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব" বুঝিতে শক্তি জন্মে। কেননা মন তখন বাহেন্দ্রিয়াদির ভীষণ ভীত ভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেব স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বহিশ্চক্ষুর স্থূল দৃষ্টি দ্বারা যে, পরিমিত পদার্থ মধ্যে নিরাকার রূপের দর্শন ভাব অসম্ভব, উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। সেই সময় শুভ চিন্তার উচ্ছ্বাস উৎকণ্ঠার উত্তেজনায় অরূপ স্বরূপের প্রকট ভাব দর্শন নিবন্ধন ঐ দিব্য চক্ষুর দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে ফুটিতে থাকে।

অনন্তর, অসীম প্রসার মহা শূন্যে যে, অনাদি কাল "অহমস্মি দেব-বাণী ধ্বনিত হইতেছে, উহাই সিদ্ধ যোগিগণ গভীর ধ্যানাবস্থায় হৃদয়াকাশে অব্যক্ত শ্রুতিতে শ্রবণ করিয়া থাকেন। ঐ নিত্য শব্দই "নাদব্রহ্ম" রূপে প্রকাশিত হইয়া যোগাকাঙ্ক্ষীকে কৃতার্থ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অমানুষী জ্যোতিচ্ছটায় কি যে এক অতুলনীয় স্বরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়, তাহা বর্ণনাতীত, উহা যোগী ভিন্ন কে দেখিবে? অতি সত্য যে, নিত্য শব্দ পার্থিব শ্রুতিতে শুনা যায় না বটে কিন্তু উহা অব্যক্ত শ্রুতিতে শুনা যায়। যখন শব্দ আছে—তখন বাক্যও আছে—বস্তুতঃ উহাকেই আত্মার বাঙ্ময় রূপ কহে। নিত্যকাল ঐ "অহমস্মি" মহাশব্দের সহিত নাদব্রহ্মরূপ জড়িত রহিয়াছে। অসীম আকাশ মণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য, অসংখ্য নক্ষত্র সকল কোন রূপের শক্তিতে স্থিতি করিতেছে? স্থূল রূপে কি ঐ সমূহ গ্রহ-উপগ্রহকে ধরিয়া রাখিতে পারিত? উহারা সেই নিরাকার নাদব্রহ্মের অব্যর্থ নিয়মে যে আবদ্ধ! নিজ নিজ কক্ষ হইতে তিলার্দ্ধ স্থান টুকও সরিয়া যাইতে সাধ্য নাই। আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, ইহার মূলে অনন্ত পূর্ণ শক্তিময় আত্মা কি আমাদের মত ক্ষুদ্র—না, জরামরণের অধীনে

আছেন ? তিনিই-ত জগৎ সমূহে জান্তব-লীলা-তরঙ্গ, দেখাইতেছেন ! মানবাদি প্রাণিসকলের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জল-স্রোতের ন্যায় আসিতেছে, যাইতেছে, এইত দৈহিক লীলার বিচিত্র চিত্র ! আর ত উন্মাদিনী ভক্তির তীব্র তাড়নায় প্রকৃত সত্যকে পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। সমস্ত জগৎকে একত্র করিলে অনন্তের মধ্যে একটী উপল খণ্ডে পরিণত হয়, উহারই আশ্রয় লইয়া সময় নষ্ট করা কি শ্রেয়ঃ ? ঐ যে প্রাণের ভিতরে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এক আত্মাতেই নিরাকার রূপের জ্যোতিঃ বিকাশ পায়। আহা ! সেই অনুপমের জ্যোতিচ্ছটায় যোগিদিগের হৃদয় যখন আলোকিত করে, তখন যে তাঁহারা মর-জগতের অতীত স্থানে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন এবং স্বর্গীয় সুধাপানে বিহ্বল হইয়া যান। তাঁহারাই ত চিন্ময় মহামণ্ডলে প্রবেশ করিয়া স্বরূপ-সিন্ধুর অতল তলে স্থান পান ! তাঁহারাই ত মহাপ্রাণতার গূঢ় শক্তি গ্রহণের অধিকারী ! তাঁহারাই ভ্রম-বিকার-মুক্ত মহা তেজস্বী যোগী অথবা পরমহংস ! তাঁহাদের যোগ-সাধনের অভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রান্তি-কলুষিত মলিন প্রাণ কি জাগিবে না ? অসার মতের গণ্ডি ভেদ পূর্ব্বক সার তত্ত্বের অন্বেষণে কি তৎপরতা বাড়িবে না ? দ্বেষ-হিংসা-হর্ষাদি দলিত ঘৃণিত শরীর সত্যাগ্নি-পূত ঐ অগ্নিবর্ণে পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইতে কি সুযোগ হইবে না ? প্রতীচ্য-ভাব-কলুষিত সংসার, প্রাচ্য নীতির পবিত্র বলে যোগধর্ম্মের অভাব দেখিয়া কি কাঁদিবে না ? উদার ভাবের সংঘর্ষণে অনুদার স্বার্থ-ভাব কি পৃথিবী হইতে যাইবে না ? প্রভু-ত্বের বীরত্বে বিনয় নম্রতাদির মধুর আপ্যায়ন শিক্ষার নিমিত্ত গর্ব্বিত মন কি একটু নরম হইবে না ! তাই বলিতেছিলাম, ধর্ম্ম কোনরূপ কল্পনা-শৃঙ্খলে বদ্ধ নহে, অনন্তকাল উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ধর্ম্মের পথ মুক্ত। ইহাকে যুক্তি-জালে চাপিয়া রাখিলেও বাধা মানিবে না। অগ্নি যেমন শত খণ্ড বস্ত্রে আবৃত হইলেও ক্ষণ মধ্যে বহু শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই ধর্ম্মও বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে পরাঙ্মুখ নহে, এবং ঐ যুক্তি জাল ছিন্ন করিয়া উজ্জ্বল ভাবে উন্নতির পথে চলিবেই চলিবে।

অতঃপর সেই জীবন্ত ধর্ম্ম সাধনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে, মহাপ্রাণতার মধুর আলিঙ্গনে পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায় ! স্বতঃই বিশ্বপ্রেম প্রাণকে অধীর করিয়া তুলে। আর আভিজাত্যের অভিমান, বিদ্যার অহঙ্কার, ধনের গর্ব্ব-গরিমা কিছু মাত্র থাকে না। দেব-চরিত্রে জীবন অত্যুজ্জ্বল শ্রীধারণ করে ! শত মণিপ্রভা-বিনিন্দিত আধ্যাত্মিক মহজ্জ্যোতিতে যোগ-শরীর আকৃষ্ট

হইলে, দীনতার পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়। তখনই দেব-প্রদত্ত অশ্রু-সুধায় যোগীকে ডুবাইয়া দেয়। চকিৎ মধ্যে, সৎচিৎ আনন্দ রূপের একত্ব—নাদ ব্রহ্ম; তাঁহারই পূর্ণ সত্তা হইতে ঘন চৈতন্যমমৃতম্ ইত্যাদি রূপ, একই আত্মার প্রকার ভেদেও অখণ্ড রূপই অনন্ত কাল প্রকাশ পায়। আহা! ব্রহ্ম-তত্ত্ববিৎ ঋষিগণের প্রাণে যখন শান্তস্বরূপের নির্ম্মল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, মনে যখন প্রেম-স্বরূপের অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস বেগে বহিয়া যায়, হৃদয়ে যখন শিব স্বরূপের মঙ্গলময় স্নিগ্ধ উল্লাস জাগিয়া উঠে, তখন কি তাঁহারা ঐ সকল স্বরূপকে ক্ষুদ্র বা সীমায় আবদ্ধ দেখেন? কখনই না! শিবঃ শান্তিঃ প্রেম যে স্বরূপই হউক, সকলই নিরাকার অসীম-প্রসার স্বরূপ-বারিধি! যোগিগণের নিষ্কাম প্রার্থনার বলে, উপর্য্যুক্ত রূপসমূহ হৃদয়েই প্রকটিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা সমস্তই একাত্মাময় সেই "আনন্দরূপমমৃতম্।" তাঁহারা তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পলককালের নিমিত্ত দর্শন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন না! অভেদ মহা মিলনে অনন্তব্যাপী আত্মার রূপ-সাগরে একেবারে ডুবিয়া যান। নিমেষ কালের জন্যও সেই অমৃত তরঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন না।

অষ্টম উল্লাস।

ধ্যান।

অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি গাঢ় অভিনিবেশ ও অবিচ্ছিন্ন চিন্তাশক্তি প্রবল হইলে ধ্যানীর মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি পরিস্ফুট হয় এবং অসীম অব্যয় অনাদি নিত্য-চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভের নিমিত্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। সেই চিন্তাই ধ্যান নামে অভিহিত। মানবের পার্থিব বিষয়িনী চিন্তা চলিয়া গেলে, ঐ বিশুদ্ধ ধ্যানই যোগের অঙ্গীভূত হইয়া বিশেষ সাহায্য করে। বস্তুতঃ ধ্যানের স্বাভাবিক গতি চিন্ময় সত্তায় আকৃষ্ট! এজন্য উহা যোগারূঢ় ব্যক্তির অনুকূল পথপ্রদর্শক। যাহা হউক, এক্ষণে ধ্যানের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা আবশ্যক। আপাততঃ ধ্যানের চারিটী লক্ষ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। প্রথমটী পরিমিত স্থূল বস্তু—দ্বিতীয়টী অনন্তব্যাপী আকাশ—তৃতীয়টী অখণ্ড অন্ধকার—চতুর্থ টী স্বাভাবিক। অনেকেই ধ্যান ধারণার নিমিত্ত,বলিতে কি, একটী শিলা খণ্ডকেও ঈশ্বর চিন্তার স্থিতির কারণ বুঝিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ চিন্তা বা ধ্যানে আত্মার সম্যক স্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করা অসম্ভব। কেননা অসীম বারিধিকে একটী ক্ষুদ্র পল্বলে দর্শন যেমন নিশ্চিত নহে, তেমনি স্থূল বস্তুতে অনন্ত প্রসার নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ—ইহাও সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এখানে একটী যুক্তি জ্ঞানের কথা বলিতেছি। আমি যদি অকূল সমুদ্রের জল একটী ধাতু বা মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া সেই অসীম সমুদ্রকেই চিন্তা করি, তাহা হইলে আমার সম্যক সমুদ্রের ভাবটী গ্রহণ করা হইবে কি না? ঈদৃশ যুক্তি জ্ঞানের মূলে আপনি মুক্ত জ্ঞানের প্রভাবে এই উপদেশ কি দিতে পারেন না? যে ব্যক্তি কখনও সমুদ্র কেমন দেখে নাই, সে পাত্রস্থিত অত্যল্প কালো জল ভিন্ন আর কি দেখিবে? যিনি অকূল সমুদ্রকে দেখিয়াছেন, তিনি ঐ ক্ষুদ্র পাত্রস্থিত জলে তৃপ্ত হইবেন কেন? তবেই বলিতে পারা যায় যে, চিন্তা-শক্তিও তরলাকারে বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করে। যে কোন পাত্রে তরল বস্তু যাহাই কেন রাখুন না, উহা নিশ্চয়ই পাত্রটীর আকৃতি ধরিবেই ধরিবে। স্থূল ভাবের চিন্তাটীও তদনুরূপ অবস্থায় আবদ্ধ হয়। আবার,এটিও সত্য যে, পাত্রের প্রতি দৃষ্টি না পড়িলেই ত ঐ অসীম সমুদ্র মনে পড়িবে। তবে আর কাঁটালের আমসত্তের প্রয়োজন কি? ঘট ভাঙ্গিয়া

গেলে ত আকাশই থাকে, কিন্তু উহাকেও ভেদ করিয়া ধ্যানের ঊর্দ্ধ গতির বিরাম নাই। মহা মনস্বী ঋষিপুঙ্গবগণের বিধানে ঐ শূন্য তত্ত্ব ক্ষিপ্তাদি তত্ত্বের সংজ্ঞায় স্থিরীকৃত হয়, তথাপি উহা অসীমত্ব নিবন্ধন অখণ্ড অন্ধকারের-বহন ভার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ঐ অন্ধকারই ধ্যানের প্রকৃষ্ট অবলম্বন একথা নিতান্ত অসার নহে। কারণ, অন্ধকার মধ্যে কোনরূপ পার্থিব প্রত্যঙ্গের ছায়া ছবি পড়িলেও তাহার শক্তি দুর্ব্বল—এজন্য ঐ নিবিড় অন্ধকার মধ্যে যাহাই কেন পড়ুক না, সকলি তাহার ঘন-নীলিমায় বিলীন হইয়া যায়। ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানীগণ অন্ধকারকেই ধ্যান ধারণার সহজ উপায় মনে করেন।

বহির্জগতের পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে সমদৃষ্টির অসামঞ্জস্যজনিত চিন্তা-শক্তি বিভিন্ন বস্তু ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ঋষিরা বহিশ্চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি অন্তর্জগতে অসীম মহাশক্তির ভিতরে লইতে উপদেশ দেন। সুতরাং বাহ্য চক্ষু দুটী মুদ্রিত করিলে, জাগত বস্তু সমূহের বিক্ষিপ্ত চিন্তা অনেকটা উপশমিত হইয়া ধ্যানীর নির্ম্মল ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু মনের বহিশ্চিন্তার প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকিলে, ফটো যন্ত্রে যেমন কাচ খণ্ডে পশু, পক্ষী, মানবাদির প্রতিকৃতিটী পড়িবে, তেমনই ধ্যানীরও হৃদয়-ফলকে ঘটাদি বা কোনরূপ আকৃতির আদর্শই হউক ঐ সকল পরিমিত দৈহিক ছবিগুলি অঙ্কিত হইবেই হইবে। তবেই দেখুন, যে বস্তু সমূহ ধ্যানের চরম সীমায় উপস্থিত হইতে বিঘ্ন সংঘটন করে, তাহারই সাহায্য লইয়া ধ্যান সাধনে একান্ত অনুরক্ত হওয়া যেন সময়পাত বলিয়া মনে হয়। আবার এটিও একটু বুঝিবার কথা যে, উক্ত প্রকার বস্তুগত ধ্যান ধারণা চিত্তের একরূপ শিক্ষা-সোপান হইলেও, ইহা বিশ্বাস বা স্বীকার করিলে ইহাতে একটী ভাবিবার বিষয় এই যে, পরিণাম পরিত্যজ্য আকার বিশিষ্ট যাহাই হউক, উহা সকলই আপাত তৃপ্তির উপায় মাত্র। অতএব প্রথম হইতেই যদি অনাবৃত মুক্ত জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া যায়, তাহা হইলে, ভাবী বর্জ্জনীয় বস্তুর আসক্তির আকর্ষণে জড়িত হইতে হয় না এবং অল্প সময় মধ্যেই অভ্রান্ত সত্যের উজ্জ্বল পথে প্রবেশ শক্তি জন্মে।

বিশুদ্ধ ধ্যানের সূক্ষ্ম পথে চলিলে, ধ্যানীর মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি—স্ফটিকস্তম্ভবৎ স্থির থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, পৃথিবীর কোন প্রকার স্পৃহনীয় পদার্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, বিপদাশঙ্কা অতি নিশ্চিত। বিন্দুমাত্র বহির্বাসনার উত্তেজনা থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু সাধনের প্রাপ্ত বস্তু ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইবে। বস্তুতঃই

ধ্যানের পথ "ক্ষুরধার" সদৃশ। বড়ই সতর্কতার সহিত চলিতে হয়। তাই বলিতে-ছিলাম, অনিত্য ভোগ প্রয়াসী প্রবৃত্তি সমূহের প্রলোভন হইতে মুক্ত না হইলে, ধ্যানের দৃঢ়তা জন্মে না এবং অন্তঃকরণের মহদ্ভাবগুলি মলিন হইয়া যায়। অল্প সময় মধ্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে জগতের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে শুভ চিন্তা সমুদয় চলিয়া যায়। পার্থিব প্রীতির মধুর আপ্যায়িতে প্রাণকে উন্মত্ত করে, দেখিতে দেখিতে দুর্ভেদ্য মোহ জালে বদ্ধ হইতে হয়, তখন দুষ্প্রবৃত্তির বল এতই প্রবল হইয়া উঠে যে, উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায় থাকে না। ধ্যানীর উন্নত অবস্থা দুরবস্থায় পরিণত হইতে তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব হয় না। ঈদৃশ শোচনীয় সময়ে কেবল নিরাশার ভীষণ মুখটী দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন-রূপ সহায় সুলভ সাধু সঙ্গের কথাটীও শুনা যায় না। ধ্যান-শত্রু অলসতা, জৃম্ভনাদি-রাও সেই সময় ঘন উৎপীড়ন দ্বারা ধ্যানীকে বিপথগামী করিতে ত্রুটি করে না। তখনই কুচিন্তা-প্রসূত বিভব-ইচ্ছা, অপ্রিয়-রুচি, অসার লালসা এই সমস্ত এক একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ উপর্য্যুপরি অন্তরে অনবরত ছুটিতে থাকে ও তাহার ধ্যান-মগ্ন আকাঙ্ক্ষাকে শুষ্কতার ভিতরে ফেলিয়া দগ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। সুতরাং শম, দম, তিতিক্ষা, ধৃতি প্রভৃতি, ইহারাও ঐরূপ দহন-যাতনায় অধীর হইয়া ধ্যানের গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করে। ধ্যানীর হৃদয় সরসীর স্বচ্ছ ভাবটুক অসার আসক্তির আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া যায়। আর সেই বিশুদ্ধ চিন্তার স্থির গতি উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, পৃথিবীর মোহময় প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তজ্জন্য মনেরও দুরাকাঙ্ক্ষা সমূহ ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতে থাকে। সুতরাং ধ্যান-পথ উজ্জ্বল করিবার কোনরূপ সুবিধা ঘটে না। তখন অন্তঃকরণে বিষয়-মুখিনী চিন্তা প্রবেশ পূর্ব্বক ধ্যানীর নির্ম্মল প্রকৃতিকে সংসারের স্বার্থ-কলঙ্কে কলুষিত করে। কিছুতেই পূর্ব্বানুরাগের স্মৃতিতে ধ্যানীর নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় স্থির চিন্তাটী পুনঃ গ্রহণের নিমিত্ত উদয় হয় না। ঐন্দ্রজাল ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখস্রোতই প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করে। এইরূপ বিপদ কালে ধ্যানীকে বড়ই সতর্ক থাকিতে হয়। এমন কি, কণামাত্রও স্বার্থ-ছায়া যেন প্রাণকে স্পর্শ করিতে না পারে। ধ্যানী ঈদৃশ ঘোরতর সঙ্কটাবস্থাতেও যদি "ভগবদ্রুচি" জাগ্রত করিয়া শুভ প্রবৃত্তি সমূহ স্ববশে রাখিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্যানের বিঘ্নকারী শত্রু সকল যতই কেন প্রবল হউক না, ঐ রুচি শক্তি প্রভাবে আশার আলো জ্বলিবেই জ্বলিবে। এবং অভীষ্ট চিন্তার উজ্জ্বল পথ পরিষ্কার দৃষ্ট হইবে। অজস্র ধ্যানের মধুর ভাবে প্রাণকে নিমজ্জিত করিবে,

কোন প্রকার বিপদ বিড়ম্বনার বিঘ্নমাত্রও থাকিবে না। ধ্যানের ঊর্দ্ধ গতির পথ রোধ-আশঙ্কা ঘুচিয়া যাইবে, মনের উল্লাস ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

যাহা হউক, ইতঃপূর্ব্ব ঘটাদি পরিমিত বস্তু মধ্যে যে ধ্যান ধারণার অপূর্ণতার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটী কথা বলিবার আছে। অবশ্যই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পরিমিত পদার্থ অর্থাৎ দারু, ধাতু, শিলা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তি সকলেরও সামঞ্জস্য হইতে পারে। যেমন শ্বেত, পীত, লোহিতাদি পুষ্প নিচয়ের পৃথক্ পৃথক্ রূপ সত্ত্বেও উহাদের সৌগন্ধের তৃপ্তি এক—তেমনই যিনি যে কোন বস্তুর উপর ধ্যান ধারণা করুন না, মূলে ইষ্ট চিন্তার ত বিভিন্নতা কিছু নাই। এই যুক্তি মুগ্ধ মীমাংসার স্থলে কোন কথা না থাকিলেও এটি কি বলিতে পারা যায় না যে, চম্পক এবং গোলাপ পুষ্পের বর্ণাকৃতি ও সৌন্দর্য্যের নিশ্চয়ই তারতম্য আছে—আবার উভয়ের গন্ধেরও উগ্রতা,তীব্রতা,স্নিগ্ধতা,মিষ্টতা বেশ অনুভব করা যায়। আরও দেখুন,ঈশ্বরের অব্যর্থ ইচ্ছা শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে স্পষ্টই জানা যায়, অগ্নি ও তুষারের সমন্বয় করিতে গেলে, কখনই অগ্নির দহনশক্তি ও তুষারের শৈত্যগুণকে একত্রীভূত করা যায় না। কারণ উহা অখণ্ডনীয় ঐশী শক্তির ব্যাপার। অবশ্যই আমরা বুঝিব যে, খণ্ড অখণ্ডে সামঞ্জস্য ক্লীবের সন্তান বাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ভেদ-সঙ্কুল ও পরিমিত সঙ্কীর্ণ বস্তুর আশ্রয়ে ধ্যান ধারণা একটু চিন্তারই কথা! ঈশ্বর যদি অনন্ত ব্যাপী হন, তাহা হইলে খণ্ডাকারে ধ্যানাভ্যাস দ্বারা তাঁহার পূর্ণ সত্ত্বার ভিতরে প্রবেশ ইচ্ছা কত দূর সম্ভব জানি না। বাস্তবিক ঐরূপ খণ্ড বস্তুতে ধ্যান সাধন প্রাথমিক শিক্ষার বিধান হইলেও যখন উহা পরিত্যজ্য তখন আরও একটু ঊর্দ্ধে উঠাই:সম্ভবতঃ সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রজ্ঞা চক্ষুতে দেখিলে সসীম তত্ত্বে ধ্যানের শক্তি সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হওয়া কি অসম্ভব নহে? উহাতে কি চিন্তার অবিশ্রান্ত গতি সীমায় আবদ্ধ হয় না? অনন্তের ধারণাও যে পার্থিব তত্ত্বের অতীত। সেই জন্যই ঐ শূন্য সম্পূর্ণ অখণ্ড অন্ধকারকে অবলম্বন করিলে দোষের হয় না। অন্ধকারও দুইটী ভাগে বিভক্ত। একটী স্থূল অপরটী অস্থূল। আমরা পার্থিব চক্ষে যে অন্ধকার দেখি, উহা পরিমিত তত্ত্বের ছায়া-বহিরন্ধকার! আবার অন্তশ্চক্ষুতে হৃদয়াকাশ ঘন তিমির পূর্ণ যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাই অখণ্ড অন্তরান্ধকার—স্থূলে আকৃষ্ট নহে। তন্নিমিত্তই উহা ধ্যানের অঙ্গীভূত। কেননা অসীমাত্মার খণ্ড বস্তুতে কতদূর স্থিতি সম্ভব একটু চিন্তারই বিষয়। তাঁহার পূর্ণ প্রসার সম্যক শক্তির যখন কোটী কোটী জড় জগতেও বহন করিতে সমর্থ

নহে, তখন অনন্তের ধারণা অসীম অন্ধকারই যেন সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐশী শক্তিতে তিমির রহস্য কি গূঢ়! ইহা অতি নিশ্চিত যে, সিদ্ধ যোগীর হৃদয় তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম! তাহার কারণ এই যে, ধ্যান যোগীর অন্তশ্চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিও অনন্তে মিশিয়া যায়, সুতরাং সেই মুক্ত পুরুষের হৃদয়াকাশে আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব ধারণা হইবে আশ্চর্য্যের কথা কি?

ধ্যানীর গভীর ধ্যানে যে হৃদয়াকাশ মহাকাশ একই তত্ত্ব! বহিশ্চক্ষু যুগল মুদ্রিত করিলে অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়া উঠে—যে চক্ষুতে সেই অখণ্ড অন্ধকার দৃষ্ট হয়। তখন সেই শূন্য তত্ত্বও ঐ অনন্ত প্রসার ঐশী অন্ধকারের অতল তলে ডুবিয়া যায়। উক্ত ধ্যান-সুহৃৎ অসীম আঁধারকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিলে দেখিবেন, পরিমিত পার্থিব পদার্থ সমুদয় উহার ভিতরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় মনের সসীম সঙ্কীর্ণ ভাব গুলি আর থাকে না। ধ্যানের সুদৃঢ় শক্তি আত্মার সহিত একীভূত হইবার জন্য জাগিয়া উঠে। ধ্যানীর মস্তিষ্ক-ভেদী সুবিমল অব্যাহত চিন্তায় অনবরত উল্লাস উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। ঐ কজ্জল-নিন্দিত ঘন অন্ধকার মধ্যে ধ্যানের ঊর্দ্ধগতির বিরাম নাই। মুহুর্মুহু ধ্যান যোগীর অন্তরস্রু গঙ্গানদীর ন্যায় শতধারায় যেন অসীমান্ধকার রূপ সমুদ্রের ঐ তিমির-তরঙ্গে মিশিবার নিমিত্ত সবেগে ছুটিতেছে। কোনও রূপ পার্থিব প্রলোভন বা অসার আসক্তির কণা মাত্রও থাকেনা। চন্দ্র, সূর্য্য, অসংখ্য তারকা সকল সেই গভীর অন্ধকারের অতল তলে বিলুপ্ত—অন্য কোন সাড়া শব্দ নাই। কেবলই অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার! একমাত্র আঁধার পাথার ভিন্ন আর কিছু দৃষ্ট হয় না—অধঃঊর্দ্ধ, অন্তর বাহির একাকার! মাঝে মাঝে মহদ্ভয়ের ভীষণ ভাবটী দেখা দেয় মাত্র। তখন ধ্যানী আকুল প্রাণে স্তম্ভিত চিন্তার তীক্ষ্ণ তরঙ্গে পড়িয়া অত্যন্ত ভীত, বিপদগ্রস্ত হইয়াও কিন্তু ধ্যান-সূত্রটী ছাড়েন নাই। ঘন ঘন পরীক্ষার নানা প্রকার উত্তেজনা সকল পড়িতেছে দেখিয়া ধ্যানী নির্জ্জনতার ভিতরে একাকী বড়ই ভয়-বিহ্বল হন। ঐ সময়ে মৃদু হইতেও মৃদু—মধুর হইতেও মধুর শব্দে "অহমস্মি"—"আমি আছি ভয় নাই। ভয় নাই!" কথা কহিয়া কে যেন আশ্বাস দিতে থাকেন। ধ্যানী বিস্মিত হইয়া ঐ অন্ধকারের আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুর অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ধ্যান শক্তি একমাত্র ঐ অখণ্ড অন্ধকারকেই ধরিয়া রহিল। ক্ষণ কাল মধ্যে উক্তরূপ মৃদু মধুর ভাষায় কথা আসিল যে, "আমি চিন্ময়ী মহাশক্তি—এই আমার

সর্ব্বব্যাপিনী মহাকালী রূপ। * মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ সাধকের হৃদয়ে মাতৃ ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকি। বিচার জ্ঞানবাদী স্থূল যোগীরা আমাকে কল্পনায় খণ্ড রূপে দর্শন করে, উহা প্রকৃত দর্শন নহে।" এই রূপ অনাহত ধ্বনিতে ধ্যানীর ভ্রান্তি আবরণ সমূহ দূরীকৃত হইল। নিরাকার মহাকালী রূপ দর্শনে আর সন্দেহ রহিল না। প্রাণভেদী আনন্দলহরী শাশ্বত প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইয়া এতই বেগে বহিতে আরম্ভ করিল যে, ধ্যানীর চিন্তা শক্তি টুকুও তাহাতে ডুবিয়া গেল। কেবল মা—মা—মা ভিন্ন আর কোন কথা নাই। ঐ অনিবার্য্য অন্তরশ্রুর মহাবেগ সংবরণ করিতে অবসর থাকিল না। ধ্যানী সেই অসীমান্ধকার রূপিনী মহাকালীর অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইলেন।

অপিচ, ধ্যান সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলিয়া রাখি। ঋষিরা ধ্যান সাধনের সময়োচিত বাহ্য প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া মনের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা নিবন্ধন কতকগুলি উৎকট নিয়মেরও অবতারণা করেন। বৈদিক কালে অন্নময়, প্রাণময়, প্রভৃতি কোষ ভ্রমণ ও তাহাতে স্থিতি সম্ভব হইলে ধ্যানের সাধন সিদ্ধ হইত। পৌরাণিক সময়ে কোনরূপ বস্তুতে ঈশ্বর-কল্পনা করিয়া ধ্যান ধারণার উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়। তান্ত্রিক কালে ষট্চক্র অর্থাৎ পদ্মকোষ বিধানে নাসিকা পথে শ্বাস প্রশ্বাসকে স্তম্ভণ, রেচক, পূরক, এই ত্রিবিধ ক্রিয়া দ্বারা মনের চাঞ্চল্য ঘুচাইবার জন্য প্রাণায়াম অবলম্বন করা বিধেয়। বস্তুতঃ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে চিত্তের অস্থিরতা বা অসহিষ্ণুতা দূরীকৃত হয় এবং ঈশ্বরে নির্ভর ও অনুরাগের স্পৃহা প্রবল থাকিলে সিদ্ধমনোরথ হইয়া ধ্যানের দ্বারে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইলেও কিন্তু স্বাভাবিক সাধনের মূল উপদেশই এই যে,শারীরিক বাহ্য নিয়মের অতীত নিরাকার নির্ব্বিকল্প নিরাময় নিখিল নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা ! এবং শরীর নিগ্রহ অর্থাৎ কোন প্রকার অস্বাভাবিক প্রকরণের অধীনে আকৃষ্ট হইলে, উহার পরিণাম নিষ্প্রয়োজনীয় ও ফলপ্রদ নহে—ইহাই ভাবিয়া পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ শরীরটী অবশ্যই সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইলেও উহা এক অসীম চিন্ময় শক্তিতেই পরিচালিত হয়,

---

* দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার—কামাদি রিপুগণ অসুর নামে অভিহিত হয়, ইহারা যোগ-অসিতে ছেদ্দিত হইলে, শিবস্বরূপ পরমাত্মাই মহাশক্তি রূপে মাতৃ ভাবে প্রকাশ হন। এই ভাবটী লইয়া ঐ দ্বেষাদি ও রিপুগণের মস্তকে মুণ্ড মালা এবং শিবের উপর কালী মূর্ত্তির আরোপ করা হইয়াছে।

সুতরাং সেই ঐশী শক্তির প্রতিই প্রাণ, মন, হৃদয় অর্পণ করিতে পারিলে, আর বাহ্য সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। বায়ু নিরোধ দ্বারা অনায়াসে শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারা যায় সত্য—এইরূপ প্রক্রিয়া-জনিত নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনায় জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতেও দেখা যায়—অন্তঃধৌত করিয়া দীর্ঘায়ু হওয়াও অসম্ভব নহে—কিন্তু এই সকল সাধনানুষ্ঠানে মনের সহিত ঈশ্বরানুগত্য কতদূর সম্ভবপর, তাহা বাস্তবিকই একটু চিন্তার বিষয়! এই সমূহ ব্যাপারে প্রত্যক্ষতার মূলেও নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারা যায় যে, মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভালবাসার দৃঢ়তা চাই। ক্ষীণকণ্ঠ শিশু যেমন মাতৃক্রোড় হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত হইলে কাঁদিয়া আকুল হয়, তেমনই ঐ স্বাভাবিক ভালবাসার আকর্ষণে অশ্রুপাত করিলে, বাহ্য প্রক্রিয়ার আর প্রয়োজন থাকে না, মহৎ আকাজ্ক্ষা আপনা হইতেই মানস-ক্ষেত্রে গজাইয়া উঠে। অল্প সময়েই ধর্ম্ম-বৃক্ষ বিবিধ শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া শান্তির সুমধুর ফল প্রদান করে। ইন্দ্রিয়াদির কঠিন পরীক্ষা হইতেও নিষ্কৃতি পায় এবং সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিতে সক্ষম হয়।

পুরাণ ও তন্ত্র-মতের সাধন-প্রণালী অধিকাংশ বিজ্ঞানে পরিস্ফুট—এজন্য শারীরিক শক্তির আবশ্যক। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনেরও শক্তি দুর্ব্বল হয়। এই কারণে, স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্যসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকেই চেষ্টা করেন। মস্তিষ্কে ঐ পদ্মকোষভেদী প্রশ্বাসের প্রখর গতিতে আবার ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না নাড়ীত্রয়ের সূক্ষ্মদ্বার-প্রবিষ্ট বায়ুর সহিত চিন্তা-শক্তি একীভূত হইলে, মনের আর এদিক 'ওদিক হইবার উপায় থাকে না। সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলও বশীভূত হইয়া মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। বস্তুতঃই শরীরটী বিজ্ঞান ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে আধিব্যাধির যাতনায় আক্রান্ত না হইয়া স্বাস্থ্য সুস্থ ভাবে মনের একাগ্রতার বল প্রবল করিয়া দেয়—এ কথা অতি নিশ্চিত। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেও অতি সহজ উপায় দেখা যায় যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের বল ততোধিক পরিস্ফূরণ করে। যতই ঈশ্বরানুরাগ ও রুচিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা প্রবল হইয়া উঠিবে। তখনই চিন্তাশক্তি ব্যাকুলতার ক্রোড়ে বসিয়া ঐশী ভাবে নিমজ্জিত হইলে, আর কাহারও সাহায্য লইবার প্রয়োজন থাকেনা। ভগবদ্ব্যাকুলতার ঘন উত্তেজনায় শ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবতই রুদ্ধ হইয়া যায়। মন অবিচ্ছেদ পূতপ্রেম

সম্পৃক্ত ব্রহ্মশক্তিতে জড়িত হইলে, তখন তাহাকে আধি ব্যাধি স্পর্শও করিতে পারে না, দেব ভাবে মহাতেজ ধারণ করিয়া অন্তর্জগতে অমৃত তরঙ্গে সন্তরণ করিতে থাকে।

এখন ধ্যানের চতুর্থ লক্ষ্য স্বাভাবিক—তাহারই একটু চিন্তা করা যাক্। নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, স্বাভাবিক ধ্যান সাধনে কোন প্রকার আকার-বিশিষ্ট স্থূল তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না, বিশেষতঃ পরিমিত পদার্থের ছায়া ধরিবারও সুযোগ থাকে না। কেন না, পূত-চিন্তা-প্রসূত অকৃত্রিম ব্যাকুলতা ও বজ্রভেদী অনুরাগের উত্তেজনায় মনের বাসনা-বিমুগ্ধ ভাবগুলি একবারে চলিয়া যায়। অবিক্ষুব্ধ চিন্তার অব্যাহত গতির সম্মুখে কি কোন প্রলোভন-জড়িত ধ্যান-ব্যাহন্তা আসিয়া তিষ্ঠিতে পারে? চকিৎ মধ্যেই যে অনলে পতঙ্গ পতনের অবস্থায় পরিণত হয়। আহা! সেই বিশুদ্ধ চিন্তা-শক্তি চিন্ময় মহামণ্ডলের গমন-পথ উজ্জ্বল ও প্রশস্ত করিয়া দিলে ধ্যানীর জ্যোতিশ্চক্ষু পরিস্ফুট হইয়া যায়, তখনই তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিঃ জাগিয়া উঠে। ধ্যানী ঐ অনন্ত আলোকের মধ্য হইতে প্রাণ-মুগ্ধ অমৃতোপম আশ্বাসবাণী শুনিয়া মত্ততার বেগ ধারণা করিতে অসমর্থ হন। এক মাত্র অনুপমেয় অব্যক্ত অমানুষী জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পান না। পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড অন্ধকারময়ী মাতৃরূপটী অন্তর্হিত হইলে পর, আবার তখনই (অসীম জ্যোতির্ম্ময়) পিতৃরূপে আশ্বাস প্রদান দ্বারা ধ্যানীকে প্রকৃতিস্থ ও উল্লাস-তরঙ্গে ভাসাইয়া কৃতার্থ করেন। ঐ স্বাভাবিক ধ্যানে কোন বস্তু বা শাস্ত্র-সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয় না, একমাত্র পরমাত্মার চিন্ময় সত্তার উপর নির্ভর সাপেক্ষ।

এইরূপ অবিচলিত নির্ভর বলে ধ্যানের লক্ষ্য স্থির হইলে, অজস্র ধারায় স্বর্গীয় পীযূষ বর্ষিত হইতে থাকে। ধ্যানী সেই স্বর্গীয় সুধা পানে দেব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া ঐ জ্যোতির্ম্ময় মহামণ্ডলের মধ্য হইতে মাভৈঃ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাজ্ঞানের পরিস্ফুরণে তদ্দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, কোটি কোটি বিশাল বিশ্ব-সমূহ বিন্দুতুল্য রূপে অনন্ত ব্রহ্মসিন্ধু মধ্যে ফেন খণ্ডে পরিণত হইয়া কোথায় চলিয়া যায়—বিকার-কলুষিত পার্থিব দেহটিকেও তদনুরূপই মনে করেন। সত্য সত্যই সাধনসিদ্ধ ঐ দেবশরীরস্থিতপ্রাণ, এতই বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত হয় যে, সর্ষপ-সদৃশ স্থূল তত্ত্বকেও দর্শনের বিঘ্নাবরণ বলিয়া বোধ হয়। নিরব-চ্ছিন্ন নির্ব্বিকল্প নিষ্কলঙ্ক নিরাকার নিত্য চৈতন্যের পূর্ণ শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু দৃষ্ট হয় না। মহাজ্ঞানের প্রভাবে তখনই আত্মার পূর্ণ শক্তির প্রকার-

ভেদ সন্তানত্ব—এই ভাবাদ্বৈত-দ্বৈতের গূঢ় তত্ত্ব পিতা পুত্র বা সেব্য সেবক কিম্বা উপাস্য-উপাসকের মূল মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে শক্তি জন্মে এবং মহা ভাবের আবির্ভাবে মহা মিলনের পথ অন্তশ্চক্ষুতে ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়। ধ্যানী তদবস্থ সময়ে পিতৃ-আনুগত্যের মধুর ভাবোচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া পড়েন। অভ্রান্ত সত্যের উপদেশে ঈশ্বরের নিরাকার শক্তির যে জড়ে অস্পর্শ ভাব অথচ চৈতন্যলীলার বাহ্য দর্শন ক্ষণ স্থায়ী—ইহা তাঁহার চিত্ত-পটে মুদ্রিত হইয়া যায়। তখন আর চৈতন্যের সহিত জড়তত্ত্বকে লইয়া টানাটানি করিবার স্পৃহা হয় না। একমাত্র অনন্তব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পিতৃসত্তার গভীর প্রদেশে প্রবেশ লাভে অন্য কোনও পদার্থের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। এবং কোনরূপ বাহ্য আকাঙ্ক্ষাও থাকে না।

আহা! সেই অতুলনীয় অক্ষয় অব্যক্ত জ্যোতিঃ যিনি একবার প্রজ্ঞা-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি কি কখন সসীম বিশ্ব-কন্দুক লইয়া খেলা করিতে ইচ্ছা করেন? তাঁহার মন যে, "মৌলিকুম্ভ পরিরক্ষণ ধীর্ণ টীর" নর্ত্তকীর ভাবে পরমেশ্বরের অনন্ত স্বরূপ-সত্তায় মজিয়া যায়। এই অবস্থাতেও ভাবা-দ্বৈত-দ্বৈতের বিঘ্ন হয় না, কেন না, ধ্যানের পরপারেই মহা মিলন যোগ। এখানে কেবল অখণ্ড অনুপমেয় জ্যোতির্ম্ময় মহা সিন্ধু মধ্যে পিতৃত্ব ও সন্তানত্ব শক্তি ও ভাবের ঐকান্তিক দৃঢ়বন্ধনে সেই মহজ্জ্যোতির অতল তল হইতে অনাহত গভীর অথচ মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধ্যানীর চিত্ত এতই উৎসাহিত এবং বিহ্বল হইয়া যায় যে, পিঞ্জর-মুক্ত শুক পাখীর ন্যায় সেই জ্যোতিরাকাশে ছুটিতে থাকে। ধ্যানী তখন ঐ উজ্জ্বল আলোকের ভিতরে প্রবেশ করতঃ, অমানুষী তত্ত্ব সকল পরিজ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হন—আনন্দের সীমা থাকে না। সেই ধ্যান-মগ্ন-প্রাণ-মুগ্ধ সময়ে, কখন শুদ্ধাভক্তি অভেদ সেবার সহিত সেব্য-সেবকের মহোচ্চ ভাবের তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, কখন প্রেমাকাঙ্ক্ষী প্রীতি নির্ভর-সম্ভার লইয়া পিতা-পুত্রের মিলন-বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিতেছে, কখন মুক্ত ভাবাশ্রমগ্না রুচি আসিয়া উপাস্য-উপাসকের অবিচ্ছিন্ন আনুগত্য বাড়াইয়া দিতেছে, কখন বা মুক্ত জ্ঞানের আলোকে সকলি ডুবিয়া গিয়া কি যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৌন্দর্য্য বিকাশ পাইতেছে, তাহা ধ্যানী ভিন্ন কে দেখিবে?

হায়! এমন যে সহজ সুলভ স্বাভাবিক ধ্যান—মহামতি ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই ইহা উপেক্ষা দ্বারা বহু বিলম্বিত কঠোর বাহ্য চিন্তার প্রতি নির্ভর,

করিয়া কতই যে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন, একবার মনে করিলেও বড় আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কালের বিবর্ত্তনে ঐরূপ সাধন ভাবটী কি ধ্যানীর বন্ধুরপথ-ভ্রমণ-পরিশ্রম নহে ? কিন্তু একথাও বলিতে পারিনা যে, ঐরূপ সাধনে কোন ফল নাই। বস্তুতঃই উহাতে শরীরের স্বাস্থ্যবল প্রবলই হইয়া থাকে। কিন্তু কাল-চক্রের বিঘূর্ণনে মানবগণের সেইরূপ অবস্থা কৈ—সেইরূপ জীবনী-শক্তির স্থায়িত্ব কৈ—সেইরূপ ধ্যানের সময় কৈ—সকলই যে কালের ভীষণ আবর্ত্তে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য চলিতেছে। মানবগণকে সময়োচিত বিধানের অধীনে রাখিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। এই অব্যর্থ নিয়মের বহির্ভূত কার্য্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া কি কর্ত্তব্য ? গৃহ-প্রোথিত অমূল্য রত্ন পরিহার পূর্ব্বক দূর দুরান্তরে অন্বেষণ করা কি সমীচীন বলিয়া মনে করিব ? কখনই না। অতঃপর উক্ত সহজ সুলভ স্বাভাবিক সাধন দ্বারা যদি অল্প সময়ে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহারই ত আশ্রয় লওয়া প্রার্থনীয়। মূল কথা, মনের দৃঢ়তা ও ব্যাকুলতাই ত উন্নতির উজ্জ্বল পথে লইয়া যায়। আমরা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই হউক, কি চিরাসক্তির কুট চক্রেই হউক কিম্বা যুক্তি তর্কের তীক্ষ্ণ তরঙ্গে পড়িয়াই হউক, "করস্থিত আমলকবৎ ঈশ্বর" ইহা জানিয়া শুনিয়াও সরল স্বাভাবিক পথে চলিতে বীতরাগ প্রদর্শন করি—এটি কি আমাদের ভ্রান্তি বুদ্ধির কার্য্য নহে ? ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির দিকে যায় না, উহা চির উন্নতির দিকে চলিয়াও ক্ষান্ত থাকে না। ঋষিপুঙ্গবেরা সাধন বলে দীর্ঘায়ু বশতঃ প্রথমতঃ মৃণাল-ছিদ্রবৎ সূক্ষ্ম দ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহালোকের ভিতরে বিচরণ করিয়াও "আরও চাই"—"আরও চাই"—"আরও চাই" বলিয়াও নিবৃত্ত হন নাই। ঈদৃশ শুভ আশার অভ্যুদয়ে বাহ্যানুষ্ঠানের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়াই যে থাকিতে হইবে, ইহা কতদূর শুভচিন্তা, সুধীগণ সহজেই বুঝিতে পারেন।

হায়! একেইত কাল-চক্রের বিবর্ত্তনে মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সাধনের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় দুর্ব্বল, তাহাতে আবার শারীরিক মানসিক শক্তি পার্থিব পথে পরিচালিত, বিশেষতঃ ধ্যান-রাজ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে পরীক্ষার অগ্নিকল্প-শাসন অপরিহার্য্য, এরূপ স্থলে ভগ্নমনোরথ হওয়া অবশ্যম্ভাবী! দেখিতেও পাওয়া যায়, ত্রিকালজ্ঞ মহা তেজস্বী ঋষিগণ-মধ্যেও অনেকে অনিবার্য্য মহচ্চিন্তার ঘোরতর ঝটিকার সময়েও পতন্মুখিনী পাপচিন্তার আকর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ পান নাই। ঈদৃশ বিপজ্জনক কারণে অনেকেই

বিপথগামী হইয়াছেন। তজ্জন্য ধ্যান-পরায়ণ যোগীকে বড়ই সতর্কতার সহিত চলিতে হয়। অতি নিশ্চিত সত্য যে চিন্তা-শক্তিরও দুইটী গমন পথ আছে, একটী শুভ, অপরটী অশুভ, এই উভয় পন্থা সম্মুখে উপনীত হইলে, নিষ্কাম নির্ম্মল চিন্তার সহিত মিলিত থাকিয়া যেন কোন রূপ মলিন চিন্তায় বা জটিল পথে পড়িতে না হয়। ধ্যানসাধন মহা ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, মনের সাধু কার্য্য সমূহ একমাত্র নির্ম্মলা চিন্তার সাহায্যে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু মন যদি আসক্তি-কলুষিত-চিন্তার অধীনে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ধ্যান সম্বন্ধে কেনই বা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না? ধ্যানীর চিত্ত ঐ নিষ্কাম নির্ম্মলা চিন্তার প্রতি অনুরক্ত না হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, ধ্যানের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। বিষয়-লোলুপা ধর্ম্মগ্রাসিনী চিন্তার এমনি মোহিনী শক্তি যে, ক্ষণ মধ্যে মনের ঐকান্তিক দৃঢ়তা ও উজ্জ্বল ভাবটীকে পতনের পথে লইয়া যায়। তখন তাহার সেই ঐশী ভাব বিজড়িত নিষ্কাম চিন্তা নিরাশা অন্ধকারে যেন নিমজ্জিত হইতে থাকে। এইরূপ সময়ই ত ধ্যানীর অগ্নি-পরীক্ষা! ইহার অসহ্য তীক্ষ্ণ-তাপ সহ্য করিতে পারিলে, ঐ শুভ চিন্তার সাহায্যে ধ্যানের লক্ষ্য স্থির সম্বন্ধে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। বাস্তবিকই যত প্রকার পরীক্ষা আছে, তাহার মধ্যে আসক্তি কলুষিত চিন্তার আকর্ষণই বিঘ্নপ্রদ! সুতরাং উহার নিমিত্ত অনুকূলবৃত্তির উত্তেজনা, অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তা, প্রাণ-ভেদী রুচির অকৈতব ব্যগ্রতার প্রয়োজন—নতুবা সকল প্রকার আয়োজনই যে বৃথা হইয়া যায়।

অতঃপর ধ্যানী, সকল অবস্থার মূলে ভগবদ্‌রুচি ও অকৃত্রিম ব্যাকুলতাকে জাগ্রত রাখিয়া আনন্দময় কোষে প্রবিষ্ট হইলে, সেই অনুপমেয় অব্যক্ত জ্যোতিঃ হইতে অখণ্ড অব্যয় অনাদি নিরাময় "স্বরূপ" তখন ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে। বেদের শিরোভূষণ উপনিষদ্‌কালে, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরূপণ সময়ে, "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম" ইত্যাদি স্বরূপ দর্শনে ঋষিরা একই আত্মার প্রকট ভাব বুঝিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। যখন হইতে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ "ব্রহ্মরূপাহিকেবলম্" এই মহত্তত্ত্ব লাভ করিলেন, তখন হইতেই অগ্নি, বায়ু, বরুণাদির ভিতরে যে সমূহ শক্তির কার্য্য, তাহা স্থূল জড়িত ক্ষণস্থায়ী—নিঃসন্দেহ জানিয়া ঐরূপ শক্তি-পূজাকে আর তাঁহারা হৃদয়ে স্থান দিলেন না, সুতরাং উহা একেবারেই চলিয়া গেল। হৃদয়েই ঈশ্বর স্থিতির কারণ প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। কাল বিবর্ত্তনে সংসারে মানব-প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ ভাব সত্ত্বে, ধ্যান ধারণার নানা

প্রকার ঃ পার্থিব তত্ত্বের সংমিশ্রণে যথেষ্ট উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সমূহ নিয়ম অবলম্বনে, প্রীতি সম্ভোগের নিদান ভাবিলেও উহার ভিতরে জড় বিজ্ঞানের উত্তেজনায় কতকগুলি কার্য্যে ঐন্দ্রজালিক ভাব দেখা যায়। তজ্জন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিদ ঋষিগণ উহা হইতেও সুলভ উপায় স্বাভাবিক ধ্যান ধারণাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। তবেই বলা যায় যে, কালের তীব্র ও কুটিল গতির মধ্যেও সরল শুভ পথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে। সাধনেরও ক্রমশঃ স্তর-ভেদ বিধান পালন দোষের নহে, কেননা এখন বুঝিব যে জ্ঞানের পরিস্ফুরণটী বাহ্যাবরণে আবদ্ধ না থাকাই একমাত্র বিধি নির্দ্দিষ্ট উপায়। তাহা যত্ন বা অনুরাগ বিহীন হইলে কোন তত্ত্বেরই স্ফূর্ত্তি সম্ভবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুধীগণ বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির উন্নতির কল্পে বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। বিবিধ শাস্ত্র মন্থন ও যোগী ভোগী জ্ঞানী মূর্খ সকলের ভিতরে প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ করিতে তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা একমাত্র নির্ম্মল সত্যের নিমিত্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। চিন্তাশীল মহানুভবগণের কি একটু ভাবিবার কথা নহে?

নিশ্চয়ই বলিব যে, স্বাভাবিক ধ্যান-যোগ বর্ত্তমান যুগে বাঞ্ছনীয়। কারণ বাহ্য ক্রিয়ার কঠোরতার ভিতর দিয়া সাধনসিদ্ধ বাসনায় যে সময় পাত হয়, তদপেক্ষা স্বাভাবিক ধ্যান সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিফল-মনোরথ নহে। কেনই বা বিশ্ববৈচিত্র্যতার বিকৃত ছায়াবরণে অসীম মহামণ্ডলের উজ্জ্বল পথ রুদ্ধ রাখিব? কেনই বা দেহাশ্রিত তত্ত্ব ও বৃত্তিগুলিকে বিকৃত নিয়মের দ্বারা চিত্তের সাম্য চিন্তার বিঘ্ন সংঘটন করিব? কেনই বা আত্মার পূর্ণ প্রকট ভাবের উচ্ছ্বাস তরঙ্গে ভাসিয়া ধ্যানলব্ধ সঙ্গীতটী গাহিব না?

কেদারা—আড়া।

ধ্যান ধ'রে দেখি একি রূপ।
অরূপে রূপের আলো এ কেমন রূপ।
আহা কি অব্যক্ত জ্যোতিঃ, এ জ্যোতিঃ জ্যোতির জ্যোতিঃ,
অথচ অখণ্ড ভাবে, চিন্ময় নিত্যস্বরূপ।
নিরাকারে এযে কিরূপ, বলিতে হয় যে কিরূপ,
রূপের তুলনা দিতে, তুচ্ছ জড় রূপ;
জগতে যে দেখি রূপ, এরূপ নহে সেরূপ,
প্রকাশ করিতে ওরূপ, বোবার স্বপ্ন যেরূপ।

নবম উল্লাস।

সমাধি।

ধ্যান বা অভেদ চিন্তার ঘনতাই যোগ। কিন্তু স্বাভাবিক প্রজ্ঞার সহিত একাগ্রতার সম্বন্ধ না থাকিলে, সাধনে সিদ্ধি লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তার তিরোধান না হইলে, বাহ্য আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই বিদূরিত হয় না। এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে যোগ-রাজ্যের গন্তব্য পথে উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এই কারণে মহা প্রাণের অব্যাহত প্রবাহ দ্বারা হৃদয়ের আবর্জ্জনা সমূহ ধৌত হইয়া যোগের উজ্জ্বল প্রদেশে প্রবেশ শক্তি জন্মে না। বরং যোগ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতার অভাব-জনিত বিঘ্নই সংঘটিত হয়। ঈদৃশ বিপৎকালে যদি একাগ্রতার মধুর মিলনের স্নিগ্ধ বেগ অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, স্বাভাবিক জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে যোগারূঢ় ব্যক্তির সাধনে সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী।

এখন দেখা যাক্, ঈশ্বরে অভেদ একাগ্রতার আশ্রয় কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃই যতদিন চিত্তের দিক্-শলাকার ন্যায় তাহার নির্দ্দিষ্ট দিকে স্থিত ভাব না জন্মে, তত দিন একাগ্রতার সঙ্গে পরিচয় হওয়াই অসম্ভব। জগতে দেখাও যায়, বহু শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকে ভৌতিক শরীর ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও মোহ-প্রলোভনে প্রতারিত হইতেছেন এবং বিবিধ বিষয়িনী অসার চিন্তায় সতত উন্মত্ত প্রায় নানা ভাবের তুঙ্গ তরঙ্গে পড়িয়া আসিতেছেন, সুতরাং ঐরূপ শরীর-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া শুদ্ধ স্বভাব লাভ করা কি অসম্ভব নহে? কেমন করিয়া বলিব যে, একাগ্রতার মধুর আপ্যায়নে জীবনের উন্নতির জন্য প্রবৃত্তি জন্মিবে! বিশেষতঃ এই শোণিতশুক্রময় ক্লেদপূর্ণ নশ্বর শরীরে দুইটী ভাব রহিয়াছে। তন্মধ্যে বিষয়াসক্ত ভাবটীর নিমিত্ত মানবীয় শক্তির তৃপ্তি অক্ষুণ্ণ—কিন্তু ভগবদ্‌কৃপার আকর্ষণে নিরাশার কথা নহে। সংসারক্ষেত্রে আত্মম্ভরিতাদি দুষ্প্রবৃত্তির অধিকার সত্ত্বে পাশবীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়াও অনেকে নিঃস্বার্থ সাধন বলে শুভ প্রবৃত্তি সমূহের আনুগত্যে দেবভাবেও পরিণত হন। কেন না, মন যতক্ষণ শরীরবিকার ভাবের ভিতরে বিচরণ করে, ততক্ষণই ঐ

অহং-বিজড়িত বিচার-জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্তরাকাশ-ভেদী মহা জ্ঞান হইতে দূরে অবস্থিত করে। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, শরীরই আবার অনুকূল প্রতিকূল উভয় ভাবের কার্য্য করিতে সক্ষম। আমাদের পার্থিব চক্ষের ভিতর দিয়া যে চৈতন্যের বিকাশ হয়, অথবা বহির্জগতের ব্যাপার ও তাহার বিবিধ বৈচিত্র্য চিত্র সকল দেখিতে পাই, উহাইত সীমাবদ্ধ প্রতিকূল অবস্থা! আবার ঐ চৈতন্যই যখন অন্তর্জগতে প্রকটিত হয়, তখন পার্থিব ভঙ্গুর শরীরটী সর্পশল্কবৎ অসার অবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং ঐ অবস্থাই যোগীর যোগ সাধনের অনুকূল অবস্থা। তখনই চিন্তা শক্তির লক্ষ্য স্থির হইয়া যায় এবং একাগ্রতা আপনা হইতেই সহায় হয়। শুভ বৃত্তি সকল একতান সুরে ঐশীরাগে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। অল্পকাল মধ্যেই যোগারূঢ় ব্যক্তিকে মহা-মিলনের দৃঢ় ভিত্তির উপর লইয়া গিয়া, তাহার নির্ভর শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলে। তখন চাঞ্চল্য রূপ কশাঘাতে ব্যথিত-চিত্তের বিষয়মুখীন ইচ্ছা আর থাকে না। সেই ইচ্ছাই ভগবদ্ভাবে আকৃষ্ট হইয়া যোগীর যোগবল বৃদ্ধি করে; আশার অমৃত উচ্ছ্বাসে হৃদয় ডুবাইয়া দেয়।

যোগিগণ এইরূপ শুভসময়ে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করতঃ আত্মার প্রত্যক্ষ্যানুভূতির নিমিত্ত আকুল হইয়া পড়েন। তখন কোনরূপ বাহ্য-বাসনার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন থাকে না। এতই ব্যাকুলতার উৎকণ্ঠা প্রবল হয় যে, পৃথিবীর আপাতমুগ্ধকর প্রলোভন সমূহ সম্মুখে আসিতেই পারে না। মানবীয় শক্তির প্রতি নির্ভর না রাখিয়া একমাত্র নিরাময় নিত্য-পুরুষের অব্যর্থ ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিলে বাসনা-মুগ্ধ মোহ-জ্ঞানের ভৈরব রবে, যুক্তি তর্কের গভীর হুঙ্কারে, বিচার যুক্তির তীব্র তিরস্কারেও কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয় না। যোগী এমন একটী অনুপমেয় রাজ্যে আসিয়া পড়েন যে, সেখানে বিদ্যা বুদ্ধি অসংখ্য শাস্ত্র যুক্তি সকলই পরাস্ত—চিন্তা-শক্তি স্তম্ভিত ও অচল—ঐ অব্যক্ত স্থানটীই যোগ-রাজ্য। যোগী মহাভাবের মধুর তরঙ্গাঘাতে মাতার জঠর কোষ-নির্মুক্ত সন্তানের ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। এবং অমানুষী সৌন্দর্য্য দর্শনে এতই বিহ্বল হন যে, তাঁহার পার্থিব শরীরে অগ্নি-সন্তপ্ত শত শত শূলাঘাত করিলেও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, সেই সময় যোগীর দৈহিকানুভব শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন কোন যোগ-শাস্ত্রে ইহাও দেখা যায় যে, স্থূল শরীরের সঙ্গে এতই দৃঢ় বন্ধনে জড়িত থাকিয়া যোগ সাধনের ব্যবস্থা আছে যে, তাহা অতিশয়

সময়সাপেক্ষ ও কঠোর সাধন সত্ত্বেও যোগসিদ্ধ হইতে পারে। ইহা হইলেও কিন্তু স্বাভাবিক যোগের মূল সাধনই শরীরস্থিত স্নায়ু বিভাগে মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জা, রক্ত সঞ্চালন বিভাগে হৃৎপিণ্ড, শ্বাস প্রশ্বাস বিভাগে ফুসফুস, অন্নবহা নাড়ী বিভাগে পাকাশয় ও অন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র পরিচালন কার্য্যে চিত্তকে সম্যক রূপে আবদ্ধ রাখিতে না হয়। তবেই একটু চিন্তা করা আবশ্যক যে যখন আমার একই শক্তি প্রবাহ কোটি কোটি জগতের অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রাণাধারে ওতপ্রোতভাবে অব্যর্থ নিয়মে কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতেছে তখন এইটুকু জানিয়া রাখাইত যথেষ্ট—অন্তরে উহা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিলে, নির্ভর-বল কেনই বা প্রবল হইবে না? কেনই বা অবিচলিত থাকিবে না? কেনই বা অবিচ্ছিন্ন নির্ভর-সাধনে শরীর-তত্ত্ব-নির্ণয়ে (চিকিৎসকের) উদ্ভাবনীয় চিন্তা শক্তি আপনা হইতে আসিবে না! শরীরের ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা সাপেক্ষ। কিন্তু হৃদয় মন প্রাণ তাঁহাকে ঢালিয়া দিতে পারিলে যাহাদ্বারা যে কার্য্য হইবে,তাহা স্বভাবতঃ ফুটিয়া উঠিবে। শরীর যন্ত্র সমূহ ও মস্তিষ্কের স্নায়ু দুর্ব্বলতাও ঐ নির্ভরবলে সবল হইবে। এবং প্রত্যেক মন্ত্র বিভাগের সঞ্চালন ক্রিয়া সমস্তই সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে—শরীরের পরিচালন শক্তির বিরাম থাকিবে না। ঘড়ীর কাঁটা যেমন চাবীর বলে ঘুরিতে থাকে ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়, তেমনই আমাদের হৃদয়-ঘড়ীতে ব্যাকুলতা-চাবীটি চালাইয়া দিলে একাগ্রতা রূপ শলাকা নিয়মিত গতিদ্বারা নির্ভরের উজ্জ্বল অঙ্কটিতে পড়িবেই পড়িবে। এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদ্যপি নির্ভর সাধনেই ঈশ্বরানুভূতি কিম্বা দর্শন লাভ হয়, এবং শরীর তত্ত্ব সকল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে বিদ্যা মন্দিরে জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা শাস্ত্র প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের প্রয়োজন কি? উত্তরে এ কথাটী কি বলিতে পারি না যে, শাস্ত্র বল নির্ভরের কাছে দুর্ব্বল! যীশু, মহম্মদ, নানক প্রভৃতি মুক্ত পুরুষগণ কত শাস্ত্র পড়িয়া ছিলেন? তাঁহাদের ত অকৃত্রিম ব্যাকুলতা, অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুরাগ, প্রাণভেদী নির্ভর বলেই যোগ সিদ্ধ হয়। যীশুর পিতা-পুত্রে যোগ, মহম্মদের দোস্ত বা বন্ধু ভাবে যোগ, নানকের (অনাহত ভেরী বাজেরে) প্রত্যাদেশের নির্ম্মল শক্তিলাভে স্বাভাবিক যোগ। ইঁহারাত সকলেই একাগ্রতার সহিত নির্ভর সাধনেই সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ় সত্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে কি আমরা বলিতে পারিনা যে ভগবানকে সম্পূর্ণ রূপে শক্তি, বল, ইচ্ছা ও প্রাণের প্রিয় বস্তু দিতে পারিলে জ্যোতিশ্চক্ষু পরিস্ফুট হয়, এবং উপযুক্ত

মুক্ত পুরুষদিগের ন্যায় হৃদয়-গ্রন্থ হইতে স্বর্গীয় দেব-ভাব পবিত্র ভাবে প্রকাশ পায়। আপনা হইতেই ঐ হৃদয়-গ্রন্থের গূঢ় প্রদেশ হইতে অমৃত উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া কত বেদ, কত বাইবেল, কত কোরাণ পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও নিকট পড়িতে হয় না, স্বয়ং ঈশ্বরই শিক্ষা-দীক্ষার গুরু। তিনিই স্বাভাবিক যোগের উজ্জ্বল পথ দেখাইয়া দেন। অতি নিশ্চয় সত্য যে, তাঁহাকে সমস্ত সঁপিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা ও বিভব বিলাস ভোগ বাসনা হইতে যতই দূরে অবস্থিতি করা যায়, ততই বহিঃশক্তির আকর্ষণ ঘুচিয়া গিয়া বিশ্ব জনীন প্রেমের সহিত .নির্ভর আসিবে এবং ভগবদ্‌মুখিনী চিন্তাও স্থির ভাব গ্রহণ করিবে। তখনই ঈশ্বর কৃপা অবতীর্ণ হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, মনের বল বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বিষয়াসক্তির প্রলোভনে আর কিছু করিতে পারিবে না। অনায়াসে স্ত্রী পুত্র পরিবার বেষ্টিত সংসারেই পদ্ম-পত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ত অবস্থায় অভীষ্ট সাধন হইবে। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে ঐ প্রাণভেদী নির্ভরের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে ও বিশুদ্ধ অধ্যবসায় যোগ-রাজ্যের প্রশস্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেখিবার জন্য ভগবদ্‌ প্রদত্ত দিব্যচক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি প্রকাশ পাইবে। বস্তুতঃই একমাত্র নির্ভরের ঐকান্তিক প্রাণমুগ্ধ আনুগত্যে স্বাভাবিক যোগনিষ্ঠ যোগীর ঈশ্বর-দর্শন-আশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহার অন্তঃকরণে সুনির্ম্মলা প্রীতির মধুর তরঙ্গ অনিবার্য্য বেগে বহিতে আরম্ভ করে, কিছুতেই বাধা মানে না।

তখনই অব্যক্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে অবিশ্রান্ত "ব্রহ্মবাণী" উত্থিত হয়। যোগী অনাহত শ্রুতিতে সেই ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করতঃ বিহ্বল হইয়া পড়েন, ইহাই (শব্দ) শ্রুতিযোগের সিদ্ধাবস্থা। ক্রমশঃই ঐ নাদোচ্ছ্বাসের স্নিগ্ধ আঘাতে সকল প্রকার বিকৃত চিন্তাকে যুগপৎ দূরে নিক্ষেপ করে। এইরূপ অবস্থার ভিতরে ত্রিসত্বা সমাবেশে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ যোগে তন্ময়ত্বের আভাস ভাব বিকাশ পায়। বস্তুতঃই যে পর্য্যন্ত তন্ময়-তত্ত্ব অনাবৃত জ্ঞানের প্রভাবে অহম্ভাবের বিনাশ না হইয়া অহংযুক্ত আমির ভাবে থাকে, সে পর্য্যন্ত তুমির প্রয়োজন! ঐ আমি যখন অহং নির্মুক্ত অবস্থায় স্বয়ং হন, তখন আর "তুমি" বলিতে কেহ থাকে না, ইহাকেই তন্ময়-নিত্য-সমাধি বলে। কিন্তু এটিও সত্য যে, একই ঐশীশক্তির প্রকার ভেদে আত্মা ও জীব ভাবের প্রভেদ ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ব্বিশেষের, উপাস্য উপাসকের মিলন বা যোগ— ইহার ত ঐ ক্ষণস্থায়ী যোগ-গভীরতা টুকুই ভগ্নসমাধি—যোগী, ভক্ত, সাধকগণের

প্রাণের পরম তত্ত্ব! বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমিদিগের পক্ষে উক্ত ভগ্ন সমাধিই বাঞ্ছনীয়; কেন না নিত্য যুক্ত মহাসমাধি সাধনে আশ্রমিকগণ "আমি" হইয়া গেলে সংসারে অনাসক্ত বৈরাগ্যের সহিত মধুর আনুগত্য সাধনে বীরত্বের গৌরব থাকিত না। এবং ঈশ্বরানুভূতি, বিশ্বজনীন প্রেম, অকৈতব জীব-সেবায় শক্তি জন্মিত না। উহা কেবল তীব্র বৈরাগ্যের তাড়নায় গিরি গুহা বাসী উচ্চমনাঃ যোগিদিগেরই সম্ভবপর, ইহাই যেন মনে হয়। কারণ তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত যোগ সাধনেবিরত হইয়া নির্জ্জন অরণ্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন সুতরাং প্রাণি জগতের মধ্যে সমপ্রাণতার সাধন-কল্পে তাঁহাদের উদাসীন ভাব! নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, যতক্ষণ ব্রহ্মচৈতন্য ও জীব ভাবে "আমি"—"তুমি" অর্থাৎ সেব্য-সেবকের গূঢ় তত্ত্ব, যোগীর হৃদয়-পটে চিত্রিত না হয়, ততক্ষণ মহা মিলনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এবং সমাধি-তত্ত্বের অনুশীলন-স্পৃহা বলবতী হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এই কারণে সেব্য-সেবক ভাবে ভগ্ন সমাধির সাধন অসার প্রযত্ন নহে। বাস্তবিকই ভগবদ-মুখিনী পূতচিন্তার প্রযত্নে পার্থিব আসক্তির আকর্ষণ চলিয়া গেলে সাধন বিরোধী রিপুকুল ও অনুকূল পথ প্রদর্শন করে, সুতরাং কোনরূপ বিঘ্ন বিড়ম্বনা আসিতে পারে না, সাধন পথ পরিষ্কার দেখা যায়। তখন পূর্ণ চিন্ময় সত্তায় মিশিয়া গেলেও দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতির অমৃত প্রবাহে যোগীর প্রাণ ভাসিতে থাকে।

এখন এই কথাটী উপস্থিত হইতে পারে যে, নিত্য যুক্ত মহা সমাধি এবং উপাস্য-উপাসক ভাবে ভগ্ন সমাধি, এই উভয় সমাধি মধ্যে গৃহস্থাশ্রামিক-দিগের কোনটী গ্রহণ করা বিধেয়। প্রশ্নোত্তরে বলিতে পারা যায়, সংসারা-শ্রমিকগণের ভগ্ন সমাধি সাধনই প্রার্থনীয়। কারণ, বিধাতার ইচ্ছা-শক্তি ও অব্যর্থ নিয়ম কৌশলে প্রাণিজগতে প্রকৃতি পুরুষরূপের লীলা তরঙ্গে সকলেই নিমজ্জিত রহিয়াছে। একমাত্র নিরাকার চিন্ময় "আমি" থাকিয়া গেলে যে, বহির্জ্জগতের অন্তর্ভেদী চিদানন্দ যোগের মিষ্টতা রহিল না! চিনি হওয়া অপেক্ষা আস্বাদন-ভোগটী কি মধুর হইতে মধুর নহে? বস্তুতঃ ভগ্ন সমাধিতেও উভয় তত্ত্ব লাভ হয়, যতক্ষণ যতটুকু যোগ গভীরতার মধ্যে সমাধিস্থ থাকা যায় ততক্ষণ ততটুকুও ত নিত্য যুক্ত সমাধির আভাস লাভটী নিঃসন্দেহ! আবার প্রাণিসমূহের ভিতরে সমপ্রাণতার একত্ব মিলন প্রবাহ ও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, এমত স্থলে ভগ্ন যোগাবস্থাতেও পূর্ণ মনোরথ হওয়ার বিঘ্ন সম্ভবে না। তবে

কেনই বা ঐরূপ সমাধি সাধনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উপাস্ত-উপাসক ভাবের অমিয় তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত থাকা যায়। সংসারে দেখাও যায় যে, এই মহা সাধন ক্ষেত্রে একমাত্র উচ্চ, নীচ, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, অভিমান, সম্মানের উত্তেজনায় মানুষ ঐ জীবন্ত জ্বলন্ত ভাবটী প্রাণে সঞ্জীবিত রাখিতে চায় না। কেননা, কেহ বা কবিত্বের ঝঙ্কারে, কেহ বা পাণ্ডিত্যের চীৎকারে, কেহ বা রাজত্বের হুঙ্কারে গর্ব্বিত সুতরাং দীনতার অভাব জনিত উপর্য্যুক্ত নির্ম্মলানন্দের আমির আবর্ত্তে ডুবিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হয় না। তাঁহারা মনে ভাবেন না যে, কবিত্ব কল্পনায় পোষিত, পাণ্ডিত্য অহঙ্কারে জড়িত, রাজত্ব দ্বেষ দম্ভে পরিণত হইয়া অল্পকাল মধ্যে বিবিধ বিঘ্নোৎপাদন করে ও উদার সরল শান্ত ভাবটীকে অত্যন্ত উগ্র করিয়া তুলে। কিন্তু সমদর্শী যোগার্থীরা সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ঐ সকল অসার তৃপ্তির উপাধিগুলিকে যোগ সাধনের মারাত্মকপত্র ভাবিয়া দীনতার আশ্রয় গ্রহণ জন্য যারপর নাই ব্যস্ত হন। প্রত্যুত তাঁহারা ঐ সকল উপাধিলব্ধ গৌরবকে নীরবে ভগবৎ চিন্তার দ্বারা পরাজয় করতঃ শান্তির বিমল ছায়া স্পর্শে কৃতার্থ হইতে থাকেন।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, পৃথিবীতে ঐ কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, রাজত্ব প্রভৃতি সকলেই আদরের ও প্রীতির বস্তু কিন্তু ইহাও অবস্থাবিশেষে পরিত্যক্ত হয়। মানব জীবনে দেব শক্তি প্রবিষ্ট হইলে, এতই নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে চরিত্র গঠিত হয় যে, অপগণ্ড বালকের মত স্বার্থ শূন্য বিশ্বজনীন প্রেমে আকুল করিয়া ফেলে। বস্তুতঃই শিশুভাবটী দেবভাবের পরিচায়ক। যোগীর বন্ধু ঐ আধ আধ ভাষী ক্ষীর-কণ্ঠ-শিশু-চরিত্রের সঙ্গে যোগ না হইলে যোগীর জীবন প্রস্তুত হয় না। যোগাকাঙ্ক্ষীর প্রাণ শিশু-ভাবের মধ্যে প্রবেশ না করিলে, সমাধির উজ্জ্বল ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। যোগী আপনাকে ভুলিয়া না গেলে, আর একটী বাহ্য উত্তাপ অসহ্যকর যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠে। সেটী এই, মানবের নিকট শিষ্যত্ব! ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব মহর্ষি যীশু শিশু ভাবের ভিতর দিয়া লাভ করেন এবং প্রেমের বিধানে তিনি শিষ্যগণের পদধৌত করতঃ জগৎকে একপ্রাণতার মহৎ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃই উহার মর্ম্ম প্রদেশে প্রবেশ করিলে জানা যায়, সকল প্রাণীর সহিত অভেদ যোগ না হইলে, যোগী হইতে পারে না। অতি সত্য যে, ঈদৃশ বিশুদ্ধ তত্ত্বের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিজাত্যের অভিমানে গর্ব্বিত থাকিয়া কি যোগী হইতে পারে? ঐ পরম হংসকে দেখুন!

ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, সকলকেই তিনি আদরে গ্রহণ পূর্ব্বক কেমন ভেদরূপ ক্রব্যাদের উন্নত মস্তক নত করিয়া দিয়াছেন। তবেই বুঝিব যে, যোগী জীবনে সর্ষপ-কণা সদৃশ ভেদভাব থাকিতে যোগ সিদ্ধ হওয়ায় আশাকরা যায় না। সেই জন্যই শিশু ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাদের আপন, পর, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, সৌন্দর্য্য, কদর্য্য ইত্যাদি প্রভেদ ভাব কিছু থাকেনা, যিনিই হস্ত প্রসারণ করুণ, আনন্দ ভরে ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে। যোগীগণেরও তদনুরূপ উজ্জ্বল স্বভাবে দৃঢ়তা না জন্মিলে সকলই বৃথা হইয়া যায়। নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, ঐ শিশু ভাবেও যোগী ভাবে বিন্দু মাত্রও বিভিন্ন নাই। হয়ত আপনি বলিবেন যে, ঐ কচি শিশু এবং অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ও শক্তি এসকল কি কখন এক হইতে পারে? একথার মূলে, কেনইবা, বলিব না যে, উক্ত উভয় প্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই জানা যায়, শিশুর যেমন সকলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা অক্ষুন্ন, যোগীরও সমসৌহার্দ্দ্যও অবিচ্ছিন্ন প্রেম সুদৃঢ়। শিশু সতত বাক্ সংযত এবং কখন হাস্য কখন রোদন করে যোগীও নীরবে ক্ষণে হাস্য ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। শিশু জগতের বাহ্য সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি রাখেনা, যোগীও বিশ্বচিত্রের শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হন না। শিশুর মল মূত্র অর্থাৎ পুরীব, চন্দনে, দুর্গন্ধ, সুগন্ধ সমজ্ঞান—যোগীরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা।

এই শিশু আদর্শ ই সমাধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। যোগী যখন যোগ-তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন তখন বাল্য ভাবের মধ্য দিয়া দিব্য চক্ষুতে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ, মহা প্রাণে এক ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না। এক মাত্র "চিৎ" ও তাহার জ্যোতি অর্থাৎ স্বরূপ চৈতন্য ও জীব চৈতন্যের একই সত্তার অখণ্ড প্রবাহ উভয় ভাবে প্রকটিত হইতেছে ইহাই লক্ষ্য হয়। আবার একই ঐশীশক্তির ঐক্যবন্ধনে দ্বৈতের তন্ময় যোগে প্রবেশ শক্তি জন্মিলে তাহার অস্তিত্ব অদ্বৈত অসীম সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। এই তন্ময় সমাধিতে ভাবেও স্বরূপে একীভূত হইলে, দ্বৈত ভাব বিলয় সত্ত্বেও অখণ্ড জীব ভাবের অস্তিত্ব একবারে চলিয়া যায় না। কেননা আত্মার অখণ্ড জ্যোতিই যখন জীব ভাব প্রকাশিত হয়, তখন তন্ময় যোগেও যোগীকে কখন কখন ভগ্নযোগে আকৃষ্ট হইতে হয়। কিন্তু তন্ময় অবস্থা টুকু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মাব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

এইত গেল তন্ময় যোগের "আমি," এখন নির্ব্বাণ যোগের "আমি" যাহা বুদ্ধদেব, জীবের যুগপৎ অস্তিত্ব নির্ব্বাণ অভ্রান্ত তত্ত্বই জগতে প্রচার করিয়া গিয়া-

ছেন। বস্তুতঃ উহা যে জৈবিক ভাবের চির মুক্তির নিদান তত্ত্ব এ কথায় সংশয় না থাকিলেও ঐ নির্ব্বাণ মহত্তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিলে ক্ষতি কি! একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে নিত্যযুক্ত সমাধি ও তন্ময় সমাধি এবং নির্ব্বাণ এই সমাধিত্রয়ের বিশেষত্ব এই যে, দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে ঐ তন্ময়ত্বের গাঢ় আলিঙ্গনে যোগী নিজকে ভুলিয়া গিয়া কিছু কালের জন্য আত্মার ভাব-গ্রহণক্ষম হন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিত্যযুক্ত সমাধি, নির্ব্বাণ-সমাধি, ভগ্নসমাধি এই তিনটী তত্ত্বের সংস্পর্শে অনেক প্রকার মুক্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে আপাততঃ সংক্ষেপে তিনটী মুক্তির বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

১। আত্মা ও জীব,অর্থাৎ চিৎ এবং চিৎতরঙ্গ নিত্যযুক্ত মহাযোগের গভীরত্বের ভিতরে এক হইলেও চিৎস্বরূপে জৈবিক ভাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় না। তবেই বুঝিতে হইবে যে, আত্মার সহিত জীবভাবের মহামিলনেও যোগী যোগামৃত রসাস্বাদনে অমরত্ব লাভ করেন। সুতরাং ইহাতে দৈহিক তত্ত্বেরও কোন অংশে বিকৃতি বা ব্যত্যয় ঘটে না। সেই সময় সমস্ত শরীর-তত্ত্ব নিশ্চল ও স্থির, চক্ষু থাকিতে দৃষ্টি হীন, শ্রুতি থাকিতে শ্রবণ শক্তি রহিত। হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্তই অচল অথচ আত্মার সহিত অস্পর্শ সত্ত্বেও চির স্থিতির শক্তিলাভ করিতে সক্ষম। কেননা, ঐ শরীর যন্ত্রটী মহাপ্রাণের প্রবাহ ক্ষেত্র হইয়া অবিকৃত থাকিলেও উহা জড় ভাবে পরিণত এই অবস্থাকে বায়ু স্তম্ভিত "কুম্ভক" যোগ কহে। বাস্তবিক উহাও একরূপ যোগীর যোগশরীর জলে, স্থলে, ভূগর্ভে যেখানেই থাকনা উহার ভিতরে ঐ কুম্ভক যোগের ব্যত্যয় হয় না। বলিতে কি,অগ্নি-সন্তপ্ত শত শত শূলাঘাতেও কোন সাড়া শব্দ নাই। কেনই বা থাকিবে? নিত্য চৈতন্য ময় আত্মা যে "অভেদ্য" "অচ্ছেদ্য" তিনি কি কখন জরা, মৃত্যু, সুখ, দুঃখের অধীন? সুতরাং চিৎতরঙ্গ জীবও বাহ্যিক ভাবের অতীত। যতক্ষণ জৈবিক ভাবের কার্য্য উপশমিত না হয়, ততক্ষণই মানবীয় ভাবের মধ্যে বহির্মুখিনী চিন্তার দ্বারা শরীর কোষে বদ্ধ ভাব অনুভব হয়। মুক্ত জ্ঞানের প্রকাশে স্পষ্টই জানা যায় যে, কূর্ম্মের বহির্য্যাতনা নির্ম্মুক্ত হওয়ার কারণ যেমন নিজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহার মুক্তি ঠিক কুম্ভক যোগ সিদ্ধ যোগীর মুক্তিও সেইরূপ। কিন্তু ইহাতেও সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে যে, শরীর তত্ত্বের অনুপাতে কোনরূপ বাহ্য বিপদ উপস্থিত হইয়া যোগভঙ্গ হইলে যে সকলই বৃথা হয়। অতঃপর প্রক্রিয়ালব্ধ মুক্তির বিধান সকলের পক্ষে অনুকূল নহে। যোগীদিগের প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে এবং প্রবৃত্তির অনাচ্ছাদিত

উল্লাস-স্রোতে অনিবার্য্য হইলে অবস্থোচিত মুক্তির পথ অনুসরণ করা বিধেয়। নতুবা মুক্তি সাধনেও বিপদ সংঘটন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বাভাবিক যোগের আশ্রয়ে কোনরূপ বিঘ্নোৎপত্তির আশঙ্কা নাই। উহাতেও শরীর গত মুক্তির সাধন সহজ ও সুসাধ্য। মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে ঐশীভাবের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া অবিচ্ছিন্ন "দর্শন" পিপাসু ব্যাকুলতাকে, চক্ষের পলক কালের জন্যও ব্যবধানে যিনি না রাখেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধন সিদ্ধি বলে ঐ "কুম্ভক" যোগীর ন্যায় অন্তরাকাশে নিত্য যুক্তযোগে যোগ শরীরে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার ও শরীরটী অবিকৃত ভাবে নিত্যযুক্ত যোগের চিরসঙ্গী থাকিতে পারে, যদি সর্ষপকণা সদৃশ সময়, যোগ ভ্রষ্ট না হয়। প্রক্রিয়া-লব্ধ বায়ুনিরোধ যোগে যখন শরীর পাত সম্ভর নহে, তখন ঈশ্বরে অবিচ্ছিন্ন মনের যোগ থাকিলে বিকৃত-শরীর কেন হইবে? ইহাতেও চিরযুক্ত থাকিয়া মুক্তির সম্ভব।

২। তন্ময় যোগের ঘনতাই নির্ব্বাণ যোগ। এই বিশুদ্ধ যোগের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায় যতপ্রকার যোগশাস্ত্র পৃথিবীতে উজ্জ্বল চক্ষুরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে নির্ব্বাণ তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। নির্ব্বাণ শব্দে অনেক প্রকার অর্থ আছে, চিৎপ্রভা অর্থাৎ জৈবিক জ্যোতিঃ নিবিয়া যায় এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার ব্যাখ্যা ত আছে। এখানে জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত স্বীকার করিলে এক আত্মা ভিন্ন আর কি থাকে? এটি বস্তুতঃই ব্রহ্মমীমাংসার চরম সিদ্ধান্ত। আত্মাতে জীবের অস্তিত্ব লয় অভ্রান্ত বুঝিলে শঙ্করের মায়াবাদমতে "আমি" এই পূর্ণ অস্তিত্বের ভিতরে আর কিছু থাকিতে পারে না! সুতরাং বুদ্ধের জৈবিক ভাবের 'লয়'—শঙ্করের দ্বৈতধ্বংশে, এই উভয় তত্ত্বের অনৈক্য বা অসামঞ্জস্য বলা যায় না। এখানে দ্বৈত বিনাশ ও জীবের নির্ব্বাণ একই কথা! স্বাভাবিক মহা জ্ঞানের অভ্রান্ত উপদেশে জানা যায় যে, পুরুষ-পুঙ্গব শঙ্কর অদ্বৈতবাদ মীমাংসায় যোগী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণবাদকে একই ব্রহ্ম চৈতন্যের সামঞ্জস্য দেখাইয়া পরিশেষে অল্পকাল মধ্যে পুরাণ ধর্ম্মের দ্বারা বহুদেব বাদের পুনরুত্থান করিয়াছেন এবং নির্ব্বাণ বেগ ফিরাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন জানা আবশ্যক যে দ্বৈত-ধ্বংশ ও জীবের নির্ব্বাণ এই উভয়মুক্তির নিগূঢ় তত্ত্বটী কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে বিবেচনা হয়, যতক্ষণ জৈবিক ভাবের তিরোধান না হয় ততক্ষণ উপাসকের ভাবে জীবকে সাধন আবরণে থাকিতেই হইবে। সাধন কোষ বিমুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরে লীন হইলেই মুক্তি।

৩। নিত্য যুক্ত সমাধি এবং নির্ব্বাণ সমাধির মুক্তি বিষয় যাহা বর্ণিত হইল উহা যুক্তির অতীত সর্ব্বোচ্চ মুক্তির বিধান। এক্ষণে একটু ভগ্ন সমাধির মধ্যে মুক্তি তত্ত্বের চিন্তা করা যাক্। যোগী যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সদ্ভাবে উপস্থিত না হন, সে পর্য্যন্ত বিষয় মুখিনী চিন্তাজালে জড়িত হইয়া স্থূল শরীর সঞ্জাত আসক্তির আকর্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রলোভন চক্রে ঘুরিতে থাকেন। সেই সময় যদি ভগবদ কৃপার সাহায্যের নিমিত্ত শুভ প্রবৃত্তি সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হন এবং সচ্ছাস্ত্র, সাধুসঙ্গ সহবাসে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই অজ্ঞানতার কুজ্ঝটিকা চলিয়া যায়। অল্পসময়েই মুক্তির পবিত্র পথ উন্মুক্ত দেখিতে পান। হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইলে বাসনা মুক্ত আকাঙ্ক্ষার অকপট আগ্রহ ও অভেদ অনুরাগের দ্বারা কেনইবা ভগবদ্‌কৃপা অবতীর্ণ হইবে না। ঐ কৃপাই আবার ঐশী শক্তির সহিত অকৃত্রিম আনুগত্যে এমন একটী অত্যুজ্জ্বল স্তরে উপস্থিত করিয়া দেয় যে, যোগীকে আর কোনরূপ প্রলোভন-জড়িত বিপদে আকুল হইতে হয় না। শত শিখামুখ আজ্যভোজী অগ্নি যেমন গৃহস্থের গৃহ দূষিত বায়ু ও প্রাণ বিনষ্টকর বস্তু রাশিকে বিশোধিত করিয়া অনুকূল বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যে পরিণত করে, তেমনই যতই কেন সাধন শত্রু বা বিপদ সঙ্কুল প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত করুক না, তাহারা ঐ অনাবৃত তত্ত্ব জ্ঞানরূপ পূতাগ্নি স্পর্শে সন্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় জ্যোতিঃ ধারণ করতঃ যোগার্থীকে শান্তিস্তরের উপর দাঁড়াইতে শক্তি প্রদান করিবেই করিবে। এবং বাহ্য বাসনার কূটজাল ছিন্ন করিয়া দিবেই দিবে। তখন যোগীর যোগ স্পৃহা এতই প্রবল হইবে, তাঁহার চিত্ত চিন্ময় অসীম ব্রহ্মসিন্ধু মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে দ্বৈত ভাবটুকু যায় না। চকিৎ মধ্যে আবার সেব্য সেবক ভাবের মধুর তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। দর্শন ইচ্ছা অধিকতর জাগ্রত হয় এবং মোহ পাশ বন্ধন ছিন্ন হওতঃ নির্ব্বিকল্প স্বভাবে মহচ্চিন্তায় সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। বাস্তবিকই যিনি বহিশ্চিন্তার প্রখর গতিকে বাধা দিয়া অন্তর্ম্মুখিনী নির্ম্মলা চিন্তাদ্বারা হৃদয়-দর্পণটী স্বচ্ছ রাখিয়াছেন ও ব্রহ্মতত্ত্বের পবিত্র প্রতিবিম্বগুলি দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি যতই কেন যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন না, অনাসক্ত বৈরাগ্যের অমিয় উল্লাসে বন্ধুর বা জটিল পথ প্রশস্ত ও পবিত্র আলোকে আলোকিত করিবেনই করিবেন। তাঁহার চিত্ত আর মুহূর্ত্ত কালের জন্যও জগজ্জালের কঠিন আবরণে বদ্ধ থাকিতে চায় না। ব্রহ্ম সদ্ভাবের আবির্ভাবে ভস্ম নির্ম্মুক্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ধারণ করে। এবং বিশ্ব বৈচিত্রের মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক মহাপ্রাণ প্রবাহে নিমজ্জিত

হইয়া মধুর যোগে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু এই মধুর যোগে পার্থিব পদার্থ-ক্লিষ্ট-বিকারে মুক্তি লাভ করিলে উপাস্য উপাসনা করা সেব্য-সেবকের মহালীলার অবকাশ থাকে না। তখন প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, এই ত্রিশক্তি যোগের অবস্থাতেও নিত্যযুক্ত সমাধির ভাবটী কিছু কালের জন্য দ্বৈত ভাবে আনিয়া দেয়। অতঃপর দ্বৈতাদ্বৈতের মধুর মিলনই মোহ-বিকার-যুক্ত যন্ত্রণার মুক্তির নিদান! ইহাতে বিভব ভোগবিলাস, ইন্দ্রিয়লালসা, পার্থিব স্বার্থ-স্পৃহা প্রভৃতি কিছু থাকেনা, কেবল দর্শনেচ্ছা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। চক্ষের নিমেষ কালটুকও সেই বিমলানন্দের বিরাম নাই, অবিশ্রান্ত যোগামৃত-ধারা যোগীর শুষ্ককণ্ঠে বর্ষিত হয়। যাহা হউক, নিত্যযুক্ত সমাধি ও ভগ্নযোগ-সমাধি, এই উভয় সমাধিতেই "দর্শন" ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। নির্ব্বাণ যোগে যখন "জীবত্ব" লয়প্রাপ্ত হয়, তখন দর্শন করিবার ত কেহ থাকে না, সুতরাং সোঽহং সমাধি, ঐ গিরিগুহা-বাসী যোগীদিগেরই প্রাণের বস্তু! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থের সম্বন্ধে কতদূর সম্ভব, বলিতে পারি না। কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যে সোঽহং সন্ন্যাসী যাঁহারা ঈশ্বরে বিলীন মুক্তির দ্বারা "আমি" হইয়া যান, তাঁহারা দ্বৈত জালে বদ্ধ হইয়া ভগ্নযোগের ভিতরে সেব্য-সেবক ভাবে তৃপ্তি হইবেন কেন? বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণ সমাধি তত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, জ্ঞানের চরম সীমায় আসা যায় সত্য, কিন্তু ইহাতে প্রেম, ভক্তি, সেবা-ভাবটী ঘুচিয়া যায় এবং প্রাণিজগত সমূহের গূঢ় প্রদেশে অখণ্ড চিন্ময় সত্তায় একপ্রাণতার মিলনে "আমি"ই আমি—এই "মধুর সোঽহং" তত্ত্বের আস্বাদনে বঞ্চিত হইতে হয়। এখানে দেখিবার বিষয় এই যে, অতিসূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত মহাপ্রাণ প্রবাহের ঘনীভূতঃ ভাবটীই "আত্মা" কখন "আমি" কখন "তুমি" ভাবে নিজকেই নিজে আলিঙ্গন করিতেছেন। অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের মহামিলনেও সোঽহং তত্ত্বের আভাস ভাব বিকাশ পায়। ভ্রান্তিময় ভেদ-চিন্তার শাসনেইত মানুষ অখণ্ড দ্বৈত-ভাবকে প্রাণে গ্রহণ করিতে চায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণ সমাধির সোঽহং তত্ত্ব হইতে ভগ্নযোগ সমাধির একপ্রাণতার "মধুর সোঽহং" ভাবের মহামিলন কেমন সুন্দর ও যোগীর উল্লাসপ্রদ, এটি অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না।

অপিচ এখন একটু ঐ একপ্রাণতার সোঽহং তত্ত্বের কথা বলিব। এই মহত্তত্ত্বটী সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্তি চিন্তা বলিয়া পরিহাস করিতেও পারেন। কিন্তু উহা আপততঃ মাথার বিকৃত দোষ বা উন্মত্তের অসার ভাবনা বলিতে

কেহ সঙ্কুচিত না হইলেও বলিব যে, উহার ভিতরে প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ আছে। শক্তি তত্ত্বের নিগূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করিলে জানা যায়, চেতন, অচেতন, উদ্ভিজ্জাদি সকলের মধ্যে এক মহাপ্রাণেরই স্থিতির অভিন্ন ভাব! সুতরাং একই শক্তিতরঙ্গ স্থূল জগতে এবং প্রত্যেক প্রাণীর শরীরাধারে কার্য্য করিতেছে। আপনি যদি অণুপ্রমাণ বালুকণা আর ঐ ক্ষুদ্র কীটাণুর সহিত বিশ্বজনীন বিশুদ্ধপ্রেমে মিশিয়া যান, তাহা হইলে আপনার মর্ম্মভেদী চৈতন্য ও জড়গত চৈতন্য এক হইয়া গেল না? এরূপ অবস্থাতে একপ্রাণতার অখণ্ড তরঙ্গকে কি "মধুর সোঽহং" বলিতে পারা যায় না? এখানে নির্ম্মল উদার ভাবে বুঝিয়া দেখিলে শঙ্কর ভাষ্যের "আমি" এবং একপ্রাণতার 'আমি' একই তত্ত্ব নহে কি? বস্তুতঃ তন্ময়ত্বের ক্ষণস্থায়ী স্থিতি নিবন্ধন তুমির আস্বাদন টুকই মধুর! আমি ও তুমির স্বভাব একই ভাবের তরঙ্গ বাহ্যজগতের আবরণে আমরা শরীরগত বৈচিত্র্য দেখিয়া থাকি। জ্যোতিশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি ফুটিয়া গেলে একপ্রাণতার মহা-প্রবাহ যে আত্মা বা ঈশ্বর, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এখানে সরল চিন্তার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, বিবিধ প্রকার মতের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া অনন্ত প্রসার অনাবৃত স্বাভাবিক জ্ঞানে পরিচালিত হইলে, জানা যায় যে, যোগের ঘনীভূতঃ অবস্থাই সমাধিযোগীরা, তন্ময়, নির্ব্বাণ, অনিত্যযুক্ত ভগ্নযোগ প্রভৃতি যাহারই আশ্রয় গ্রহণ করুন না, প্রত্যেক যোগই সমাধির উজ্জ্বল পথ দেখাইয়া দেয়। পরস্পর যোগের এমনই সহানুভূতি রহিয়াছে যে, তন্ময়ের অতল তলে লইয়া যাইবেই যাইবে। তন্ময়ত্বের গভীরতা বা চিরস্থিতিত্বই জীবের লয় অথবা নির্ব্বাণ, আবার তাহার ভগ্নভাবের স্নিগ্ধ হিল্লোলে জীবের পরিস্ফুট অবস্থায় অখণ্ড চিন্ময় আত্মাতে সম্ভোগ সমাধি হয়। ইহাই দেখিয়া বৈষ্ণব ভক্তগণ বলিয়াছেন "সেব্য-সেবকের ধ্বংস নাই।" তাঁহারা সেবার আস্বাদনটুকই প্রাণের প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে করেন।

ঋষিরা যোগ শাস্ত্রে যত প্রকার সমাধির বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তন্মধ্যে দর্শন-শাস্ত্রলব্ধ সমাধিকেই শেষ সাধন বলিয়া স্থির করেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, এই ষড়বিধ দর্শন মধ্যে সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, এই উভয় দর্শনের যোগসীমায় উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের অখণ্ড শক্তিরও অংশভাবে জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয় অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্য ও জীব চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও নিত্য যোগ আছে। এবং দ্বৈত-ভাব নিবন্ধন ভগ্নযোগেরও পথ প্রশস্ত।

কিন্তু ব্যাকুল-প্রাণ সিদ্ধযোগী যখন যোগের ঊর্দ্ধতম চিন্ময় মহাপ্রদেশে প্রবেশ করেন, তিনি নিজকে হারাইয়া যান। ফলতঃ গভীর ধ্যান-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে সেই সময় একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ, এই ত্রিসত্তা মহামিলনে জীব ভাবটীও আত্মার সহিত মিশিয়া যায়। যোগীর এইরূপ অনুকূল অবস্থা ঘটিলে অল্পকাল মধ্যে জৈবিক লীলা তিরোধান হয়। ইহাকেই (অদ্বৈত) "বেদান্ত দর্শন সমাধি" বলে। সাঙ্খ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রেও যে যে স্থানে অভ্রান্ত সত্যের বিকাশ পাইয়াছে, সেই সকল স্থানেও আত্মার পূর্ণ অস্তিত্বের বিঘ্ন সংঘটন হয় নাই। তবেই বলিতে পারা যায় যে, জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপনীত হইলে "বেদান্ত-দর্শন-সমাধি" সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, মানুষ যতই কেন শুদ্ধানুরাগে যোগনিষ্ঠ ভাবে আকুল হয় না, তথাপি মানবীয় দুর্ব্বল প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া সহসা উন্নত স্তরে উঠিবার জন্য ততটা আগ্রহ বা যত্ন করে না। উহার কারণ, জগদ্দীপ্তিকর দিবাকরের সম্যক জ্যোতির দিকে কেহই চক্ষু রাখিতে চায় না, অথচ আংশিক কিরণ স্পর্শে যথেষ্ট তৃপ্তি বোধ করে। তজ্জন্যই যোগিরা সমাধিরও বিবিধ উপায় নিদ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, এই বিবিধ বিচিত্রময় জান্তব জগতের মর্ম্মভেদ করতঃ যে শক্তি প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে, তাহারই গূঢ়চিন্তার মূলে একবার প্রবিষ্ট হইয়া দেখা যাক্। ত্রিকালদর্শী ঋষিপুঙ্গবগণ ভাবী ক্ষীণ শক্তিসম্পন্ন মানবগণের নিমিত্ত সাধনের সরল ব্যবস্থা যাহা করিয়াছেন, এবং তাহা কত দূর প্রীতিপ্রদ ও শিক্ষা-সুলভ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা বুঝিতে না পারিয়া এটি ভাল, ওটি একরূপ বটে, উটি কিছুই নয়—ইহারই বিচার-বিভ্রাট সত্য বস্তুকে হৃদয়ে গ্রহণ সমক্ষ হই না। সুতরাং সাধনক্ষেত্রটীকেও বন্ধুর করিয়া তুলি; এবং ভীষণ বিভীষিকায় আক্রান্ত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি হতাশ বা নীরস প্রাণে নিয়তকাল দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করি। বুঝিনা যে, প্রাণিজগতে প্রাণীমাত্রই কেহ বা সবিকল্প, কেহ বা নির্ব্বিকল্প সমাধিযুক্ত। পশু প্রভৃতি পাশবীয় জ্ঞানে বিকার ভাবে বদ্ধ থাকিয়াও সমাধিস্থ হয়। উহারা হিতাহিত-বোধ-শূন্য—হিংসা বৃত্তির বশবর্ত্তী সত্ত্বেও আনন্দযুক্ত সমাধি হইতে বঞ্চিত নহে। সুতরাং উহাদের মনের অস্থিরতা নিবন্ধনও সবিকল্প সমাধির ভাবটুক যায় না। তজ্জন্যই যোগীরা ইতর জীব ও শ্রেষ্ঠজীব বলিয়া ভেদ স্বীকার করেন না। গূঢ় চিন্তার মূলে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়, সমাধির প্রকৃত সাধনই যে জান্তব জগতে ঐ ক্ষুদ্র পিপিলি কাটী পর্য্যন্ত মধুর প্রেমে ভেদ-শূন্য! যিনি জাগ্রত কি নিদ্রিত, সকল

সময়েই মহাচৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন, তিনি বাস্তবিক নির্ব্বিকল্প সমাধির অধিকারী। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে আর সবিকল্প চিন্তা-তরঙ্গে অস্থির হইতে হয় না। স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে নির্ব্বকল্প চিন্তা-সমুদ্রের অতল তলে ডুবিয়া যান।

ইতঃপূর্ব্বে সমাধি-তত্ত্ব মধ্যে যে সকল বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রাণায়াম ও সরল-সাধন-সিদ্ধ এই উভয়বিধ সমাধির সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। কালের বিবর্ত্তনে মানবের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি সমূহ পরিবর্ত্তনশীল—ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রাণায়াম সাধনে যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায়, তাহা ভাবী শুভপ্রদ হইলেও উহাতে আপাততঃ কঠোর নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়, তজ্জন্য ব্যক্তি বিশেষে বিপদ সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী—বিশেষতঃ গৌণ কালে আবদ্ধ। কিন্তু সরল সাধন-সিদ্ধ সমাধিতে কোনরূপ বিঘ্নবিড়ম্বনার আশঙ্কা নাই; অতি সহজ ও অল্পসময়-সাপেক্ষ। এই উভয় সমাধি-ক্ষেত্রে তাহার মৌলিক তত্ত্বটী একীভূতঃ সত্ত্বেও বলিবার কথা যে, মানবগণের ইচ্ছা-স্রোত যখন সরল চিন্তা ও সহজ অনুষ্ঠানের অনুগামী এবং গৌণ বিধির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত দেখা যায় না,তখন সমাধি-সিদ্ধ কল্পে কোনরূপ কঠিন সাধনে সময় ক্ষেপ করা কি বিধেয়? সুতরাং শরীর নিগ্রহ পূরক স্তম্ভানাদি প্রক্রিয়া বিধানের কঠোর সাধন যেন বর্ত্তমানে সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। একটু ঘননিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সরল-সাধন-সমাধি, ইহা সকলেরই অবস্থোচিত মঙ্গলপ্রদ। কেন না, স্থুল শরীরে অন্তঃপ্রবেশিনী শক্তি অব্যয় অখণ্ড চিন্ময়সত্তায় আকৃষ্ট হইলে, জড়ভাব সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার ঐ মহাশক্তির অসীম জ্যোতিঃ স্পর্শে স্থুল শরীরস্থিত মন, চিন্তা, ইচ্ছা, রুচি, শক্তি, ভাব বিবেক বৈরাগ্যাদি ঐশীভাবে পূত হইয়া পরস্পর একত্ব মিলন সংঘটন নিবন্ধন সূক্ষ্ম শরীর বা দেব-ভাবসম্পন্ন দেহভাবে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ উহা ভৌতিকতত্ত্বজাত কোন আকার বিশিষ্ট নহে। কখন কখন কোন কোন অলৌকিক ঘটনা ও বিষয় ব্যাপার যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা জড় বিজ্ঞানের ক্রিয়া-যোগ—মহা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত ভাব মাত্র, চিরস্থিতির শক্তিগ্রহণে অক্ষম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ তত্ত্বগুলির সমষ্টি সূক্ষ্ম বা দেব ভাবসম্পন্ন দেহ কখনও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র থাকে না। সময়ে সময়ে ঐযোগ-শরীর-সঞ্জাত ভাবময় বীজ স্থুল ভাবের আকর্ষণে বিজ্ঞান চিন্তার গর্ব্ভে পড়িয়া যায়,তাহাতেই অলৌকিক ঘটনা ও বিস্ময়-মুগ্ধ ব্যাপার সকল দেখা যায়। অথচ স্বপ্নাস্তিত্ববৎ তাহার অস্তিত্ব স্থায়ী নহে।

উহা কেবল বিকল্প চিন্তার এক একটী ছবিমাত্র। যাহা হউক, সরল-সাধন-সিদ্ধ সমাধিতে প্রবেশ করিলে, চিত্তের একাগ্রতা এতই প্রবল হয় যে, পার্থিব দৃষ্টি একবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু সমাধি সাধনের নিগূঢ় তত্ত্বটী ভাবিতে গেলে আমরা কি বুঝিব না যে, অসীম চিচ্ছক্তির অব্যাহত তরঙ্গ মহাকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে! প্রত্যেক প্রাণী কেন, স্থাবর জঙ্গম নদ, নদী; বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে ঐ অখণ্ড মহাশক্তি বিকাশ পাইয়াছে। এই "একাত্ম" জ্ঞানের উজ্জ্বল চক্ষু ফুটিয়া উঠিলেই ত সমাধির প্রশস্ত পথ পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। যতই এই মহাদৃষ্টি বৃদ্ধি পাইবে, ততই বাহ্য সাধনায় অবিশ্বাস জন্মিবে, মন তখন স্বতঃই ব্রহ্মানুরাগে আকুল হইয়া উঠিবে। শ্বাস-প্রশ্বাস কেনই বা বোধ হইবে না? অল্পক্ষণ মধ্যেই অন্তর্মুখিনী চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কমণ্ডলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর ও স্নায়ুবিভাগে শক্তির অমৃত ধারা বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইবে। তখন যোগীর বাহ্য সংজ্ঞা কিছু মাত্র রহিবে না। স্বভাবতঃই শরীরটী শবের ন্যায় নিশ্চল, ইন্দ্রিয় সকল বিকল, চক্ষু থাকিতেও দৃষ্টিহীন ও পলকশূন্য জড়বৎ অবস্থাতেও ভিতরে সহস্রা হইতে নিম্নপ্রদেশের শেষ পর্য্যন্ত যোগ চিন্তার মধুর তরঙ্গ অনিবার্য্য বেগে বহিবে, কোনরূপ বাধা মানিবে না। সরল-সাধন-সিদ্ধ সমাধির স্বাভাবিক যোগ জাগ্রত হইবে এবং অন্তরাকাশ প্রদীপ্ত করিয়া জ্ঞানাগ্নির স্নিগ্ধ শিখা স্থূল ভাবের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক একমাত্র অসীম শক্তিমণ্ডলের গমন-পথ আলোকময় করিবে, কোন প্রকার আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ রহিবে না; যোগীর যোগোচ্ছ্বাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অনন্তর অতি নিশ্চিত সত্য যে, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের যোগ ও সমাধি মধ্যে বেদান্তই প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক। কিন্তু শুভ মুহূর্ত্তের আশ্রয়ে মানবের অনুকূলে স্বাভাবিক সরল-সাধন-সিদ্ধ সমাধিও সহজ ও সুলভ। ইহা একমাত্র অভেদ-ভাবের উপর নির্ভর মাত্র। বস্তুতত্ত্বই পবিত্র প্রেমের সাহায্যে জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, সমাজভেদ, ও পশু পক্ষী মানবে ভেদ বিন্দু মাত্র থাকে না, নির্ব্বিকার নির্ম্মল হৃদয় হইলেই অভেদ ভাব পরিস্ফুট হয়। এবং স্বভাবতই একাত্ম মহত্তত্ত্বের অমোঘ শক্তির মধুর আনুগত্যে সাম্য-যোগ-জনিত মনের একাগ্রতা ও প্রাণভেদী ব্যাকুলতা সহসা জাগিয়া উঠে। চক্ষুর নিমেষ কাল মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন লক্ষ্য স্থির ও সুদৃঢ় হইয়া যায়। মান, অপমান, তিরষ্কার, পুরস্কার, সুখ, দুঃখ সমভাবে পরিণত হইয়া স্বার্থ অহঙ্কারের মস্তক অবনত করিয়া দেয়। শত্রুগণ প্রীতির সম্ভার লইয়া অকৃত্রিম আপ্যায়িত দ্বারা

শান্তি প্রদান করে। মনের উল্লাস-তরঙ্গ মহাবেগে বহিতে থাকে। তখনই ক্ষতাঙ্গ-পঙ্গু ভাইটীর মুখ চুম্বন করিতে আর ঘৃণা জন্মেনা। যোগী একপ্রাণতার মহাবেগে এতই আকুল হন যে, টেলিগ্রামের তারে যেমন আঘাত পড়িলে তাহার সমস্ত কেন্দ্র গুলি কাঁপিয়া উঠে, তেমনই প্রাণিজগতে যে কোন প্রাণির প্রতিই নির্ম্মম ব্যবহার বা কঠোর শাসন হইলে, যোগীর মনে জপ-তারটী বাজিয়া ক্লেশের সংবাদ প্রদান করে। এইরূপ একপ্রাণতার পবিত্র ভাব ও নির্ম্মল শক্তি না আসিলে সমাধি-ক্ষেত্রে সাধনক্ষম হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক, সমাধি-তত্ত্বের বহুবিধ প্রণালী সত্ত্বেও ঐ অভেদ সাধনটীই সহজ ও সরল। এখন বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব শক্তির উচ্ছ্বাসরূপ সন্তানত্ব ভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রাণীর সহিত সখ্য বন্ধন ছেদন করিয়া বিপরীত ঘটনার মূলে শরীর পাত করিলে, বিধান লঙ্ঘন অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। এজন্য সকলেরই একাত্মবাদ মহত্তত্ত্বের প্রতি অনুরক্ত হওয়া বাঞ্জনীয়। এই প্রাণিজগতের প্রাণযোগ সিদ্ধি হইলেই ত যোগীরা বুঝিতে পারিবেন যে, শনৈঃ শনেঃ সমাধির উচ্চতর স্তরে উঠিবার শক্তি দৃঢ় হইতেছে এবং নিগূঢ় ধর্ম্মের সাধন সাহায্যে সকাম কর্ম্মগ্রন্থী সমূহ শিথিল হইয়া যাইতেছে, ভগবদ্‌কৃপা যেন চিরশান্তির উজ্জ্বলপথে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের মাভৈঃ আশ্বাস বাণীদ্বারা মহামিলনের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে।

হায়! ঈদৃশ আশার পবিত্র ছায়া স্পর্শ করিয়াও মানুষ কেন যে স্বার্থবশতঃ পরস্পর ভেদসঙ্কুল ভীষণ প্রবৃত্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, বড়ই দুঃখের কথা! সিদ্ধকাম মনীষীদিগের জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াও প্রাণ যে কেন জাগে না, কেন যে শয়নে, স্বপনে, নির্জ্জনে, স্বকামকর্ম্ম-বন্ধনে থাকিয়া চিত্তকে ঈশ্বরে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারা যায় না—কেন যে সিদ্ধ সমাধি সাধনের জন্য প্রাণ আকুল হয় না—কেবল ভেদ-কলঙ্কে আচ্ছন্ন থাকিতেই চায়, ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? তাই বলিতেছিলাম, সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তিরই ঐ স্বার্থকলুষিত ভেদের দাসত্ব-স্পৃহা অনিবার্য্য। অভেদ চিন্তার অনুশীলনে যে বজ্রবৎ হৃদয় দস্যু প্রকৃতির ব্যক্তিও দেব ভাব গ্রহণ করে, এটি কেহই একবার ভাবিয়া দেখেন না। অভেদ সাধনই যে সকল প্রকার মুক্তি ও যোগ সমাধির প্রশস্ত পথ। এই পবিত্র পথে আসিলেইত নিগূঢ় ঐশীতত্ত্বের প্রত্যক্ষ্যানুভূতির আশা প্রবল হয়, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা

চলিয়া যায়, স্বর্গীয় অমৃতধারায় অমরত্বলাভ করে, ইহা কি কেহ মনে করেন? একবার হৃদয় ঢালিয়া দিয়া অকৈতব ভক্তি ও অভেদপ্রেমে ডুবিতে পারিলে, প্রাণমুগ্ধ তত্ত্ব বস্তুর কি অভাব থাকে, ভগবদ্‌কৃপা সকলই বহন করিয়া দেয়। যোগী অল্পসময়েই সিদ্ধকাম হইয়া আর কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করেন না। বলিতে কি, তিনি আনন্দময় মহাকোষকেও ভেদ করিয়া অসীম জ্যোতিঃমণ্ডলের প্রবেশদ্বারে প্রবিষ্ট হন। তখন আর সুখ, দুঃখ, আশা নিরাশা প্রভৃতি ভোগাদির চিন্তা বা ক্ষোভ কিছুমাত্র থাকে না। কিঞ্চিৎ কালমধ্যে জীব-ভাবের অস্তিত্ব অসীম ব্রহ্মসত্তার ভিতরে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই যোগশেষ সমাধি।

দশম উল্লাস।

ব্রহ্মসূত্র।

ব্রহ্ম ক্লীব লিঙ্গ—পিতৃ মাতৃ উভয় ভাবে পূর্ণ। সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি, পুরুষ, জ্ঞ—এই ত্রিসত্তা মিলিত শক্তিই জগতের উৎপত্তির হেতু নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ সাঙ্খ্য সূত্রের অব্যর্থ বিধানে প্রকৃতিই আদি কারণীভূতা। এখন বুঝিতে হইবে, জ্ঞ—অর্থে সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং একই শক্তি পার্থিব আধারে স্ত্রী-পুরুষ ভাবের প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হইলেও, স্থূলাতীত প্রকৃতিই স্বভাবময়ী মহাশক্তি, ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। যোগিগণের অন্তরাকাশ রূপ উজ্জ্বল দর্শনে জ্যোতিশ্চক্ষুতে ঐ ব্রহ্ম শক্তিরই পিতৃ মাতৃ ভাবের প্রতিবিম্ব দর্শন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মশক্তি একই ভাবের তরঙ্গ পুরুষ ও প্রকৃতি। মূল শক্তির বিন্দুমাত্রও স্বাতন্ত্র্য নাই—স্থূল চক্ষুর দৃষ্টিই ভিন্নতা প্রদর্শন করে। বেদান্ত মতে অনাদি নিত্য আত্মা ব্যতীত স্থূল জগৎ সমুদয় প্রপঞ্চময় যে স্থিরিকৃত হইয়াছে, তাহার কারণ এই, ভূততত্ত্বজাত কোটি কোটি জগৎ সীমায় পর্য্যবসিত। তজ্জন্য যোগিগণের অসীম শক্তিমণ্ডলে প্রবেশ সম্বন্ধে বিঘ্ন সংঘটিত হয় এবং উহাদ্বারা ব্রহ্মদর্শনের পথকে রুদ্ধ করে। তাই শাঙ্কর-ভাষ্যে স্থূল জগৎ পরিত্যক্ত হইয়া একমাত্র (আমি) ব্রহ্মই অদ্বিতীয় অনাদি নিত্য—আর সকলি ভ্রান্তি মরীচিকাময় মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু সাঙ্খ্য ও বেদান্ত উভয় মতের নিগূঢ় চিন্তার মূলে প্রবেশ করিলে জানা যায়, প্রকৃতি অর্থে মাতা বা পরমাত্মা—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহাতেও এক ব্রহ্মকেই জানাইতেছে। পুরুষ অর্থেও ব্রহ্ম। বেদান্তের সিদ্ধান্তেও এক আত্মা ভিন্ন আর সকলই ভ্রান্তি। সূক্ষ্মভাবে ভাবিয়া দেখিলে প্রকৃতি ও পুরুষ একই ব্রহ্মসত্তা। তবে জড় জগতের বিচিত্রতায় অনৈক্যবাদের আতিশয্য বশতঃ সত্য বস্তুকে বিভিন্ন বুঝিব কেন? কেনই বা ভাব ভেদত্ব বিকারে অপ্রক্ষিত অভ্রান্ত শাস্ত্রের উপদেশ সকল উপেক্ষা করিব। কেনইবা বেদ তন্ত্র পুরাণাদির মর্ম্মভেদী স্বাভাবিক সত্য গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতির পথে অগ্রসর হইব না? কেনইবা মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির সমাজ মধ্যে যোগিগণের সাধনলব্ধ অভ্রান্ত সত্য গুলি হৃদয় পটে চিত্রিত করিয়া রাখিব না? নিশ্চয়ই বলিব যে, সার্ব্বভৌমিক সরলতায়

অভাবে মানব সমাজ, নৈতিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মের পার্থক্য-জনিত মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, এবং নানা মতের সংঘর্ষণে কুটিল বৃত্তি সমূহেরও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, সকলি স্বার্থের প্ররোচনে ভ্রান্তিময় তিমির-তরঙ্গে নিমজ্জিত হইবে, বিচিত্র কি? মানব চরিত্রকেও যে পাশবীয় ভাবে আক্রান্ত করিবে, একথার সংশয় কি? দম্ভ দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত হইবার পথ প্রশস্ত থাকিবে না কেন? বস্তুতঃই সকল প্রকার শরীরাধারে অখণ্ড জীব-ভাবের সম তরঙ্গটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিণত হওয়াতে শাশ্বত প্রেমের সখ্যবন্ধনও শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে মানবগণ জীবত্বের গূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমৎসুক নহে, বরং ভেদসঙ্কুল বিপজ্জালে জড়িত জনিত নিম্নস্তরে দাঁড়াইয়াছে। কেমন করিয়া জানিব যে, নির্ম্মল সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্পর্শ করিতে শক্তি জন্মিবে। সমভাব জৈবিক তত্ত্বজ্ঞ না হইলে, ভেদের দুর্ভেদ্য আবরণ ঘুচিয়া না গেলে, বাসনার ঘন ঘূর্ণনে না পড়িলে তবেই "ব্রহ্মসূত্র" জানিবার জন্য চিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইবে। নতুবা দেহী মাত্রেরই অন্তঃপ্রবিষ্ট একই জীব-চৈতন্যকে শতপাত্রে সূর্য্যের ন্যায় স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রূপে দৃষ্টি করিয়া সঙ্কীর্ণতার কুজ্ঝটিকায় মাত্র থাকিতে হইবে। কখনই বাহ্যান্ধকার হইতে অন্তরালোকে প্রবেশ করিবার উপায় থাকিবে না। বহু চেষ্টাতেও অন্তশ্চক্ষুর বিকাশ সম্ভবপর নহে। আমি যদি ঐ সর্ব্বগত "একত্ব" জৈবিক তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে উদাসীন হই, তাহা হইলে অবশ্যই বলিব যে, আমার রুচিশক্তিরও আকাঙ্ক্ষার বল দুর্ব্বল হইয়াছে। এইরূপ অবস্থাতেই নিরাশার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে। এবং আজীবন তীব্র দহনে দগ্ধীভূত হইতে হয়।

এখন এটি কি চিন্তার বিষয় নহে যে, যখন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্ম তত্ত্বের অনুশীলনে অধিকার জন্মে না, তখন ঐ "ব্রহ্মজ্ঞান" কিরূপ সাধনে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহারই একটু চিন্তা করা আবশ্যক। জ্ঞানের চরম মীমাংসা সোঽহং অর্থাৎ "আমি"—কিন্তু মানবমণ্ডলির মধ্যেও পরস্পর আপনাকে আমি বলে। কেন বলে?—ইহার ভিতরের তত্ত্ব ঐ আমিই মহাপ্রাণ—উহাই দেহাধারে একপ্রাণতার সমতরঙ্গ। ইহারই অভেদ সাধন হইলে স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানের আলো জ্বলিয়া উঠে। তখনই হৃদয়ের উজ্জ্বল খনি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ পায়। এখানে একমাত্র ব্রহ্মই শিক্ষা ও দীক্ষার গুরু। তিনি অনবরত মধুর শব্দে এই শিক্ষাই দিতেছেন যে, সকল প্রাণী মধ্যেই একই ব্রহ্ম-

চৈতন্য স্থিতি করিতেছেন যে, তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে পরস্পর দৈহিক ভাবের মধ্যে একপ্রাণতায় ভেদভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা কেবল স্বার্থ-জড়িত আসক্তির উত্তেজনা মাত্র। সুতরাং উহা সর্ব্বাধারে অখণ্ড ব্রহ্মশক্তির পূর্ণপ্রবাহ মহা প্রাণকে ভিন্ন ভিন্ন দেখাইতেছে। ইহাতে মানব সকলের শরীরস্থিত জীবত্বের ভেদ কম্পন এবং উদার প্রেমের ভিতরে যে সঙ্কীর্ণতার ছায়া পড়িবে, তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু এমন অবস্থাতেও সাধন বল প্রবল থাকিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়ে জীবের ব্যষ্টি ভাবের দৃষ্টি, তাহাও সমষ্টি ভাবের সঙ্গে মিশিয়া অনন্ত প্রসার মহাশক্তিতে এক হয়। এমত স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মং" ইহা ভিন্ন সত্য বস্তু আর কি বুঝিব? মানুষ ভেদপ্রবৃত্তির বশে পরিমিত পার্থিব আধারে ব্রহ্মের পূর্ণ স্থিতির কারণ অভ্রান্ত ভাবিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের চরম সীমা মনে করে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। কারণ বিকারগ্রস্ত মানব সকলের শ্রেষ্ঠাভিমান ও আভিজাত্যের গৌরব চূর্ণ না হইলে কি কখন ব্রহ্ম সূত্রের জ্বলন্ত অক্ষর পরিচয় হয়? আহা! তরঙ্গশূন্য স্থির সমুদ্রের ন্যায় উচ্চ-নীচতার বেগ বিনষ্ট না হইলে জগচ্চিত্র-মগ্ন বহিশ্চক্ষুর স্থূল দৃষ্টি চলিয়া না গেলে, শাশ্বত প্রেমের সহিত সকল প্রাণীকে আলিঙ্গন না করিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিতে কি সঙ্কোচ বোধ হইবে না? কেননা, জাতিগত ধর্ম্মের তারতম্য নিবন্ধন অন্তঃশ্চক্ষুর দৃষ্টিও যে ক্ষীণ হয়। ইহাতে কি বলিতে পারা যায় না যে, নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া অসীম ব্রহ্মজ্যোতিঃ সর্ব্বাধারে অনুভূত হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানের মূল সাধনই "একাত্ম" ময় দর্শন। বিন্দুমাত্র ভেদ চিহ্ন থাকিলে, সাধন-সিদ্ধ-সংসাধনের আশা অসম্ভব। একটী কীটাণু হইতে মহাযোগী পর্য্যন্ত একই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ যিনি প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের স্বাভাবিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ পাইতেছে। তবেই জানা যাইতেছে যে, সকল প্রকার দেহাশ্রিত শক্তিই কারণ রূপিণী মহাশক্তি। উহা সমস্ত বিশ্বভেদ করিয়া স্থিতি করিতেছে। মোহ-তিমির-ছায়া চলিয়া গেলে, অসীম ব্রহ্ম-সত্তাকে আর সসীম ভাবে বদ্ধ করা যায় না। একই অনন্ত মহাশক্তি অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই থাকেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যখন মহাকাশ-ব্যাপী একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু রহিল না, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? একথার অতি সমীচীন উত্তর এই যে, জান্তব জগতের প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরে যদি ঐ "আমি"কেই দর্শন করি, তবেই ব্যক্তিগত অহমিকামিত্বের আমি আর রহিল না—পরস্পর আমার আমি "আমি"র সঙ্গে

যোগ হইল। ইহাতে কি ব্রহ্মসূত্রের মূল তত্ত্ব বুঝিব না? অবশ্যই বুঝিব। এবং হৃদয়ে গ্রহণ করা বাহ্যাবরণ ভেদজন্য অকৃত্রিম ব্যাকুলতার আশ্রয় লইতে ঐকান্তিক যত্নই বা কেন করিব না? অভ্রান্ত সত্য-সাধনতাইত সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসীর মনের উদ্দেশ্য। ভ্রান্তি-তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া ব্রহ্ম-চিন্তার দৃঢ়তার প্রতি উপেক্ষা করা কি বিধেয়?

ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরের নির্ভর ব্যতীত জানা যায় না। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, এই সকল দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিলেও ব্রহ্মসূত্রের গূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে। সৎশাস্ত্র দ্বারা অবশ্য গন্তব্য পথ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু এটিও সত্য যে, বহুবিধ শাস্ত্রের মত-বিভিন্নতার জন্যও নানা দিকে ভ্রমণ করিতে হয়। পরিশেষে প্রক্ষিপ্ত মতের আবরণে বদ্ধ ভাবে থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। কেননা, উহাতে হৃদয়ে স্বাভাবিক মুক্ত জ্ঞানের পরিস্ফূরণ রুদ্ধ হইয়া যায়। যোগিগণ সাধনের চরম-সীমায় উপনীত হইলে আর শাস্ত্র জ্ঞানের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখেন না; সমস্তই ভুলিয়া যান। তাঁহারা হৃদয়েই ব্রহ্মপ্রদত্ত উজ্জ্বল উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। নির্ভরশীল যোগীরাই বাল-স্বভাব-সুলভ সরল ভাবে ব্রহ্মগ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। এবং অনায়াসে অতর্কিত সর্ব্বজনগ্রাহ্য মহাবিজ্ঞানের মহত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়েন।

বস্তুতঃই ব্রহ্মসূত্র জানিবার প্রধানতম উপায়, মহাশূন্যভেদী (চিৎশক্তি) স্বাভাবিক জ্ঞান। ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ধ্যান-যোগে সেই মহাসম্বিৎ প্রভাবে হৃদয়েই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন। এবং তাঁহারা অন্তরাকাশে ব্রহ্মসূত্রসমূহ অপার্থিব শ্রুতিতে শ্রবণ করত ব্রহ্মমীমাংসায় নিঃসন্দেহ হন। বেদের শিরোভূষণ উপনিষদ সকল তাঁহাদের হৃদয় হইতেই প্রকাশ পায়। এখনও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ প্রকার প্রাণী মধ্যে স্বাভাবিক প্রজ্ঞাই প্রকটিত হইতেছে। বাস্তবিকই ব্রহ্মসূত্র জানিবার মূল কেন্দ্র হৃদয়—ইহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কেননা পৃথিবীতে যত প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সমস্তই যোগিগণের হৃদয়-নিঃসৃত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহার মধ্যেও কল্পনা-কলুষিত ভাব যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ফলতঃ তাহা ব্রহ্মসূত্রের সংস্পর্শ-বর্জ্জিত। সুতরাং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পূত প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত আলোকে মহত্তত্ত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, সময়-চক্রের বিবর্ত্তনে অজ্ঞান তমঃ-বিনাশকারী ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা—একবারে চলিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য প্রকৃত

ব্রহ্মসূত্রের স্বাভাবিক তত্ত্ব সম্যক রূপ পরিস্ফুট দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ঐ কল্পনা-প্রক্ষিপ্ত শাস্ত্র জ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া আমরা মহাজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাঁহারা হৃদয়ে স্বাভাবিক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারই অভ্রান্ত গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হন। বাহিরের গ্রন্থ-বদ্ধ শাস্ত্রে, নৈসর্গিক নিত্য সত্যের অনন্ত পূর্ণ সত্তার ভিতরে প্রবেশ-শক্তি জন্মে না। কেননা, বহিঃশাস্ত্রবিৎ উপদেষ্টাগণ কঠোর নিয়মের বশীভূত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিজেও ভাবেন না, অপরকেও সহজ সুগম পন্থা দেখাইতে ইচ্ছা করেন না। এই কারণেও কঠোর নীতির প্রখর তেজে অতি নিকটের বস্তুও বাহ্যাবরণে অদৃশ্য হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র কেমন করিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইবে?

বাস্তবিক ব্রহ্মসূত্র হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলে, কল্পনা-কলুষিত শাস্ত্র-চিন্তার পিপাসা ঘুচিয়া যায়। চিত্তের ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রবল হইতে থাকে। আর একথাটিও অতি সত্য যে, একমাত্র নির্ভরের আগ্রহ আলিঙ্গনে উল্লাস-তরঙ্গ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া উঠে। তৎসঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মলা চিন্তা-শক্তিও বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ প্রেমের দৃঢ়বন্ধনে আকৃষ্ট হইয়া স্থির ভাব অবলম্বন করে। মন তখন স্বাভাবিক পথের পথিক হইয়া অল্প সময়েই ব্রহ্মকৃপা সংস্পর্শে ব্যাকুল হয়। নির্ভরও তখন ঈশ্বরমুখিনী নির্ম্মলা চিন্তার সহিত মধুর আপ্যায়নে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশের জন্য বাহ্য আবরণ-গুলি ছাড়িয়া দেয়। অন্তরেন্দ্রিয় সমূহও সেই মহজ্জ্যোতি স্পর্শ করিয়া শুদ্ধাবস্থায় চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাবটী বিনাশ জন্য ঐকান্তিক ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে। ঐ সঙ্গে অপার্থিব শ্রুতিরও শ্রবণ শক্তি প্রকাশ পায়। তখনই অভ্রান্ত গুরু পরব্রহ্মের অব্যর্থ উপদেশ সকল ঐ অনাহত শ্রুতিতে শুনা যায়। হৃদয়-ফলকে জ্বলন্ত অক্ষরে উপর্য্যুক্ত ব্রহ্মোপদেশগুলি মুদ্রিত হইয়া থাকে। উহাই শ্রুতিনামে অভিহিত! রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সকলের মধ্যেই সেই শ্রুতি বা বেদতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। নানা প্রলোভনে ও আসক্তির আবর্জ্জনায়, হৃদয়-স্থিত শ্রুতিশক্তি বধির হইয়া যায়, তজ্জন্য উক্ত বেদতত্ত্ব শুনা যায় না—প্রকাশ হইবে কি রূপে? সুতরাং কল্পনার আবরণে তাহা সম্ভবপর নহে। এই সকল দুর্ঘটনা নিবন্ধন পূর্ণ চৈতন্যময় পরমগুরুর উপদেশে পরিচালিত হইতে ইচ্ছা হয় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, এটি কি বুঝিব না যে, প্রক্ষিপ্ত মতের বদ্ধ ভাবে আমরা কোথায় রহিয়াছি? অনির্দ্দিষ্ট দুর্গম পথে পড়িয়া যে ভীষণ

যন্ত্রণা পাইতেছি, তা কি কখন মনে করি। হায়! হৃদয় ত জাগিল না! অন্তশ্চক্ষু ত ফুটিল না! মন ত বুঝিল না। বৃথাড়ম্বরের সহিত অনিত্যকে আশ্রয় করিয়া যে সকলি গেল। ঐ প্রক্ষিপ্ত শাস্ত্রের তীব্র আঘাতে যে বন্ধুর পথে ঘন তিমির ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না!

বস্তুতঃ এই সত্য, সিদ্ধ যোগিগণ হৃদয়েই গ্রহণ করেন। ব্রহ্মসূত্রের মূলসূত্র হৃদয়-গ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়া জগৎকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত কতই যে ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা কে বুঝিবে। তাঁহারা শাস্ত্র-চিন্তার অতীত স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ মহত্তত্ত্ব ব্রহ্ম সূত্র যে সংসার-পাশ-মুক্ত হইবার এক মাত্র সম্বল, তাহা সকলের প্রাণ-পটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্র-যুক্তি ও বিচার জ্ঞান পরাস্ত।

অতঃপর এটিও অত্যুক্তি নহে যে, স্বাভাবিক যোগ-সূত্রেরও মূল সূত্র হৃদয়-ভেদী ব্রহ্মজ্ঞান—যাহা শিশু ভাবের ভিতরে বিদ্যমান আছে। আমরা সেই সময়ে কি ছিলাম,এখন কি হইলাম—বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শিক্ষার দ্বারা তাহা হইতে কি বঞ্চিত হই নাই? শৈশবের সার্ব্বভৌমিক সরলতা ও অভেদ প্রেমের চাওনী এখন কোথায়? শত শত গ্রন্থ পাঠ করিলেওত সেই সুধাময়ী নির্ম্মলা চিন্তার সরল দৃষ্টিতে আর প্রকাশ পায় না? স্বার্থশূন্য ঐ শিশু যোগীর অবস্থার সঙ্গে সরল হাস্য ও রোদনের শিক্ষ-দাতা কে? আহা! ঐ শিশু-চরিত্রের মধ্যে আনন্দময় মধুর যোগে তাঁহাকে ত আর দর্শন অসম্ভব! হায়! ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি সকলের অবস্থোচিত শক্তি যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনই যেন ঐ শিশুভাবের স্বর্গীয় সরল শিক্ষাগুলি আকাশে বিলীন হইয়া গেল,—হইল কি? কেবল ভেদ-সঙ্কুল সংসার-তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কিন্তু আশ্বাসের কথা এই যে, এমন সঙ্কট সময়েও "ভগবদ্কৃপা" একবারে চলিয়া যায় না। ইহাতেই জানিব যে, ভগবানের নিকট সতত অপরাধী থাকিলেও তিনি মঙ্গল বিধানই করেন। বিপদ সমূহ যে তাঁহার দয়ার দান! আপনারা বুঝিতে পারিনা বলিয়া অশান্তি ভোগ করি। দুঃখের পশ্চাতে যে সুখের অমৃত-ধারা বহিতে থাকে, তাহা ক্ষণ কালের জন্যও মনে করি না। কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতি মুহূর্ত্ত হৃদয় মধ্যে ঐ অনাহত শ্রুতিতে শুনা যায়। ভয় কি! ভয় কি! শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, স্থবির, সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মবিধানের কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হইতেছে। আমরা সংসারের বিবিধ প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া ভগবানের বিধান-মাহাত্ম্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে

সক্ষম হই না। বস্তুতঃই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে কিরূপে বুঝিব?

এখন অবশ্যই বলিব যে, একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর এবং সরল সাধন দ্বারা অন্তঃকরণকে ব্রহ্ম-চিন্তা-সূত্রে দৃঢ়রূপে বাঁধিতে পারিলে, যোগারূঢ় অবস্থাতেও মহত্তত্ত্ব লাভ করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহার অন্তঃকরণ সকল সময় স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ থাকে, তাঁহারই হৃদয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান পরিস্ফুরণের কোন বিঘ্ন হয় না। নির্ম্মল সরসীর অতলতলে একটী উপল খণ্ড ফেলিয়া দিলে যেমন তাহার সম্যক অবয়ব দেখা যায, তেমনই বাহ্যচিন্তা-বিহীন পবিত্র হৃদয়েই তত্ত্ব-জ্ঞান মহারত্ন প্রত্যক্ষ হয়, ইহা সময়-সাপেক্ষ নহে। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের বৃদ্ধও স্থূল ভাবে আকৃষ্ট হন, এবং ষোড়শ বর্ষীয় যুবাও স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞানে জগৎ স্তম্ভিত করিতে পারেন। এই ব্রহ্মসূত্র সকলেরই জানিবার অধিকার আছে। ইহা কোনরূপ বর্ণগত ধর্ম্ম বা সমাজ-নীতির অধীনে বদ্ধ নহে। হৃদয়ই ইহার ক্ষেত্র—শাশ্বত প্রেম ইহার বীজ, অন্তরশ্রু দ্বারা অঙ্কুরিত হয়। ইহাই ব্রহ্মকলা-দ্রুম। নির্ভরের সহিত ইহার মূলে পড়িয়া রহিলে, কিছুরই অভাব থাকে না। অযাচিত ভগবদ্ কৃপাতে সমস্তই পূর্ণ হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মসূত্রের গভীরতর প্রদেশে মহা চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মার অনন্তব্যাপী অব্যক্ত জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। জড়-জগতের ভিতর দিয়াও ব্রহ্মের লীলাতরঙ্গ প্রত্যক্ষ হয়। নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, অসংখ্য প্রাণিজগতে সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেহীর মধ্যে ঈশ্বরের লীলা-রহস্য জানিবার শক্তি আপনা হইতেই হয়। যে হেতু নিত্য ভাব অনন্তব্যাপী—জগৎ সমূহের আভ্যন্তরীণ যে ঐ অস্পর্শ নিত্যলীলার তরঙ্গ—একই ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া যোগিগণ মহালীলায় নিমজ্জিত হন। স্থূল চিন্তার শক্তি ঘুচিয়া গেলে, মহাশূন্যে নিত্যভাব ও স্থূল জগতের ভিতরে লীলাভাব এক হইয়া যায়। "তখন একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহা ভিন্ন আর কিছু থাকেনা। জগত রূপ আবরণ অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিতে ডুবিয়া যায়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পরিশিষ্ট।

পূত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট মহত্তত্ত্ববিৎ শঙ্করাচার্য্য "অদ্বৈত" মতে একমাত্র সোহহং সিদ্ধান্ত দ্বারা "আমি" ভিন্ন "তুমি"র অস্তিত্ব রাখেন নাই এবং জগৎ সমূহ ভ্রান্তির এক একটী কল্প মাত্র, এই চরম মীমাংসায় রসনা পরিচালনা করা একটু ভাবিবারই কথা! মহামনস্বী রামানুজ, মহাতেজস্বী মাধবাচার্য্য, মহত্তত্ত্ববিৎ নিম্বার্ক স্বামী প্রভৃতি মুক্ত পুরুষগণ শাঙ্কর-মতের সোহহংবাদ প্রতিবাদ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভক্ত সম্প্রদায় মধ্যে যথেষ্ট আদরের ও প্রীতিপ্রদ। এমত স্থলে ঈদৃশ উচ্চ তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর সম্ভব, বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন যে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে সহসা এরূপ রুচি ও প্রবৃত্তির বেগ প্রবল হইল, জানি না। তবে ইহাও বুঝিতেছি যে, সাধু সঙ্কল্প দ্বারা যদি তত্ত্বশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাতে আগ্রহ প্রদর্শন করা ত উচিত। যাহা হউক, ইহার আলোচনায় সাম্প্রদায়িক মতভেদ বা অপ্রীতিকর হইলেও কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হওয়া দোষের নহে, ইহাই ভাবিয়া যতটুকু বুঝিবার শক্তি জন্মে, তাহাই জানিবার আশা প্রবল হইতেছে।

মহামনস্বী রামানুজ "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" দ্বারা সোহহং তত্ত্বের খণ্ডন জন্য অনন্তব্যাপী ঈশ্বরের অংশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ঐ অংশরূপে ঐশি শক্তি বহু ভাবে বিভক্ত হইয়া এক একটী জীবনামে অভিহিত হইয়াছে। পুরুষ-পুঙ্গব মাধবাচার্য্য, তিনিও তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈতবাদে তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্ক স্বামী প্রভৃতির অচিন্তাদ্বৈতবাদ মতে, জীব ও ঈশ্বরের তটস্থ শক্তির অংশে ভেদ শক্তি, কিন্তু শক্তিমানের অভেদ সত্তায় উহা অভেদ। এইটুকু বিশেষত্ব। এখন বলিবার কথা এই যে, নিরাকার ঈশ্বর * খণ্ড হন কিরূপে? এই সকল বিষয় ভাবিতে গেলে, উপরোক্ত অমিত-প্রতিভাবিশিষ্ট মহাপুরুষগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। বস্তুতঃ তাহা চিন্তারই বিষয়,

---

* ইহা ভূত তত্ত্ব সমষ্টি—হস্তপদাদি বিশিষ্ট আকার নহে, অব্যক্ত জ্যোতির্ম্ময় বা চিৎশক্তি নাদব্রহ্ম।* অথচ ঐ জ্যোতি শক্তি শব্দ একই (অ) ওঙ্কার অনন্ত নিত্য। অনাহত শব্দের কি আকার আছে?

সন্দেহ নাই। তবে কি বলিতে পারি না যে, ঐ সকল মহত্তত্ত্ববিৎ উপদেষ্টাগণ উন্মাদিনী ভক্তির প্রকটতাড়নায় ঐরূপ মীমাংসা করিয়াছিলেন? নতুবা তাঁহারা কি জানিতেন না যে, নিরাকার তত্ত্ব সৃষ্টিভাবে পৃথক হইতে পারে না। জীব যে ব্রহ্মচৈতন্য সত্ত্বা—ভাবরূপ চৈতন্য! তাঁহারা এটি কি চিত্ত করেন নাই? নিশ্চয়ই উহা ভাবিয়াছিলেন। তবে ইহার মূল কারণ এই যে, অদ্বৈতবাদ মতে জগতের মধ্যে জৈবিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টিতে না আসিলে, সেব্য সেবকের মিলন ও উপাসনাদি কেহ সহজে বুঝিবে না, তাই তাঁহারা বিশ্বের বিচিত্র ভাব দর্শনে জীবকে পৃথক পৃথকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটিও অতি নিশ্চিত যে, অব্যয় অখণ্ড শক্তিখণ্ড রূপে আসিতে পারে না,—ইহা যদি জ্ঞানের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তই হয়, তাহা হইলে মানব সকল কি পূজা প্রার্থনা, ধ্যান ধারণা হইতে বঞ্চিত থাকিবে?—কখনই না। অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্যই ভাবরূপ জীবের সঙ্গে নিত্যকাল জড়িত থাকিয়া উপাসনাদির আস্বাদন ঐ "জীব ভাবাপন্ন" যোগীর যোগচিন্তার ভিতরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্বরূপ শক্তির উচ্ছ্বাসই যে জীব, উহা কেবল ভাবের তরঙ্গ মাত্র। ভক্তির মধুর আপ্যায়নে ভক্ত-হৃদয়ে বিবিধ ভাবের তরঙ্গ বিস্তার হইয়া বিভিন্নতা প্রদর্শন করে। এমত স্থলে জ্ঞানের পথে উপনীত হইলে শঙ্কর মতের প্রতিও অবিশ্বাস করা যায় না। আবার ভক্তির আশ্রয়ে থাকিলেও যে উপর্য্যুক্ত মুক্ত পুরুষদিগের মীমাংসাগুলি একটু বুঝিবার কথা। কিন্তু এই উভয়মত সম্বন্ধে কোনরূপ বিচারের প্রয়োজন না হইলেও, ইহার ভিতরে যাহা প্রকৃত সত্য, তাহার অন্বেষণ করা নিরাশার কথা নহে।

চিন্তার শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে সসীম স্থূলতত্ত্ব সমূহ চিন্ময় অনন্ত ব্রহ্ম-শক্তিতে ডুবিয়া যায়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মতে দ্বৈতবাদটি থাকে না ও বিশ্ব বৈচিত্র্য চিত্র-সমূহ মরীচিকাময় ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু নহে, একমাত্র "ব্রহ্মঽহং" নিত্য "আমি," এতদ্ব্যতীত সকলই ভ্রম। এই সত্যের উপর কোন কথা চলে না বটে, কিন্তু আবার জগত্তত্ত্বের ভিতরে আসিয়া যদি চিন্তা করা যায়, তাহাতে স্থূল তত্ত্বকেও ভুলের বস্তু বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, নিরাকার ঐশীশক্তির ভিতরেই ত উহা স্থিতি করিতেছে। অধিক কি, এই যে আমাদের শরীরটি, ইহারও ত অন্তর্বাহিরে ওতঃপ্রোতভাবে সেই ঐশী শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমরা যখন সাকার তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের অন্তঃকরণে জড়জগৎ যে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত—এটিও প্রাণে উদয় হয়।

ভাবিয়া দেখিলে, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি লইয়াই ত তিনি পূর্ণ? ঈশ্বরের ত সময় বা কালে কোন বস্তুর অভাব থাকে না। তবে সাকারতত্ত্বকে ভ্রান্তি-মূলক কেমন করিয়া বলা যায়? বিশেষতঃ প্রজ্ঞা-চক্ষে স্পষ্টই দেখা যায় যে, একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, একবিন্দু শোণিত-শুক্রে প্রাণী-সকলের শরীর-গঠন-কার্য্য প্রকাশ পাইল। মাতার কঠোর-জঠর-গৃহে সন্তানটিকে কে রক্ষা করিল? এই সকল ব্যাপার কাহার অমোঘ ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে? তবে জড়ের ভিতরে চৈতন্যের স্থিতি, এটি কি বুঝিব না?

এই সকল কথার উত্তর কি বলিতে পারি না যে, জড় ও চৈতন্যের একত্র মিলনের স্থান শরীরটি হইলেও শরীর-বিজ্ঞান মহা বিজ্ঞানের নিকট পরাস্ত। যেমন অকূল সমুদ্র মধ্যে ফেন খণ্ড সকল ভাসিতেছে, তাহাদের সমস্ত অঙ্গ ঐ সিন্ধু জলে আর্দ্র থাকাতেও তাহা সীমায় অবস্থিতি করে। উক্ত ফেন সমূহ সমুদ্র গর্ভে ভাসিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাকে আয়ত্ত করিবার উহাদের সাধ্য নাই। তদ্রূপই জড় বিজ্ঞানের পরিচালনায় সাকারতত্ত্ব পূর্ণ শক্তি গ্রহণে সক্ষম নহে। বস্তুতঃই অনন্তের দিকে দৃষ্টি পড়িলে, আর জগতকে দেখা যায় না, তজ্জন্যই পুরুষপুঙ্গব শঙ্করাচার্য্য স্থূলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং জগৎ ভ্রম মাত্র। আবার ঘননিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সাকার তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, মহামনীষী রামানুজ প্রভৃতির মতে অখণ্ড নিরাকার শক্তিও চলিয়া যায়। অথচ তাঁহারা দেখিলেন, ঐ সমূহ স্থূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছে। সুতরাং আমরা জন্ম ও মৃত্যু, উৎপত্তি, ক্ষয়, স্থিতি, অস্থিতির ভঙ্গুর ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। নিত্য নিরাকার অসীম সত্তা-সিন্ধু মধ্যে চির-নিমজ্জিত থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। জড়চক্ষু-সুলভ স্থূলের ভুলে পড়িয়া সত্যস্বরূপকে পার্থিব ভাবের আবরণে সুসজ্জিত করিতেছি এবং মূর্ত্তিকল্পনার তীব্র শাসনে ও যুক্তির আপাত-প্ররোচনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছি। সংসারের যে দিকেই তাকাইয়া দেখি, সেই দিকেই প্রমোদ-মিশ্রিত ধর্ম্মের ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। যাহা হউক, জগতে প্রত্যেক প্রাণীরই স্বাধীন রুচি রহিয়াছে, বিশুদ্ধ রুচির অভাব নিবন্ধন তৎপ্রতি অরুচি প্রদর্শন করা একটু বুঝিবার কথা! এজন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা-ভি

এখন ভক্ত ও জ্ঞানী, ইঁহাদিগের পরস্পর তত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে যে অনৈক্য

দেখা যায়, তাহারই একটু আলোচনা করিব। ভক্ত, নিরাকার পূর্ণ চিন্ময় আত্মার অংশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জ্ঞানী, সেই অংশ ভাবকে খণ্ডন করিয়া অখণ্ডত্বের স্থায়িত্বে নানাবিধ উপদেশ দেন। প্রথমতঃ দ্বৈতবাদী রামানুজ ও মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি; ইঁহাদেরই উপদেশের কথা বলিতেছি। ইঁহারা আত্মা পরমাত্মা অথবা জীব ও ব্রহ্ম, এই প্রভেদ ভাব দ্বারা "অদ্বৈত" তত্ত্বকে দ্বৈত-জালে বদ্ধ করতঃ প্রেমভক্তির অমৃত উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। এবং প্রেম-পীযূষ-মগ্ন চৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচটী ভাবের মহা-তরঙ্গে এক সময় বঙ্গদেশ ডুবাইয়া দেন এবং শত শত মলিন-প্রাণ মানবকে ভাগবত-তত্ত্বের অমৃত আস্বাদনে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় চৌষট্টি রসের আবেশে কি কেহ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিয়াছিল? সকলেই প্রেম-সিন্ধুর অতল তলে নিমজ্জিত! আবার জ্ঞানীর উপদেশ এই যে, নির্ব্বিকল্প নিরাকার ঈশ্বর কখনই অংশরূপে আসিতে পারেন না, কেননা, অনন্তব্যাপী আত্মার কোথায় এমন স্থান আছে যে, সেই স্থানে তিনি খণ্ডরূপে অবস্থিতি করিবেন? তিনিই ত মহাপ্রাণ-প্রবাহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকল নিমজ্জিত রাখিয়াছেন, কিন্তু জড়ীয় বিকার-বিকল্প ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটু তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উপরিউক্ত জৈবিক তত্ত্বের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জীবের ধাতুই জীব, উহা কেবল নামের প্রভেদ—শিবে জীবে একই সত্তা! স্বরূপ চৈতন্য ও ভাবরূপ জীব চৈতন্য, উভয়ই অসীম নিরাকার অব্যয় শক্তি-বিশিষ্ট। ভাবে-স্বরূপে মিলনই অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতের মধুর ভাব—অনাবৃত মহাজ্ঞানের এই উপদেশ। আবার উক্ত মহাজ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত হইলে বস্তুতঃই অনাচ্ছাদিত অত্যুজ্জ্বল "অদ্বৈতবাদ" মতকে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা খণ্ডন করেন। বাস্তবিক নিগূঢ় ভাবে ভাবিয়া দেখিলে জীব ও ব্রহ্মে স্বাতন্ত্র্যত্ব কিছু নাই। এমত স্থানেও উপর্য্যুক্ত মনীষীবর্গ স্পষ্টতঃই নিরাকার একই শক্তিকে বিভিন্নরূপে নিরেট দ্বৈত চিন্তার পরিচায়ক বলিয়া ঐ আত্মাকে পৃথক ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্বাস করেন। যাহা হউক, দ্বৈতবাদের ভিতরে এটি কি বলিব না যে আত্মা, পরমাত্মা—ঈশ্বর পরমেশ্বর, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম—এই টুকু বিশেষত্ব সত্বেও প্রভেদ আছে কি? গভীর চিন্তা করিয়া একটুকু দেখুন ত, আত্মা কি পরমাত্মা নহে, ঈশ্বরকে কি পরমেশ্বর বুঝায় না, ব্রহ্ম কি পরম ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন না? যদি একই ঐশী শক্তি অভ্রান্ত সত্য হয়, তবে আত্মা পরমাত্মায় ভেদ কি? সমস্তই যে একই শক্তি ও নামের গাঢ়

মাধুর্য্য! এস্থলে অবশ্যই বলিব যে, আত্মাই পরমেশ্বর, ব্রহ্মই পরমব্রহ্ম, "একমেবাদ্বিতীয়ম" এক ভিন্ন দুই বলিবার কেহ নাই।

এই ধ্রুবসত্যের মূলেও আর একটী সন্দেহ আসিয়া পড়িল। যদি এক অবিনাশী আত্মারই অসীম প্রবাহ সকল প্রকার শরীরাধারে চলিতেছে, তাহা হইলে মৃত্যু হয় কার? মৃত্যু কিছুই নয়, ওটি বিকার ভাবের তরঙ্গ মাত্র! একটী শরীরের অভাব হইল, আর একটী শরীর প্রকাশ পাইল, ইহা স্থূল চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিলাম, এই আত্মাটি আসিল, ঐ আত্মাটি মরিয়া গেল, এইরূপ ভ্রান্তিছায়ার আবরণে আমরা আত্মারও জন্ম মৃত্যু সিদ্ধান্ত করিতে ত্রুটি করি না। হায়! নিরবয়ব আত্মারও কি খণ্ড রূপে জন্ম মৃত্যু হয়? স্থূল জ্ঞানে ইহা নিশ্চয় ভাবিলে ঘোরতর ভ্রান্তি-কুজ্ঝটিকায় প্রবেশ করিতে হয়। হায়! আত্মা যে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যা নো ন শোষয়তি মারুত ॥" (গীতা)

যিনি অখণ্ড চিন্ময় নিত্য, তিনি খণ্ড বা অংশরূপে কঠোর জঠর ক্লেশ ও মৃত্যুর ভীষণ নিষ্পেষণ সহ্য করিবেন, এ কি কখনও সম্ভব? এখানে বুঝিতে হইবে যে, কুম্ভকার যেমন একটী চক্রে মৃত্তিকার দ্বারা বহুতর ঘট নির্ম্মাণ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঘট সমূহের বাহির ভিতরে আকাশ স্বতঃই বিকাশ পায়, তেমনিই, ভগবানও জগৎ-চক্রে অসংখ্য জান্তব-শরীর ঘটন পূর্ব্বক তৎসঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে প্রকাশিত থাকেন। কালের শাসনে ঘট ও শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আকাশও ভাঙ্গে না, ঈশ্বরও ভাঙ্গেন না, উভয়েরই হ্রাস বৃদ্ধি নাই, অনাদিকাল সমভাবে স্থিতিরও ব্যত্যয় হয় না।

অনন্তর, উপর্য্যুক্ত আত্মতত্ত্ব বিষয় নিশ্চয় সত্য হইলেও, কিন্তু সংসারে নানা মতাবলম্বী মহানুভবগণের উপদেশগুলি কি গ্রহণ করিতে হইবে না? আমরা দেখিতেও পাই, এক শ্রেণীর "একেশ্বরবাদী" আছেন, তাঁহারা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মানুষের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা পরলোকে বাস করে, পাপ-পুণ্য নিবন্ধন বোধ হয়, স্থানের উৎকর্ষাপকর্ষ ব্যবস্থা থাকিতে পারে।* আর এক শ্রেণীর একেশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা বলেন যে, এমন একটী স্থান আছে—মানুষ যতই মরিতেছে, সেই খানে সব মজুত হইতেছে। "কেরা-

* ইহাদের বিশ্বাস, ইহলোকে কেবল জন্মই হইতেছে। মৃত্যুর পর আত্মা সকলের পরলোকে ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে? ঐ সকল আত্মার জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের শুভ হয়।

মতের” দিন আসিলে খোদার বিচারে যিনি পাপী সাব্যস্ত হইবেন,তিনি দোজাক যাইবেন, নিষ্পাপগণ ভিস্তিতে স্থান পাইবে।

ইহাঁদের পুনর্জন্ম বিশ্বাসটি যেন মহলতে থাকিল! আবার বহুচেষ্টিত বহু দেব-বাদী এক শ্রেণী আছেন; তাঁহারা বলেন,মানবসকলের মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মা সূক্ষ্ম দেহে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের বিচারে অপরাধ বিশেষে কাহারও কঠোর শাস্তি,কাহারও নরকহ্রদে ক্লেশভোগ,কাহারও বা চুড়াশি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে গো জন্মে মুক্তি! নিরপরাধী অর্থাৎ পুণ্যাত্মাগণের ধ্রুবলোক, ব্রহ্ম-লোক, বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির বিধান আছে। ইহাঁরা পরলোক স্বীকার করেন, পুনর্জন্মটি দৃঢ় ভাবেই মানেন। যাহা হউক, যিনি যাহাই বিশ্বাস করুন না কেন, সকলেই লোক-চক্ষুর অতীত। আমরা কোন কথাই অবিশ্বাস করিতে বলি না। তবে এ কথাটি অবশ্যই বলিব যে, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের আন্দোলন যতই করা যায়, ততই অনির্দ্দিষ্ট কল্পনার পথে ভ্রমণ করিতে হয়। মানুষের মৃত্যু হইলে তৎপরক্ষণেই যদি ফিরিয়া আইসা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ইহার গোড়ার কথাটি নিশ্চয়ই জানা যাইত।

অনেকেই বলিবেন, উপর্য্যুক্ত কথাটি আকাশকুসুমবৎ ভিত্তিশূন্য! কারণ চিরবিশ্বাসের বিরুদ্ধেত কোন কথা চলে না! সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তির মত জন্মন্তরবাদ সম্পূর্ণ সত্য! তাঁহারা বলেন, জন-পূজিত তেজপুঞ্জ ঋষিরা যোগ-বলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের কথা অনায়াসে জানিতে পারিতেন, ঐ পুনর্জ্জন্মের কথাটি বলিতে অক্ষম।* বলিতে কি, মনোবিজ্ঞানে হিমাচলের কথা নীলাচলে আনিতেন, ঐ কথাটি আনিতে পারেন নাই, এটিওত ভাবিবার বিষয়! থাক্, এ ত যোগের কথা! আরও বলেন যে, যাহাকে কোনও সময় সাধনার আসনে বসিতে দেখা যায় না, এমত ব্যক্তিও পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির সূক্ষ্ম শরীর সম্মুখে আনিয়া কথোপকথন করিতে পারেন, এবং পরলোকের প্রতিভাসম্পন্ন আত্মাসকল নিকটে উপস্থিত হইয়া নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ ব্যক্ত করেন। আহা! মানবের “স্মৃতি” আসক্তি আবর্জ্জনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যতই মহৎ চিন্তার পথে প্রবেশ করে, ততই তাহার পারলৌকিক বিষয় সকল হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি জন্মে। যেমন কজ্জলনিভ স্বচ্ছ সলিল-

* জন্মান্তরবাদ তত্ত্বটি পুরাণ-প্রসূত—নিরক্ষর নিশ্চেষ্ট মানবগণের প্রতি শাসন যে ভাবেই হউক, সহজে কিছু সৎশিক্ষা হয়, তজ্জন্য কল্পনারও যথেষ্ট সাহায্য রহিয়াছে এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ণ সরসীর মধ্যে একটি অঙ্গুরীয় প্রক্ষেপ করিলে, তাহার সম্যক অবয়ব দেখা যায়, তেমনই, স্মৃতি রূপ উজ্জ্বল শক্তি প্রভাবে মানুষ পুনর্জ্জন্ম বৃত্তান্ত বলিবে, আশ্চর্য্যের কথা কি? এইত গেল সংসারের অধিকাংশ ব্যক্তির কথা।

এখন "স্মৃতি" তত্ত্বেরই একটু সংক্ষেপে চিন্তা করা যাক্! স্মৃতি অর্থে স্মরণ, ইচ্ছা, ভাণ, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে বুদ্ধিই যেন স্মৃতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। কেননা, উহা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট! কিন্তু ঐ প্রজ্ঞা অনাবৃত ভাবে পরিস্ফুট না হইলে, কার্য্য বিশেষে অন্ধজ্ঞানে পরিণত হয়। তাহার কারণ এই যে, স্মৃতি যে ভাণ বা কপট নামে কলুষিত! সুতরাং সে বিকার-কলঙ্কিত হইবেইত! সংসারে মানুষ জড় বিজ্ঞানের সহিত ঐ স্মৃতির সম্বন্ধ সুদৃঢ় রাখিয়া "মিসমেরিজম্" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার শক্তি আর একজন জীবিত ব্যক্তির ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া পারলৌকিক তত্ত্ব এবং বিবিধ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার অনায়াসে জানাইতেছে। দেখাও যায়, বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার বিচিত্র শক্তিতে একটী নির্ম্মিত যন্ত্র গ্রামোফনে যখন সঙ্গীত বক্তৃতাদি করে, তখন স্থূল-জাত বস্তু-যোগ শক্তিতেও সকলই হইতে পারে, অবিশ্বাসের কথা কিছুই নাই। বলিতে কি, বস্তুগত শক্তির কার্য্য এমনই বিচিত্র যে মানুষের চিন্তা-প্রবাহ মধ্যে মিশিয়া জাগ্রতাবস্থাতেই যেন স্বপ্ন প্রদর্শন করে। ঐ সময় উপরত পিতা, মাতা, যিনি হউন না, তাঁহাদের শরীর-ভাব ও স্নেহসিক্ত কথাগুলির সহিত সেই সময়স্থিত চিন্তাটী স্মৃতিতে উদয় হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কথাও শুনা যায়। স্বপ্নে যেমন বিবিধ চিন্তার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই জড় বিজ্ঞান-কৌশলে শক্তি সঞ্চালন দ্বারা উপরিউক্ত ঘটনা সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্থিব পদার্থ মিশ্রণে স্মৃতি শক্তি বিকার-ভাবে আকৃষ্ট হইয়া ঐ পুনঃ জন্মের বিশ্বাসটী জগতে আনিয়াছে, ইহাই যেন মনে হয়। পৃথিবীতে জড় বিজ্ঞান-জড়িত ঐন্দ্রজালিক অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ দর্শন করিয়া, কোন কথাই অবিশ্বাস করা যায় না।

হায়! আমরা জড় বিজ্ঞানের আপাতমুগ্ধ কৌশলে বিস্মিত হইয়া পড়ি, সুতরাং মহা বিজ্ঞানের অমানুষী অচিন্ত্য শক্তির বিষয় ক্ষণকালও চিন্তা করি না। তাহাতে যে কত আনন্দ, কত প্রেম প্রাণে বহিয়া যায়, তাহা কি কখন মনে করি। ঐ স্থূল বিজ্ঞান-শক্তিতে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত "গ্রামোফন" যন্ত্রে সঙ্গীত বক্তৃতাদি ও নানা প্রকার কৌতুক পরিহাসের কথা শুনিবামাত্র অবাক্ হইয়া যাই। ভাবিয়া দেখিনা যে, আমাদের শরীর রূপ "গ্রামোফন" যন্ত্রে

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন, আরবী, পারসী, পালি ইত্যাদি বহুবিধ ভাষায় বেদ, বাইবেল, কোরাণ এবং নভেল, নাটক, কাব্য, ভট্টি,—কথকতা, সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি কেমন সুন্দর জ্বলন্ত শক্তিতে বাহির হইতেছে, ইহার প্রকটকর্ত্তা কে?—হায়! আমরা অহমিকামিত্বের প্ররোচনে মজিয়া কি বুঝিতেছি? আহা! দেহ রূপ গ্রামোফন যন্ত্রে মহা বিজ্ঞানকে না ধরিয়া অচেতন একটা কাষ্ঠের বাক্সে ক্ষণস্থায়ী স্থূল বিজ্ঞানের আশু তৃপ্তিদায়িনী কথার আকর্ষণে প্রমোদ-প্রবাহে ভাসিতেছি। ঐ ক্ষণমুগ্ধ যন্ত্রটীর কৃত্রিম বক্তৃতাদিতে যে কত অর্থ ধ্বংস হইতেছে, তা কি ভাবিবার সময় পাই? অথচ প্রত্যেক প্রাণীর শরীর-গ্রামোফনে চিৎ-প্রকট জ্বলন্ত শক্তিময়ী কথা শুনিয়াও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তবেই বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে খাটী সোণার আদর কম—বরং ঐ গিল্‌টীর অস্থায়ী জ্যোতিতেই আনন্দ অধিক। পৃথিবী, তুমিই ধন্য! এখন স্পষ্টই বলিব যে, ঐ পার্থিব বস্তুগত বিজ্ঞান শাসনে স্মৃতিরও বিকার দুর্দ্দশা ঘটে। আবার ঐ স্মৃতিই মহা বিজ্ঞান স্পর্শে বিকার-বিমুক্ত হইলে, স্বতঃই তাহার লক্ষ্য ঈশ্বরে—পলক পাতের অবসরও বিচলিত হয় না। তখন তাহার অন্যবিধ কোন কথাই জানিবার সময় থাকে না। এবং স্থূলজাত বিবিধ রূপ প্রলোভনে প্রতারিত না হইয়া অসার তত্ত্বের প্রতি আর লালসা রাখে না। ইহাকেই আত্মোন্মুখিনী নির্ম্মলা স্মৃতি বলে।

অবশ্যই বলিব যে, ভক্ত ও জ্ঞানী, ইঁহারা নিজ নিজ বিশ্বাস মতে স্মৃতি শক্তিকে বিভিন্ন চিন্তার ভিতরে আবদ্ধ রাখিতেছেন। প্রথমতঃ ভক্তগণের স্মৃতির জাগরণ বিষয় একটু আলোচনার প্রয়োজন হইতেছে। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, মাধ্বাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈত মতে দ্বৈত ভাবে জীব, চির স্বতন্ত্র! এবং অচিন্ত্যাদ্বৈত মতটীও একরূপ দ্বৈত জালে নিবদ্ধ! ফলতঃ এই প্রকার দ্বৈত বিশ্বাসের মূলে প্রবেশ করিলে জানা যায়, ভক্তিই ইহার কেন্দ্রীভূতা উপদেষ্টা। কেননা, ভক্তি স্বভাবতই নিম্নগামিনী—তাহাতে আবার দীনতার সহবাসে এতই দ্বৈতমগ্না যে, কিছুতেই অসীম শক্তি-চিন্তার সহিত মিশিতে চায় না। বস্তুতঃই ভক্তি যতই ঘনীভূত হইবে, ততই "একাত্ম" মহত্তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র রূপে জগতের স্বীমাবদ্ধ বিচিত্র চিত্র-সৌন্দর্য্য মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিবে। সুতরাং ভক্তগণ দ্বৈতভাব ভিন্ন অদ্বৈত ব্রহ্ম চৈতন্যের অসীম জ্যোতির দিকে চক্ষু রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

ভক্তগণ চিনি হওয়া ভালবাসেন না; তাঁহারা আস্বাদনে উন্মত্ত! আহা! সেবানিরতা ভক্তির মধুর তরঙ্গমগ্ন ভক্তগণের অকৃত্রিম ভাবাবেশ দর্শন করিলে, বজ্রবৎ কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। হায়! এমন যে ভক্ত-মহিমার অতুলনীয় গৌরব, তাহা রক্ষা করিতে কেহ ইচ্ছা করেন না, শুষ্ক হৃদয়ে বিষয়-বাসনা-স্রোতে অজস্র ভাসিতে থাকেন। যদি তাহাদের ভালবাসা বিন্দুমাত্রও অন্তঃকরণে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে কখনই অশান্তি-দহন-যাতনা সহ্য করিতে হইত না। আহা! উদার মহচ্চরিত্র ভক্তগণের কৃপাদৃষ্টিতেইত বিশ্ব-প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি জন্মে। জগতে ভক্ত-জীবন কি জ্বলন্ত! তাঁহাদের সাধন-স্পৃহা কি মধুর! সেই অবিচ্ছিন্ন ভগবদ্ভাবগ্রাহী ভক্তগণ নির্ম্মলা ভক্তির পূর্ণ আবেগে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বাধারে ভগবানের স্ফূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করত, তাঁহারা নিরাকার পরব্রহ্মকেও ধাতু প্রস্তরাদির নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে পূজা, বন্দনা, ও আরাধনা করিয়া অশ্রু-তরঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন নিমগ্ন থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভক্তির মধুর আবেগে এই উপদেশটি স্মরণ করেন না।

"উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাব বহিঃ পূজাঽধমাধমাঃ॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪র্থ উল্লাস)

যাহা হউক, এটি না ভাবিলেও ভক্ত-চরিত্র কি মধুর! ভক্ত প্রাণের কি উল্লাস উচ্ছ্বাস! ভক্তানুরাগের কি ঘনস্থায়িত্ব, ইহাদের ভক্তি ভাবের কদম্ব-কুসুম সদৃশ কণ্টকিত ভাবাবিষ্ট শরীর স্পর্শে শুষ্ক হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়। এমন কি, বিষয়োন্মত্ত ব্যক্তিগণও চকিৎ মধ্যে সাধু ভাব গ্রহণ করে! এবং শত শত মোহমুগ্ধ মানব, ভক্তির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে জুড়াইতে স্থান পায়। অকৃত্রিম ভালবাসায় ও মধুর আপ্যায়নে সকল প্রাণীর অধীন হইয়া সেবা নিবন্ধন অধীর হয়। ঈদৃশ ভাব-তরঙ্গ নিমজ্জিত হইলে, "তৃণাদপি সুনীচেন"—এই বিশ্বমুগ্ধ মন্ত্রে, কে এমন ধর্ম্মবীতস্পৃহ আছেন যে, বশীভূত থাকিবে না? কে এমন অন্ধভাবাপন্ন আছেন যে, পদদলিত তৃণের কম্পন অবস্থাটী মনে করিয়া আরও সকলের নীচ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন না? কে এমন শূন্যহৃদয় আছেন যে, সকল প্রকার প্রাণীর প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী কীট আঘাত পাইলে, তাহার জন্য বিষাদ-নীরে ভাসিবেন না? এবং যে পর্য্যন্ত শান্তির অমৃতধারা বর্ষিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শান্তি পাইবেন না, অবিশ্রান্ত রোদন-বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহাকেই বলে বিশ্বপ্রেম ও শুদ্ধাভক্তির সাধন। বস্তুত ইঁহারাই

প্রাণিজগতে প্রাণিগণের সেবা-মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারাই বিশ্ব-কেন্দ্রীভূতা স্মৃতির বলে নিশ্চেষ্ট মানবগণ মধ্যে অনেককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়া পবিত্র পথ দেখাইয়াছিলেন। ইঁহারাই বঙ্গদেশকে হরিনাম কীর্ত্তনের মধুর তরঙ্গে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। হায়! সেই প্রেম-প্রবাহ-মগ্ন ভক্তগণ এখন কোথায়? যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হয়, হৃদয়ের শুষ্কতা দূরীকৃত হইয়া আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস ছুটিতে থাকে, বিশ্বপ্রীতির অনিবার্য্য আবেগে অধীর করিয়া তোলে।

এখন জ্ঞানীর স্মৃতিলব্ধ বিষয়ের একটু আলোচনা করিব। জ্ঞানী তত্ত্ব-চিন্তার উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঈশ্বর অনন্তব্যাপী নিরাকার স্থূলের অতীত অথচ সর্ব্বগত নির্লিপ্ত! তিনি নিত্য নিরাময় অনাদিকাল হইতে একই ভাবে স্থিতি করিতেছেন।

"অনঙ্গঃ সুপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
এক একদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্ব দেহগতঃ পরঃ॥"

(ভগবতী গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ৫ শ্লোক)

ইহাতে কি প্রশ্ন উঠিতে পারেনা যে, যদি ঈশ্বর সকল প্রকার দেহাশ্রিত রহিয়াছেন, তাঁহা হইলে শরীর বিশিষ্ট যাহাকেই কেন অবলম্বন করা যায় না, ক্ষতি কি? কোনরূপ নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা ও অনুরাগের সহিত পূজা অর্চ্চনা করিলে, অদ্বিতীয় সত্য বস্তুকে কেনই বা লাভ হইবে না? ঈশ্বর যখন "সর্ব্বদেহগতপরঃ" অর্থাৎ দেহী মাত্রেরই দেহধারে বিদ্যমান আছেন, তখন ভক্তগণের বিশ্বকেন্দ্রীভূতা স্মৃতির প্রদর্শিত পথে "ভগবদ্দর্শন" অবশ্যই সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তরে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রে এ কথাও ত বলিতেছেন,—

"মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তারীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরং শান্তি ন যান্তিতে॥"

(কুলার্ণব—মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থ এই যে মৃত্তিকা, ধাতু, দারু প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরের কোনরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মূঢ়েই পূজ-বন্দনাদি করে। ঈশ্বর-কল্পিত মূর্ত্তি আরাধনায় পরমেশ্বরকে লাভ হয় না এবং শান্তিও পায় না। তন্ত্র আরও বলিতেছেন,—

---

* ইহাও স্থূল তত্ত্বের সমষ্টি—বৃক্ষ্যাদি ও ধাতু প্রভৃতির সহিত একই পরমাণু সাকার বিশিষ্ট, এ জন্য সসীমে অসীম দর্শন অসম্ভব।

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি ণ্ নাঞ্চেন্মোক্ষমাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজা ণো মানবা স্তদা॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থ এই যে, মনঃ-কল্পিত মূর্ত্তিদ্বারা যদি মুক্তি হয়, তবে স্বপ্নেও রাজত্ব ভোগে সুখী হইতে পারে। এখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ শাস্ত্রোক্ত মহামন্ত্রে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, কোন প্রকার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বরোপাসনা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য। কিন্তু সর্ব্বাধারে এক মহাপ্রাণতার প্রত্যক্ষ ভাবটীই যে "সর্ব্বদেহগত পরঃ" ইহারও অনন্ত প্রসারতত্ত্বটী অনেকে গ্রহণ না করিয়া পৃথক্ দেহরূপে ভগবানকে বদ্ধ রাখিতেও বিস্মৃত নহেন। এই কারণে ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষিরা নিগূঢ় তত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে উজ্জ্বল সত্যের আলোকে মোহমুগ্ধ মানব প্রভৃতির উন্নতি-কল্পে নানাবিধ উপায় নিদ্ধারণ করিয়াছেন, যাহাতে সকলে অভ্রান্ত সত্যের অনুশীলনে শান্তিলাভ করে। পরদুঃখ-কাতর ঋষিপুঙ্গবগণ জগতের হিতের নিমিত্ত নিঃস্বার্থ ভাবে কতই যে মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একবার স্মরণ করিলেও প্রাণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মগ্ন হয়। বস্তুতঃই তাঁহারা ব্রহ্মের অব্যক্তরূপ নিরাকারেই দর্শন করিতেন। সুতরাং অসীম পূর্ণচৈতন্যের অংশ বা খণ্ডরূপের সিদ্ধান্ত কিছুতেই সম্ভবে না। যদি সম্ভবই হইত—তাহা হইলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই তিনটী অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন না—

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতা যন ময়া।
ব্যাপিতঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যতীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্ বিকলতা দোষ ত্রয়ং মৎকৃতম॥"

অর্থ এই যে, তুমি রূপ রহিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি নিখিল গুরু—বাক্যের অতীত—স্তুতি বন্দনায় ঐ অনির্ব্বাচ্যতা দূরীভূত করিয়াছি, তুমি অনন্তব্যাপী, আমি তীর্থ ভ্রমণ-নিরত হইয়া, তোমার সেই অসীমত্বকে বিনষ্ট করিয়াছি। হে ভগবান! আমার স্বকৃত এই তিনটী বিকলতা দোষ ঘটিয়াছে, ক্ষমা কর।

এতেও কি আমরা বুঝিব না যে, ঈশ্বর নিরবয়ব নিষ্কলঙ্ক নিত্য! নিশ্চয়ই বলিব যে, তিনি নিরাকার না হইলে তাহার সর্ব্বব্যাপিত্বই বা কিরূপে সম্ভব? এবং ঐ অখণ্ডত্বের ব্যাপিত্ব বিনষ্ট হইয়া সীমারূপে আসিবেন, যাইবেন, এটি কি

বুঝিবার বিষয় নহে ? তবেই বলিতে পারা যায় যে, অষ্টাদশ-পুরাণবিদ্ পণ্ডিতই হউক, আর সংস্কৃত বারিধি বা প্রাচ্যতত্ত্ব-চূড়ামণি প্রভৃতি উপাধিধারীই হউক, সত্যের অনুরোধে কেনই বা বলিব না যে, ঈশ্বর নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত। তবে লোকচক্ষে তাঁহার অসীম সত্তা সীমাবদ্ধ শরীরগত দৃষ্ট হইলেও তিনি স্থূলাতীত ও নির্লিপ্ত ! ইহাতে কি জানিব না যে,জলবিম্বোপম নশ্বর শরীর কেন, কোটি কোটি বিশ্ব সমূহ ভ্রান্তি-বিকারের উপদান ব্যতীত আর কিছুই নয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, জানা যায়, উপরিউক্ত মূর্ত্তি পূজাটী উন্মাদিনী ভক্তির ঘন তাড়নায় এবং ভক্তের উৎকট ব্যাকুলতায় জগতে স্থান পাইয়াছে। নতুবা অসীম ঐশী শক্তির অংশ বা খণ্ড হয় না, ঐ সকল মহামনস্বীগণ কি ভাবেন নাই ?—অবশ্যই ভাবিয়াছিলেন। বাস্তবিক উন্মাদিনী ভক্তির শক্তি এতই প্রখরা যে, কিছুতেই তাহার গতি রোধ করা যায় না। বোধ হয়, উহারই প্রখর তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া ঐরূপ মূর্ত্তি পূজার ভাবটী প্রকাশ পাইয়াছে।

যাহা হউক, জ্ঞান ও ভক্তির মিল সম্বন্ধে একটু বলিব। জ্ঞানী, আত্মোন্মুখিনী নির্ম্মলা স্মৃতির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতঃ অসীম মহামণ্ডলের অব্যক্ত আলোকে ও স্বাভাবিক যোগে একাত্মময় পরম সত্য লাভ করেন। এবং "সৎ চিৎ আনন্দ' এই ত্রিসত্তার শক্তি একীভূত আত্মা—তদ্ব্যতীত সকলই প্রপঞ্চময়, ইহা হৃদয়-গ্রন্থে জ্বলন্ত অক্ষরের প্রতি পংক্তি পাঠ করিয়া পরিজ্ঞাত হইলেন। ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে অন্তরাকাশে মধুরবাণী শুনিতে পাইলেন, "আমি নাদব্রহ্ম অনাদিকাল স্থিতি করিতেছি,—তুমি আমারই শক্তি-প্রবাহ।" জীবে ব্রহ্মে যে একই সত্তা, তাহার আর সংশয় রহিল না। বুঝিলেন যে, ব্রহ্মের ভাব-তত্ত্বের প্রকার ভেদ জীব—জগতের বৈচিত্র্য ও শরীরের স্বাতন্ত্র্যত্বে জৈবিক সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সাধনের চরম অবস্থায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম ও জীব, স্বরূপ ভাবে মিলিত ! কিন্তু হায় ! মানুষ মানবীয় বিচার-শক্তির মলিনতায় ভেদগ্রন্থ-দ্বৈতজালে জড়িত হইয়া অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতের মহচ্চিন্তার সূক্ষ্ম প্রদেশে প্রবেশ করিতে চায় না। এ বিষয় অনুসন্ধিৎসু হইলে, স্পষ্টই জানা যায় যে, আত্মার অসীম অব্যক্ত জ্যোতি সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়াই ইহার মূল কারণ। সুতরাং ভয়বিহ্বলা ভক্তি, ঐ অমানুষী জ্যোতিচ্ছটা স্পর্শ করিতে না পারিয়াই জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু উহার অন্তরের মধুর মিলন ভাবটী অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞান হইতে পৃথক থাকেনা। তজ্জন্য ভক্তি জ্ঞানের আশ্রয় লাভে চিরবঞ্চিত নহে। জ্ঞানের সহিত ভক্তির অভেদ মিলন না হইলে,

শাশ্বত প্রেমের সঙ্গে সহবাস সম্ভবে না। জ্ঞানবিহীন ভক্তি—ভক্তিবিহীন জ্ঞান—উভয়ই চিতাগ্নি-প্রজ্জ্বলিত শ্মশান-বাসে অবস্থিত! ভক্ত একমাত্র প্রেম-ভক্তির তরঙ্গে পড়িলে, তাঁহাকে মুহুর্ম্মুহু মূর্চ্ছায় অধীর করে। জ্ঞানী কেবলই যদি বিচার জ্ঞানের অধীন হন, তাহা হইলে, তাহাকেও শুষ্কতার কঠোর শাসনে নিরতিশয় যাতনা ভোগ করিতে হয়।

তত্ত্ব জ্ঞানের সহিত শুদ্ধা ভক্তির মিলন সম্ভব হইলে, ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকট ভাবের আর কোনরূপ বিঘ্ন সম্ভবেনা। এবং অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতেও সংশয় থাকেনা। বিশুদ্ধ চিন্তার বলে, সিদ্ধ বিশ্বাসও আপনা হইতে প্রাণে ফুটিয়া উঠে। তখনই ব্রহ্মচৈতন্য ও ভাবরূপ জীবচৈতন্য সেব্য-সেবক ভাবের মধুর আনুগত্য বুঝিবার শক্তি জন্মে। এবং জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই নিরাকার নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মের দর্শন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। ঐ সময় তত্ত্ব-জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে প্রীতিসম্ভার প্রদান পূর্ব্বক ভগবানকে দর্শন জন্য অত্যন্ত আকুল হয়। শুদ্ধাভক্তিও তত্ত্বজ্ঞানের আলিঙ্গনে অনন্ত ব্রহ্ম-সিন্ধু মধ্যে ডুবিয়া যায়। কে বলিবে যে জ্ঞান ভক্তির অবিচ্ছেদ সঙ্গ-লাভ অসম্ভব? ভক্তি যে চিরসঙ্গিনীরূপে জ্ঞানকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দেয়। জ্ঞানও পলক পাতের অবকাশ কালটুকু দূরে না থাকিয়া, ভক্তিকে ঈশ্বর-মুখিনী চিন্তায় দর্শন-ভাবে আকুল করিতে বিরত নহে। বস্তুতঃই জ্ঞান ভক্তির মিলন ও মতের একত্ব সামঞ্জস্য না হইলে, জ্ঞানীই হউন বা ভক্তই হউন, কেহই প্রকৃত সত্যের জ্বলন্ত জ্যোতির নিকট চক্ষু রাখিতে সক্ষম হইবেন না। জ্ঞান-ভক্তি উভয়েই উভয়ের শোণিত-প্রবাহিনী জীবনী শক্তি রূপে হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পরস্পর বিরোধ সম্ভব হইলে, কেহই সত্য বস্তুর সংসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না—ইহা ধ্রুব সত্য! জ্ঞানী যদি আত্মগৌরবে গর্ব্বিত হইয়া ভক্তিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, ভগবদ্ভাবের মধুর আস্বাদন ভোগ করিবেন কি রূপে? আবার ভক্ত যদি একমাত্র প্রেমেরই অনুগত হন, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তবে বিষ্ণুপুর যাইতে তথাকার মৃত্তিকায় মৃদঙ্গ প্রস্তুত হয় ভাবিয়া নতশীরে ভূপতিত হইলে, প্রকৃত সত্য কে বুঝাইবে? এবং "সৎ চিৎ আনন্দ" এই ত্রিসত্তার একীভূত ঐশী শক্তির অমিয়-ধারায় ত্রিতাপ-দগ্ধ প্রাণকে কে শীতল করিবে? অতএব জ্ঞানী ও ভক্ত, কেহ কাহাকে উপেক্ষা না করিয়া অভিন্ন হৃদয়ে আত্ম-তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, ইহাই বাঞ্চনীয়।

জগতে ধর্ম্ম মত যথেষ্ট, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, ক্ষিত্যাদি ভৌতিক তত্ত্বের

সাম্যভাবে বৈষম্য ঘটিলে, ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটে। আবার ঐ তত্ত্বসমূহের ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় হইলে যেমন পৃথিবী সাম্য শ্রী ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র চিত্রে সুসজ্জিত হয়, তেমনই বহুধর্ম্মের ভিতরেও চিন্ময়ী মহাশক্তির পূর্ণ প্রকাশ দর্শন করিলে, মতভেদের গণ্ডি-রেখা মুছিয়া যায়, একপ্রাণতার সাম্য-শক্তি জাগিয়া উঠে, সরলতার অভেদ আপ্যায়নে পৃথিবী প্রেম-পীযূষ-বারিধির অতল তলে জুড়াইতে স্থান পায়। সুতরাং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যোগী, ভক্ত, সাধক, সকলেই সম-প্রাণতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হন। কেননা সত্য-স্বরূপের প্রকৃতি বিকৃতি কখনই হয় না। অনাদিকাল তিনি সমভাবে সমশক্তি, সমপ্রভা-পূর্ণ—তাঁহার অনন্তব্যাপী জ্যোতির বিন্দুমাত্রও ন্যূনাধিক্য নাই। যিনি যে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন না কেন; সাধনের শেষ সীমায় আসিলে, নৈসর্গিক বিধানে সকলেরই প্রাণ একপ্রাণতায় পরিণত হইবে। এবং উদার ধর্ম্মের সংঘর্ষণে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া মিলনের অমিয় তরঙ্গ ছুটিতে থাকিবে। তখন জানা যাইবে যে, ঈশ্বর দেশ কাল স্থানে কিম্বা বিবিধ প্রকার শরীরাধারে বদ্ধ নহেন। জ্ঞানীতে মূর্খেতে, রাজাতে প্রজাতে, ধনীতে দুঃখীতে ও লতা গুল্ম উদ্ভিজ্জাদিতে তাঁহার অমোঘ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বহির্ভাবের সাম্যদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টির সহিত যখনই এক হইবে, তখনই পৃথিবীর বাহ্যভাব বদ্ধভাবের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরমুখিনী চিন্তায় সকলে উন্মত্ত হইবেন। বস্তুতঃ ঐ শুভ মুহূর্ত্তে স্বয়ং ভগবান "একাত্মবাদ" অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গূঢ়তত্ত্বে উপদেশে বিশ্ববিচিত্রতার ভেদসঙ্কুল ভীষণ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

বিশ্বগুরুর অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, আপন পর প্রভেদভাব আর থাকিতে পারে কি? শত্রু-মিত্র যে এক হইয়া যায়। ঈদৃশ অবস্থায় এমনই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ভাবের উদয় হয় যে, কোনরূপ মলিনতায় আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বরং সম ব্যাকুলতায় সকলকে পরস্পর আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মত্ত করে। ইলেক্ট্রীক বার্ত্তাবহ তারের একটী স্থানে আঘাত পড়িলে যেমন তাহার সমস্ত কেন্দ্রই একসুরে বাজিয়া উঠে, তেমনই স্বদেশবাসীর উপর কোন বিপদ পড়িলে, সকলের উদারতা রূপ জালের তার কেনইবা বাজিবে না! এইরূপ একাগ্রতার জাগরণে কি ঐক্য-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে? কখনই না। অল্প সময় মধ্যেই জাতিগত উচ্চনীচ ভাবগুলি মিলনের অমৃতরসে মার্জ্জিত হইয়া, একপ্রাণতার সহিত মিলিত হইবে। মানব-প্রাণ, শুভ আনুগত্যের সংস্পর্শে একমুখ রুদ্রাক্ষের

ছায় সমসাহায্যের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র থাকিবে। আহা! মিলন সংঘর্ষণ কি মধুর! তৃণ খণ্ড সমূহের একযোগে এক গাছি দড়িতে একটী প্রকাণ্ড হস্তীকে বাঁধিতে পারা যায়, ভেদশূন্য প্রেম-রজ্জুতে কি ভগবানকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখা যায় না? অবশ্যই বলিব যে, বিশ্ববাসী সকল সম্প্রদায়ের সহানুভূতিতে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুও অত্যুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে উঠিতে পারে।

যাহা হউক, জ্ঞান ও ভক্তির আলোচনায় যে সকল তত্ত্ব জানা গেল, তাহাতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে সঞ্জীবিত রাখিতে অনুদার নহে। কারণ, সোঽহং তত্ত্বের একই "আমি"—তুমির ভাবে "সেব্য সেবক ভাব" মহালীলায় প্রকটিত হইতেছে। এ সত্যের মূলে দেখা যায়, চিন্ময় অখণ্ড শক্তি ব্যতীত আর কিছু নাই। এমত স্থলে স্থূলতত্ত্ব, সকল প্রকার দেহীর উপাদান হইলেও ভ্রান্তির পরিচায়ক—দর্শন শাস্ত্র স্পষ্টই বলিতেছেন। সুতরাং মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি মনীষীগণ কর্ত্তৃক যে তীব্রদীনতা ও প্রখরা ভক্তির উত্তেজনা বশতঃ নিরাকার অনন্তব্যাপী ঈশ্বরের অংশ ভাবে "দ্বৈত" তত্ত্ব যাহা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তারই বিষয়! সহজ চিন্তাতেই জানা যায়, অখণ্ড নিরাকার-শক্তি একটী চুলের শত অংশের এক অংশ হইয়া কোথায় স্থান পাইবে? নিরবয়ব ঐশী শক্তি কি কখন পৃথকরূপে বিভক্ত হইতে পারে? তবে এটি অতি সত্য যে, তত্ত্ব জ্ঞানের সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধা ভক্তির অভেদ মিলন অক্ষুণ্ণ থাকিলে অখণ্ড দ্বৈতাদ্বৈতের সাধন সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন সংঘটন হইতে পারে না। বরং সোঽহং মতের সংস্পর্শে উন্মাদিনী ভক্তি-সঞ্জাত যে দ্বৈততত্ত্ব—তাহা ম্লান হইবেই হইবে। ভ্রমরকুল ক্ষুদ্র ফুলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিক পরিমলপূর্ণ পদ্ম-পুষ্পেরই অনুগত হয়—এটি স্বাভাবিক।

এখন বেশ বুঝিব যে, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মারূপে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানেও বাস করেন না! তিনি অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, নিত্যনিরবয়ব অনন্তই আছেন। দেহবিশ্ব সকল তাঁহারই মধ্যে উঠিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ইহাই বৈচিত্র্য লীলা-রহস্য! কাহার সাধ্য যে, বিশ্বকর্ম্মা পরব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির উপর চিন্তা স্থাপন করিতে পারে? তবে স্বাভাবিক জ্ঞানের আলোকে মানব-হৃদয়ে যে সত্যটী প্রকাশ পায়, উহাই অভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত এবং সকলের আদরের বস্তু! কিন্তু একদেশদর্শীতার শাসনে আমরা হৃদয়-লব্ধ স্নেই সত্য-রত্নে বঞ্চিত হইতেছি। হায়! এই উন্নত যুগে সুসভ্য কৃত-বিদ্যগণও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নীতির সংঘর্ষণে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়াও ঐ উভয় নীতির

ভিতরে চাপা পড়িয়া প্রকৃত সত্যের অন্বেষণে ইচ্ছা করেন না। অধিক কি বলিব, অতিবৃদ্ধ বহু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণকেও দেখা যায়, বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে বদ্ধ রহিতেছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা অব্যর্থ সত্যোন্নতির আশা সুদূর-পরাহত—এ কি দুঃখের বিষয় নহে? যাঁহাদের উপদেশ প্রাণে গ্রহণ করিয়া মানুষ মানুষ হইতে পারে, তাঁহাদেরই এই দশা! আহা! কবে এমন দিন আসিবে, জগতের নর-নারী জ্ঞান-চস্মা চক্ষে দিয়া অসীম জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে এবং শান্তির অতল-তলে প্রবেশ করিয়া চিরমগ্ন থাকিবে। ভগবান আশা পূর্ণ করুন।

এইত গেল উপাস্য উপাসকের কথা। আবার মহামনস্বী শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতে তাহাও যে টেঁকে না! তিনি বলেন,—একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর সকলই ভ্রান্তিময়! সুতরাং জীবের অস্তিত্ব ধ্বংস সত্বে মুক্তি বা নির্ব্বাণ কার হইবে!* এই ভীষণ চিন্তার বিবর্ত্তনে যে উপর্য্যুক্ত মহত্তত্ত্বের প্রতি আঘাত পড়ে। বিশেষত সংসার হইতে মুক্তি ও নির্ব্বাণ যুগপৎ চলিয়া গেলে, আর্য্য-ঋষিগণ ও বুদ্ধদেবের উপদেশে সন্দেহ জন্মে। তাঁহাদের ঐ গভীর চিন্তাপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসাও ত সহজ নহে! এদিকে পরাজ্ঞানের "অদ্বৈত" তত্ত্বও অভ্রান্ত সত্য—ইহাও ত অস্বীকার করা যায় না। এখন বলিবার কথাটী এই যে, ঈশ্বর আর জীব একই অখণ্ড চিৎশক্তি হইলে, মুক্তির সম্বন্ধে একটু গূঢ় চিন্তারই বিষয়! শঙ্কর মতে এটিত নিশ্চিত সত্য যে, ব্রহ্মসত্তা কিছুতেই খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত হয় না। কেবল ভৌতিক তত্ত্বের আবরণে পূর্ণ শক্তিকে প্রচ্ছন্ন করিতেছে,—ইহা সহজেই যেন বুঝা যায়। জগদ্দীপ্তিকর দিবাকর রাহুগ্রহের ছায়ায় অদৃশ্য হইলে, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিরই বিশ্বাস যে, প্রখর কিরণদাতা মার্ত্তণ্ডের কখন অল্প অংশ, কখন অর্দ্ধাংশ, কখন পূর্ণাঙ্গ ঐ রাহুতে গ্রাস করে। আবার ছাড়িয়া দিলে, তাহার মুক্তি বা নিষ্কৃতি! বস্তুতঃ সূর্য্য কি সত্য সত্যই রাহু-কবলিত হয়? না, রাহুগ্রহের ছায়াবরণে ঐ রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? ভ্রান্তি ভাবের উত্তেজনায় যদি তাই হয়, তবে অনন্তব্যাপী পরব্রহ্ম ও স্থূলের বিকার রূপ রাহুকবলে তদনুরূপ অবস্থাগ্রস্ত বুঝিতে হয়? তাহা হইলে ত ঐ বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের ছাত্র শিক্ষার উপদেশ এই কিম্বদন্তীটি অসম্ভব নহে?—"পঞ্চভূতের ফাঁদে"—"ব্রহ্মপড়ে কাঁদে" ইহাই যেন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! তাই কি

* মুক্তি তত্ত্বের বিষয় নবম উল্লাসে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে অদ্বৈত চিন্তা প্রসঙ্গে মুক্তি ও নির্ব্বাণের কথা আরও কিছু বলিতে হইল।

কখন সম্ভব হইতে পারে? ব্রহ্ম যে স্থূল জগতেও সকল প্রকার দেহীতে নির্লিপ্ত। অথচ বিশ্বপদার্থ সমূহ তাঁহারই মধ্যে নিত্যকাল স্থিতি করিতেছে।

এখন দেখা আবশ্যক যে, নির্ব্বাণ মুক্তির মৌলিক তত্বটী কি?—পরাজ্ঞানের উন্নত সীমায় উপনীত হইলে জানা যায়, স্থূলতত্ত্ব-জাত সকলই বিকার-কলুষিত এবং বৈচিত্র্য চিত্রে বঞ্চিত, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তৎসঞ্জাত দেহী সমূহের উৎপত্তি ও ধ্বংস-ধারা বাহ্যিক রূপে চলিতেছে। কিন্তু আত্মার প্রকট ভাবের অসীমত্ব অক্ষুণ্ণ—একথার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ অখণ্ড শক্তির ব্যত্যয় হইবে কিরূপে? সকল প্রকার প্রাণী মধ্যে একই শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিছুতেই কল্পনা-ছায়ার আচ্ছাদনে তাহার অখণ্ডত্বের বিঘ্ন সম্ভবে না। কেননা, ঐ পূর্ণ শক্তি যে কালাতীত নিত্য! তবে যে আমরা দেখিয়া থাকি, মন, বুদ্ধি, জীব, ইহারা দেহাধারে প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সকলি একই শক্তির প্রকার ভেদ নিরাকার তত্ত্বে অভিহিত। একটু গাঢ় চিন্তার ভিতরে প্রবেশ করিলে বুঝা যায়, কোনরূপ পুষ্প বিশেষে যেমন পীত-রক্তাদি বিবিধ রঙের দর্শন হয়, অথচ পুষ্প একটী—আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রায়ুধ যেমন সাতটী বর্ণে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ফলতঃ ঐ শক্রধনু একটী—অকূল বারিধির বিশাল বক্ষে যেমন শত শত উর্ম্মিমালা অভেদ ভাবে ছুটিয়া যায়, কিন্তু জলনিধি একটী—তেমনই মনোবৃত্তি প্রভৃতি নিরাকার তত্ত্ব সমূহও এক আত্মারই শক্তি-প্রবাহ মাত্র।* স্থূল তত্ত্বের বিকার-বিবর্ত্তে নিরাকার অসীম শক্তিকেও শরীরাধারে অসীম দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃই যতক্ষণ দেহীর বিকৃতাবস্থা না ঘটে, ততক্ষণই বাসনা-বিজড়িত জীব-ভাবাদি ইন্দ্রিয়গণের ঘন তাড়নায় এবং অহমিকামিত্বের প্ররোচনে দেহরূপ নাট্যমন্দিরে অভিনয় করে। শরীর বিধ্বংসকালে মানবীয় শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে ও "কর্ম্ম"-জনিত দেহাশ্রিত সত্বে শুভাশুভ ভোগাস্বাদনের পর তাহারা বিধূম অগ্নির ন্যায় আত্মাতেই জ্যোতিঃতরঙ্গরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। শরীর-সম্পৃক্ত নাম ভেদাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। শরীরস্থ বিকার পদার্থ সকলও ভৌতিক পরমাণুর সহিত সমভাব গ্রহণ করে। সময়-চক্রের আবর্ত্তে বিশ্ব-তত্ত্বেরও ব্যষ্টি সমষ্টির ব্যাপার চলিতেছে। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেহ-বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গেলে, মহাকাশভেদী আত্মাই প্রকাশ পান। আমরা বাহ্যাবরণে অনন্তব্যাপী শক্তিকেই মন, বুদ্ধি, জীবাদি সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ঐ সকল উপাধিযুক্ত তত্ত্ব যে বহু বর্ণের কাঁচ খণ্ডে একই সূর্য্যের প্রতি-

---

* ইহাকেই আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্য কহে।

বিম্বিত, তা কি কখন ভাবিয়া থাকি ? নিরবচ্ছিন্ন মোহ-তিমিরাবৃত সংসার-ক্ষেত্রে ভ্রমণ-নিরত হইয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছি। মুক্তি ও নির্ব্বাণ তত্ত্বের বিষয় কেমন করিয়া বুঝিব ?

অতঃপর কিছু না বুঝিলেও একটু চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন নহে। মুক্তি ও নির্ব্বাণ অর্থে পরিত্রাণ, নিত্যসুখ, শান্তি ও সদ্‌গতি ইত্যাদি অনেক প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ফলতঃ এই সকলের ভোগ-প্রয়াসী কে ?—ইহার উত্তরে একথা কি সম্ভব নয় যে, যতক্ষণ উপর্য্যুক্ত জীব ভাবাদির উপাধি রূপ শক্তি সমূহ দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ভোগেচ্ছা মধ্যে বিচরণ করে সত্য, কিন্তু ঐসকল উপাধি-শক্তি ভূত প্রপঞ্চের বিকারক্লীষ্ট ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইলে, তখনই অহমিকামিত্বের সংস্পর্শে বিকৃত ভাব অবলম্বন করে। যেমন বর্ষাকালে গগন-বর্ষিত নির্ম্মল জল ভূ-ক্ষেত্রে পড়িলে কর্দ্দম কলুষিত হইয়া যায়, তেমনই মনঃশক্তি প্রভৃতিও পার্থিব শরীরের বিকার-ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়। সুতরাং মানবীয় ভাবকে দেব-ভাবের জ্বলন্ত আলোকে পূত করিয়া শুভ সাধনের জন্য উৎকণ্ঠার প্রয়োজন। তাহা হইলে, ভগবন্মত্ততার স্নিগ্ধ আবেগে বিমলানন্দদায়িনী আশার মিষ্ট আপ্যা-য়নে নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন-শক্তি জন্মে। তখনই সিদ্ধযোগিগণ জীবিতা-বস্থাতেই নির্ব্বাণ মুক্তির মূল সত্য বুঝিতে সক্ষম হন। এবং স্পষ্টতই জানিতে পারেন যে, মানবীয় ভাবটী ঘুচিয়া গেলে, ঐ অহমিকামিত্বই "সিদ্ধামিত্ব" নামে অভিহিত হইয়া নির্ব্বিকার নিষ্কলঙ্ক প্রকৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করে এবং চিরশান্তির অবিরল ধারায় ডুবিয়া যায়। ঐ সিদ্ধামিত্বই যোগীর যোগ-শরীরে থাকিয়া মুক্তি নির্ব্বাণ-সুখ সম্ভোগ করিতে থাকে। তখনই যোগীকে যোগ-জ্যোতিতে নিমজ্জিত করে।

ইহাই সিদ্ধযোগীব জীবিতাবস্থায় মুক্তি বা নির্ব্বাণ ! ইহাকেই যোগযুক্ত মুক্তি বলে। বস্তুতঃ নিরাকার তত্ত্ব যখন ধ্বংস বা খণ্ড হয় না, তখন জীব-ভাবাদি যুগপৎ নিবিয়া যায়, এটী ভাবিবারই বিষয়। যাহা হউক, একথাটী কি বলিতে পারা যায় না যে, একই শক্তির উপাধি-ভেদ মনঃবুদ্ধি, জীবভাবাদি প্রাণি-জগতে সর্ব্বাধারে শুভাশুভ বৃত্তির কম্পন বিজড়িত হইয়া স্থিতি করিতেছে ? নিরাকার কোন তত্ত্বই স্থূল সংজ্ঞায় খণ্ড রূপ বিশিষ্ট নহে। ঐশী শক্তির প্রবাহরূপ নাম-ভেদ শক্তি সকলও শরীরপাত হইলে, নির্ম্মল জ্যোতিঃসম্পন্ন নিত্য। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বিকার ধ্বংসই মুক্তি বা নির্ব্বাণ।

যাক্, এ বিষয় অধিক আলোচনার আবশ্যকতা নাই। ভক্তের মতে ঈশ্বর

অংশ রূপীই হউন, আর জ্ঞানীর মতে তিনি সর্ব্বব্যাপীই থাকুন, কিন্তু একথা কি বলিতে পারিনা যে, ভক্ত দ্বৈত ভাবে পূজা-বন্দনাই করুন—জ্ঞানী, অদ্বৈত ভাবে "আমি" হইয়া যান, এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ নহে। ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য! কারণ, ব্রহ্মতত্ত্বের অস্তিত্ব অতি গূঢ়! অধিক ভাবিতে গেলে, নিরীশ্বরবাদীর ন্যায় শুষ্ক-উল্লাস হৃদয়ে "ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ" এই মন্ত্রটী সার মনে করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়। আবার ভক্তির আবেগে ছাপ তিলক মুদ্রাদির আড়ম্বরে পড়িয়া তুলসী তলাতেই আজীবন বদ্ধ থাকা যায়। যাহা হউক, এখানে মুক্ত পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দুইটী কথা বলিব… ইহাতে জ্ঞানী ও ভক্ত, উভয়ই বুঝিতে পারিবেন। এক সময় পরমহংসদেব আপন মস্তকে পুষ্প চন্দন বিল্বদল অর্পণ করিয়া নিজকেই নিজে পূজা করেন। আবার একথাটীও বলিয়াছিলেন যে, "বাগানে প্রবেশ করিয়া কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা গণিবার প্রয়োজন কি? সুমিষ্ট ফল পাও খাইয়া যাও।" কেমন সুন্দর উপদেশ—ভগবানের দর্শন-আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ হওয়াইত কথা! (করনেসনে) দিল্লী নগরে সরল ও বক্র, যিনি যে পথে গিয়াছিলেন, সকলেই সম্রাটকে দেখিয়াছেন। অতঃপর সম্রাটের সম্রাটকে যদি দেখিতে চান, তবে মর্ম্মোত্থিত অশ্রুতে সিক্ত হউন এবং শাশ্বত প্রেমে জগতের সকল প্রাণীকে আলি-ঙ্গন করুন। তাহা হইলে, হৃদয়রূপ ব্রহ্ম-মন্দিরের দ্বার খুলিয়া যাইবে। জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক, সকলেই চিন্ময় অব্যক্ত পরম সুন্দর পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন।

অতি নিশ্চিত সত্য যে, ভগবানের কৃপার প্রতি চাহিয়া থাকিলে, বাহ্যাড়ম্বর সকল দূরীভূত হইয়া যায়। ক্ষণমধ্যে অন্তরাকাশ ভেদ করিয়া অন্তশ্চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। তখনই হৃদয়ের নিভৃত কক্ষস্থিত অপার্থিব শ্রুতিতে "ব্রহ্মবাণী" শ্রবণ করিবার শক্তি জন্মে। বাস্তবিকই যে পর্য্যন্ত বিচার বুদ্ধির তীব্র শাসন হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত দেবপ্রদত্ত দিব্যচক্ষু ও অপার্থিব শ্রুতিতে তগবৎ দর্শন ও ব্রহ্ম তত্ত্ব শ্রবণের ব্যাঘাত হইবেইত! সুতরাং বিবিধ মতের ঘন উত্তেজনায় "যে তিমিরে সেই তিমিরে" পড়িয়া আজীবন বদ্ধ থাকিতে হয়। যুগপৎ সাধন বল অন্তঃ-করণ হইতে চলিয়া যায়। বিশুদ্ধ দেব চরিত্র কুৎসিতভাবে কলুষিত করে এবং হৃদয়ের সাধু সঙ্কল্প সকল ঘুচিয়া যায়। এই কারণেই সাধনশীল যোগারূঢ় ব্যক্তিমাত্রই সরলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদাসীন থাকেন না।

তাঁহারা অজ্ঞের বাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া অসীম জ্যোতিঃ মণ্ডলে যাইবার জন্য অত্যন্ত আকুল হন, এবং এক মাত্র ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি নির্ভর করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন, আপাত মুগ্ধকারিণী অমৃতময়ী আসক্তি হৃদয়ে আর স্থান পায় না। অতি অল্প সময়েই সাধনশীল যোগী ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া ধ্যানস্থ হন। তখনই বিশ্বভাবন পরব্রহ্মের মধুর আদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক সেই অগ্নি মন্ত্র দ্বারা জগৎকে জীবিত করিবার জন্য প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। নিজেও ব্রহ্ম-সত্তায় ডুবিয়া যান। তাঁহার সম্বন্ধে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ এক হইয়া যায়। ধন্য ভগবৎ কৃপা! জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলকেই স্বর্গীয় নিত্যসুখ দিবার জন্য ব্যস্ত! আহা কি ভগবৎ করুণা।

উপসংহার।

মানবের ভঙ্গুর শরীরের পরিসমাপ্তি আছে। তথাপি মোহময় সংসার-হাটে বাণিজ্যের বিরাম নাই, ক্ষণকালের জন্যও শান্তি নাই, প্রাণে আরাম নাই, আশা-তরঙ্গ থামেনা। কেবলমাত্র অনিত্য ভোগ-সুখের পুষ্টি সাধনেই ব্যতিব্যস্ত! কখন যে জীবন-লীলার শেষ হইবে, এই সংসার-হাট ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। হায়! হায়! ইহা কি কখন স্মরণ হয়। কেবল একমাত্র স্বার্থ সম্ভার লইয়াই জগতের সঙ্গে আলিঙ্গন চলিতেছে। আসক্তির কি দুর্দ্দমনীয় প্রভাব! কিছুতেই তাহার আশা-তরঙ্গ নিবৃত্ত হয় না। একবারও ভাবিয়া দেখা যায় না যে, এ দেহের বিনাশ আছে! শারীর-সৌন্দর্য্যও আবার বার্দ্ধক্যে ঘুচিয়া যাইবে। তবে আর অসার বাণিজ্যে থাকিয়া,—স্বর্গীয় প্রেমের হাটে তত্ত্ব বস্তু সমূহ ক্রয় করিতে উদাসীন কেন? "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" এই মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া ভগবানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সম, দম, তিতিক্ষা, দয়া দাক্ষিণ্য, সরলতা, এবং একপ্রাণতার অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিতে বিলম্ব কেন? সত্য বস্তুর নিমিত্ত ভগবানের নিকট হৃদয়রূপ ভিক্ষা পাত্র লইয়া নিয়ত নিরত থাকা কি উচিত নহে?

সত্য সকলেরই প্রাণের বস্তু। যিনি যে ভাবেই সাধন করুন, পরিশেষে সকলেরই গন্তব্য-পথ এক। মূল তত্ত্বের অনুসরণ করাই সুধীগণের হৃদয়ের ঐকান্তিক অনুরাগ ও ইচ্ছা। সময় ও সুযোগে অবশ্যই স্বাভাবিক যোগ সাধনের পথ অন্বেষণ করিতেই হইবে। কেননা, ইহা ব্রহ্ম-প্রদত্ত যোগ-শিক্ষা। আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না, তবে তত্ত্বসাধনের সংক্ষেপে দশটী কথা মাত্র বলিয়া পুস্তক সম্পূর্ণ করিব।

১। মাতৃ গর্ভে সন্তান-সন্ততির শরীর-গঠন-কার্য্যের কর্ত্তা কে? স্থির ও ধীর ভাবে একটু চিন্তা করিলে নিরীশ্বরবাদীর মস্তক চূর্ণ হইবে, তখন ঈশ্বর আছেন—এ বিশ্বাসটী কিছুতেই যাইবে না।

২। যতই বিষয়াসক্তি ঘুচিয়া যাইবে, ততই ভগবানে নির্ভর দৃঢ় হইতে থাকিবে।

৩। অসার ইচ্ছা ও বিকৃত চিন্তায় বিরত থাকিলে, সহজেই "ভগবদ্রুচি" জাগিয়া উঠিবে।

৪। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতির সেবা-নিরত হইয়া কাঁদিলে অভেদ ভক্তি,—ভেদ-ভাব আর রাখিবে না।

৫। একপ্রাণতার মূলে জগৎকে আলিঙ্গন করিলে, বিশ্বজনীন প্রেম হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবে।

৬। সৎসঙ্গ দ্বারা মনের মলিনতা ঘুচিয়া গেলে, অকপট অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে।

৭। নিদ্রিত কি জাগ্রত সকল সময়ে "মৌলিস্থিত কুম্ভ" নটির ন্যায় লক্ষ্য রাখিতে পারিলে, ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই আসিবে।

৮। পার্থিব প্রীতির বস্তুর প্রতি সম্যকরূপে অপ্রীতি জন্মিলে, অনাসক্ত বৈরাগ্য-সাধনে বিঘ্ন সংঘটিত হইবে না।

৯। দয়া, দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্যাদি সদ্‌গুণ দ্বারা দুর্দ্দমনীয় রিপুগণ দমিত হইলে, চিত্ত-নিরোধ কেনই বা হইবে না ?

১০। শৈবাল-দাম-পরিষ্কৃত সরসীর অতলতলেও যেমন উজ্জ্বলকর ভাস্কর-মণ্ডল দেখা যায়, নির্ম্মল হৃদয়েও তেমনই পূর্ণপরব্রহ্মকে দর্শন হইয়া থাকে; এ কথার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।